অভিশপ্ত জগৎ

মনোরঞ্জন হাজরা

IPP

ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
১৫, কালেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক ঃ
সি. ভট্টাচার্য, বি. এ. ; বি. টি.
১৫, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ ঃ মার্চ, ১৯৫৮

মুদ্রক
শ্রীঅরুণকুমার রায়
শ্রীকমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৫৪/১বি, শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৪

প্রকাশকের নিবেদন

এই উপন্যাসখানির লেখক শ্রীমনোরঞ্জন হাজরার লেখক হিসাবে পরিচিতির কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না—তিরিশের দশকে তাঁর 'নোঙরহীন নৌকা' বাংলা সাহিত্যে একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। নিপীড়িত মানুষদের নিয়ে যে সাহিত্য রচনা করা যায় তা তিনি তাঁর 'নোঙরহীন নৌকা', 'পলিমাটির আসর' প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে দেখিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে তাঁর আরও কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়। তাঁর সব বইগুলিই নিঃশেষ হয়ে যায়। তাঁর 'ক্রাইপার রোডে ঝড়' উপন্যাসখানি মালয়ালাম ভাষায় অনূদিত হয়। লেখক ১৯৫২ সালে সংসদীয় জীবনে প্রবেশ করেন—তখন থেকে একটানা অপরাজেয় হিসাবে তিনি আজও বিধানসভায় আছেন। একজন অপরাজিত বিধানসভা সদস্য হিসাবে দীর্ঘকাল তাঁকে যে পরিমাণ ব্যস্ততার মধ্যে থাকতে হয়—তার উপর সাহিত্যচর্চার সময় পাওয়া কত কঠিন, তা সহজেই অনুমেয়। আলোচ্য পুস্তকখানি আমাদের ভাল লাগে ; তাই আমরা প্রকাশ করলাম। পুস্তকটির ১৭৩ পৃষ্ঠায় একটি ভুল থেকে গেছে—২০ লাইনে "কিছুক্ষণ আগে"-র জায়গায় "কাল" কথাটি হবে। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

প্রকাশক

জীবনের দুঃখে সুখে যাকে পেয়েছি সেই

শ্রীমতী শঙ্করীকে



লেখকের অন্যান্য লেখা

উপন্যাস

নোঙরহীন নৌকা
পলিমাটির ফসল
নবজীবনের পথে
মহানগরে দাবানল
ক্লাইপার রোডে ঝড়
ঝড়ের সংকেত
স্বর্ণশিমুলের চরে
দুস্তর পারাবার



গল্প সংগ্রহ

এই সভ্যতা

নাটক

উদয়গড়
শেষ কোথায়



কবিতা

Flood of light
মুক্তি সূর্যের রক্ততৃষা





[বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে ডিকেন্স তাঁর রচনার মধ্যে এমন একটি বই লিখেছিলেন যাকে "এ টেল অফ টু সিটিজ-এর মতই আরেকটি অপূর্ব সৃষ্টি বলা যেতে পারে। এমন কি, সেই বইখানিকে বলা যেতে পারে "এ টেল অফ এ্যানাদার সিটি বা এ্যানাদার ওয়ার্ল্ড।" সত্যিই সে কাহিনী অন্য জগতের. সে জগৎ বিস্ময়ের কুজ্ঝটিকায় সমগ্র সভ্যসমাজের কাছে অস্পষ্ট। তাই বইখানি যখন বেরোয় তখন ইংলণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায় থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত চমকে গিয়েছিল। কেতাদুরস্ত টিপ্‌টপ্‌ ইংলণ্ডের ভিক্টোরিয়ান যুগের মানুষ—সেখানে এ কোন্ এক নতুন জগৎ যাদের অলিভার টুইস্ট দেখিয়ে দিল। সেই ডোয়াকিন্স, চার্লে বেটস, ফ্যাগিন আর মংকসের কাহিনী—এ যেন আজও চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে।

তারপর সওয়া শতাব্দী ধরে গোটা ইংলণ্ডের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। পরিবর্তন হয়েছে গোটা পৃথিবীরও। কিন্তু অলিভার টুইস্ট রয়ে গেছে তেমনিভাবেই সারা পৃথিবীতে। ইংলণ্ডের সেই 'পুওর ল' আমাদের দেশের চাইল্ড ডেলিকোয়েন্সী, ভ্যাগরান্টস্ আইন প্রভৃতি সবই ঠিকঠাক চলছে। অনেক দেশে এদের নিয়ে অনেক সাহিত্য হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আমাদের দেশে তেমন কোন প্রচেষ্টা এসব নিয়ে চোখে পড়ে নি। কখনো-সখনো আমাদের দু-একটা ছোট গল্পে কিংবা উপন্যাসের কোন পার্শ্বচরিত্রে এদের আমরা দেখতে পেয়েছি বটে. কিন্তু তাতে গোটা জাতটা যে অনুপস্থিত থেকে গেছে. সেকথা বলা বাহুল্যমাত্র। অবশ্য সেলু-

লয়েডের মাধ্যমে দু-একটা চেষ্টা যে ইতিপূর্বে হয় নি তা নয়, তবে ভাল জিনিসের সার্থক অনুকরণ হলে মন যত খুশি হয়, ততখানি খুশি করতে পারে নি সেগুলি।

এদের জীবনের সুখ-দুঃখ, আশানিরাশার দ্বন্দ্ব, জোট-বাঁধা নারকীয় জীবনযাপন, প্রেম-ভালবাসা, হিংসা-দ্বেষ, জীবিকা সংস্থানের অবিশ্বাস্য সব ঘটনায় সাধারণের ঔৎসুক্য থাকতে পারে, কিন্তু আসলে সভ্যসমাজের কাছে এরা একেবারেই অপরিচিত। তাই কোথায় এদের জীবনধারার উৎস, আর কোথায়ই বা এর শেষ, আর কেনই বা এদের জীবনে এই অভিশাপ এবং পথই বা কোথায় সবকিছু প্রতিকারের—সেসব কথাই বলবার চেষ্টা করা হয়েছে এই রচনাটিতে। রচনাটি একটি লোকের জবানীতে বলা হয়েছে বলে এতে গল্প বা উপন্যাসের সুর বেজে উঠেছে, কিন্তু আসলে এটি অসংখ্য অভিশপ্ত মানুষের প্রতিনিধিত্বমূলক কতকগুলি চরিত্রের সমাবেশ এবং সেই সমাবেশের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে অবহেলিত অথচ সমাজবিরোধী জগতের একটি চিত্র। পাঠক-সমাজের কাছে এটি উপস্থাপিত করলাম —লেখক]

বিচিত্র এ জীবনের ধারা।

কখন কোথায় থেকেছি তারও যেমন ঠিক নেই, তেমনি যখন যেখানে থেকেছি সেখানকার মানুষগুলোকেও ভুলতে পারি নি। তারা আজও সবাই যেন আমার চোখের সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের কাউকে হয়তো ঠিক ঠিক ভাবে বুঝেছি, নয়তো বুঝতে পারি নি। হয়তো কাউকে কাছে টেনেছি, কাউকে টানতে পারি নি। তাছাড়া এ অহংকারও আমার নেই যে, আমিই ছিলাম সব মানুষগুলোকে বোঝা-না-বোঝার কিংবা কাছে টানা-না টানার দায়িত্বে। বরং বলতে পারি, দায়িত্ব আমার মত ছিল তাদেরও। আমিও তাদের যেমন আকর্ষণ করেছি, তারাও তেমনি আকর্ষণ করেছে আমাকে। তারা ও আমি একাকার হয়েই আমাদের বোঝাপড়া, তারা ও আমি একাকার হয়েই আমাদের জানাজানি। তাই জীবনের কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে যখন যেখানে গিয়ে পড়েছি তখন এই একই নিয়মে মানুষের সঙ্গে আমার মেলামেশা হয়েছে, আমি তাদের জেনেছি, তারাও জেনেছে আমাকে। আমিও তাদের ভালবেসেছি তারাও ভালবেসেছে আমাকে।

মোটকথা বলা যায়, মানুষ যখন যে পরিবেশেই থাকুক আর যত সুরই তার হৃদয়তন্ত্রীতে বেজে উঠুক, একটি সুর তার মধ্যে একেবারে পৃথক—সে হল ভালবাসার সুর। এ সুর সহজ, এ সুর সুন্দর, হাজারো প্রাচীরের বাধা-নিষেধের মধ্যে এ সুরের লহর ঊর্ধ্বায়িত বাষ্পের মত শূন্যলোকের তরংগে তরংগে ভাসতে ভাসতে ছড়িয়ে পড়ে দিকে-দিগন্তরে।

সে সময়টা পথে বেরিয়ে পড়েছিলাম বিশেষ একটা কারণে। সেকথা সময় এলে বলা যাবে। কিন্তু পথে বেরিয়েছিলাম এটাই সত্যি। বাড়ির চৌকাঠ পার হলেই যে পথ, সেই পথই তো বিসর্পিল গতিতে গিয়ে সারা পৃথিবীকে ছুঁয়েছে। তাই সে পথের যাত্রী হিসাবে গতিও ছিল আমার বিসর্পিল।

প্রথমেই যে ঘটনাটা ঘটল সে এক অদ্ভুত ঘটনা। বলতে পারা যায় এই ঘটনা থেকেই যে জগতের কথা আমি বলতে শুরু করেছি, সেই জগতে আমার যাত্রা। দূর মফস্বল শহর থেকে যাচ্ছি কলকাতায়। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে ট্রেন। হঠাৎ কানে এসে লাগল গানের একটা কলি :

'আমি অন্ধ এক তোমার দ্বারে
পেটের দায়ে ভিক্ষা চাই।'

গানের সুরকে অনুসরণ করতেই সর্বপ্রথমে যা চোখে পড়ল তাতে হঠাৎ যেন বিস্মিত হয়ে গেলাম। নিরাভরণা এক কিশোরী তার কৈশোরের সমুদ্র-কল্লোলকে সামান্য একখানি বস্ত্রের চক্রপাকের মধ্যে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নিয়ে একখানা লাঠির অগ্রভাগ ধরে এগিয়ে আসছে। কিশোরীর চোখে কোন্ অচেনা জগতের মায়া জড়ানো। কপালের সামনে তার একপাকের গিঁটবাঁধা কুন্তলের চূর্ণিত বিস্রস্ততা। শুধু আমারই নয়, চলন্ত ট্রেনের সেই কামরার সকল যাত্রীরই দৃষ্টি নিবদ্ধ তার দিকে। মেয়েটির লাঠির পিছন দিকটা ধরে আসছিল এক অন্ধ গায়ক। কণ্ঠে তার তেমনিভাবেই গান : 'হরে নিয়ে চক্ষুনিধি অন্ধ করেছেন বিধি

তোমরা না বাঁচালে আর
কে বাঁচাবে ভাই
আমি অন্ধ এক তোমার দ্বারে
পেটের দায়ে ভিক্ষা চাই।'

যাত্রীরা অনেকেই অন্ধের হাতে দুটো-একটা পয়সা দিলে। আমিও দিলাম। ট্রেনটা ছিল এক্সপ্রেস। মাঝে কোথাও আর থামবে না—থামবে গিয়ে একেবারে শিয়ালদায়। সমস্ত কামরাটা ঘোরা হয়ে গেলে অন্ধটি একজায়গায় বসল। কিশোরী মেয়েটি দাঁড়িয়ে রইল পাশে। ইতস্তত সে কখনো কারো দিকে, কখনো

বা উদাসভাবে ধাবমান ট্রেনের বাইরে ফেলে-আসা গাছপালা ঘরবাড়িগুলোর দিকে তাকাতে লাগল।

মেয়েটিকে কেন্দ্র করে তখন আমার মনে অনেকগুলো প্রশ্ন উঠে পড়েছে। আমি ভাবছিলাম, হয়তো বাবা অন্ধ, হয়তো তাদের আর কেউ নেই—এমনি করেই ভিক্ষার দ্বারা তাদের জীবিকার সংস্থান করতে হয়। কিন্তু মেয়েটি বড় হয়েছে। বাবা অন্ধ, কোথাও কোন দুর্বৃত্ত প্রকৃতির মানুষ যদি মেয়েটিকে অসহায় পেয়ে তাকে কোন নির্যাতন করে কিংবা তাকে কোনভাবে প্রতারিত করে, তাহলে কি হবে? প্রভাতের সদ্যবিকশিত অনাঘ্রাত পুষ্পের মত অমন সুন্দর একটি মেয়ের জীবন তাতে নরকের পঙ্কে ডুবে যেতে পারে। এইসব ভাবতে ভাবতে মেয়েটির সঙ্গে আমার কয়েকবার চোখাচোখি হয়ে গেল। গভীর বিস্ময়-মাখা তার চোখ—সে চোখে তার কি ভাষা তা সে-ই জানে। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারলাম, মেয়েটির প্রতি অহেতুক কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করছিলাম। জানি না তার অর্থ কি। তার বয়সের সঙ্গে তখন আমার পার্থক্য খুব বেশি নয়। তাছাড়া সহানুভূতি, মমতা আর ঔৎসুক্য এমন সীমান্তপ্রান্তে টেনে নিয়ে যায়, যেখানকার রেখাটুকু পার হলেই অন্য কিছু দাঁড়িয়ে যেতে পারে। বলতে বাধা নেই, সে বিষয়ে তখন আমি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলাম। কিন্তু বয়সটা তখন এমনই যে, রঙীন রোমাঞ্চময় পরিবেশ মনে মনে সৃষ্টি করে নিতে ভাল লাগে —ভাল লাগে কল্পনার অবশ্যম্ভাবী কোন পরিণতির কথা ভাবতেও। কে জানে মনের অবচেতন স্তরে তেমন কোন প্রক্রিয়া আমাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল কিনা।

হ্যাঁ, মনে আমার সেই প্রক্রিয়াই কাজ করেছিল। শিয়ালদা স্টেশনে নেমে যখন সকল যাত্রী যে-যার চলে যেতে ব্যস্ত, তখন আমি কেন অন্ধ গায়ক ও সেই মেয়েটিকে অনুসরণ করলাম তা আমি নিজেই ভেবে পেলাম না। প্ল্যাটফরম্ পার হয়ে স্টেশনের বিরাট

চত্বরে একজায়গায় মেয়েটি অন্ধটিকে নিয়ে এসে বসালো। তারপর দু-ভাঁড় চা এনে অন্ধকে এক ভাঁড় দিলে, নিজেও এক ভাঁড় খেল।

হঠাৎ আমি মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি কোথায় থাকো ?

মেয়েটি আপাদমস্তক একবার ভাল করে দেখল আমাকে। আমার মুণ্ডিতমস্তক। পরণে গেরুয়া, গায়ে গেরুয়ার চাদর, কাঁধে ঝুলছে গেরুয়ার পুঁটলি। সম্ভবত মেয়েটি আমার গেরুয়া দেখে সন্তুষ্ট নয়, কারণ বয়সটা আমার গেরুয়ার অনুকূল বলে সে মানতে রাজী নয়। কেমন একটা সন্দেহমিশ্রিত দৃষ্টিতে সে আমায় পাল্টা প্রশ্ন করলে, 'আপনি না ট্রেনে আসছিলেন ?'

ঘাড় নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।'

এবারে তার কথায় সায় দিয়েছি দেখে সে যেন আমাকে খানিকটা বিশ্বাস করল। তবু সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি সাধু ?'

'হ্যাঁ।'

'সত্যিকারের সাধু ?'

'হ্যাঁ।'

জবাবটা তাকে দিলাম বটে, কিন্তু আমি তো জানি সে জবাব আমার কতখানি মিথ্যে। আমি তো সাধু নই। গেরুয়া পরে সাধু সেজে আমি তো পথে বেরুই নি সমাজ-সংসার পরিত্যাগ করে জীবনের মোক্ষলাভ করার উদ্দেশ্যে। সাধু সাজা আমার শুধুমাত্র পরিচয় গোপন করার জন্য। তাই সেই সূত্রে আমাকে কিছু কিছু মিছে কথা বলতেই হবে, উপায় নেই। আমি সত্যিকারের সাধু শুনে মেয়েটি এতক্ষণ যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মেঘ ও রৌদ্রের দ্বন্দ্ব-দোলায় দুলছিল, বর্তমানে যেন তার কিছুটা কেটে গেল বলে মনে হল। সে অনেকটা নির্ভয়েই আমাকে জিজ্ঞাসা করলে. আমাদের ঠিকানা জানতে চাইছিলেন কেন ?'

'এমনিই কৌতূহল, বোন।'

'বো-ন' অস্ফুটস্বরে মেয়েটি আপনা-আপনিই যেন বলে উঠল। তারপর বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলে, 'আমাকে আপনি বোন বললেন ?'

'কেন—কোন অপরাধ করেছি কি ?'

'না না', মেয়েটি বললে, 'এতদিন পথে পথে রেলে-স্টেশনে, বাসে-ট্রামে গড়ের মাঠে ভিক্ষে করে বেড়িয়েছি, কেউ তো কোনদিন আমায় এমন করে বোন বলে ডাকে নি।'

'কি বলে ডেকেছে এতদিন তোমায় ?'

'সে ভাষা আপনি বুঝবেন না।

বললাম, 'তুমি না বললেও আমি বুঝতে পারি।'

মেয়েটি সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'বুঝতে পারেন ?'

'কেন পারবো না', বললাম, 'সকালের সদ্যফোটা ফুলের মত তুমি। এ লোভের পৃথিবীতে সবাই যে তোমাকে মর্যাদা দিয়ে দেখবে বোন—একথা আমি বিশ্বাস করব কি ক'রে! তাই আমি এসব বুঝতে পারি।'

হঠাৎ মেয়েটি এসে আমার হরিণের চামড়ার জুতোজোড়ায় ঢাকা পা দুটোর ওপরদিকে হাত দিয়ে বললে, 'আমরা যেখানে থাকি সেখানে আপনি যাবেন ?'

কিছু বলার আগেই হঠাৎ নজরে পড়ল অন্ধ লোকটা পিট্ পিট্ করে যেন আমার দিকে তাকালো। মেয়েটির প্রতি গভীর স্নেহে কথাটা কল্পনা করতে আমার খুব খারাপ লাগছিল, কিন্তু তবু আমার মনে হল সে নিশ্চয়ই আমাকে দেখছে ভাল করে এবং সত্যি-সত্যিই সে দেখতে পায়। আমি মেয়েটির কথার উত্তর দেওয়ার বদলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। কিন্তু অন্ধটি দেখা গেল রীতিমত চালাক। সে যে সত্যি-সত্যিই অন্ধ সেটুকু আমাকে বুঝিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলে উঠল, 'কার সঙ্গে কথা বলছিস মায়া ?

মায়ার দৃষ্টি তখন আমার দিকে নিবদ্ধ। সে কি বলবে সেও যেন ভেবে পেল না, আর আমিও তাদের ওখানে যাব কি যাব না,

সেকথাও বলতে পারলাম না। কিন্তু দু'জনের কাছেই দু'জনের প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেল যেন আপনা-আপনিই।

মায়া নতমুখে বললে, 'এই আমাদের আসল রূপ।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইনি কি তোমার বাবা?'

'না।'

'তবে।'

'আপনি এ জগৎকে বুঝতে পারবেন না।'

কথাটা হয়তো ঠিক। কিন্তু এদের সম্বন্ধে কম কথা তো শুনি নি ছেলেবেলা থেকে। কাজে কাজেই মনে মনে অস্পষ্ট একটা ধারণা ছিলই। তারই অভিজ্ঞতায় বললাম, 'একেবারেই যে জানি না তা নয়, তবে বাকিটা তুমি আমায় বলবে, এ আশা আমি করি।'

'দাদা, কেউই আমরা কারো নই, মায়া বলতে লাগল, 'অথচ আমাদের পরস্পরকে না হলেও পরস্পরের চলে না।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'লোকটি কি সত্যিই অন্ধ?'

'আপনার কি মনে হল?'

'মনে হল ও অভিনয় করছে।'

'এরপর আমার আর কিছু বলার নেই।'

'কিন্তু এমন করে লোককে ঠকাবার কি দরকার বলতো?'

'দাদা, সে অনেক কথা', মায়া বললে, 'কই আপনি তো বললেন না, আমরা যেখানে থাকি সেখানে আপনি যাবেন কিনা?'

আমি সন্ন্যাসী মানুষ। আমি যদি তোমাদের ওখানে যাই তবে তোমাদের ওখানে লোকজন ভয় পাবে না?'

'তা হয় ত' পাবে। কিন্তু সাধু-সন্নিসি মানুষকে পেলে মোটমাট লোকের ভালও লাগবে।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভয় পাবে আবার ভালও লাগবে কি রকম?'

মায়া বললে, 'প্রথমটায় ভয় পাবে আমাদের ওখানকার মানুষ

চোর-জোচ্চোর বলে। কিন্তু ভাল লাগবে এই জন্যে যে, আপনি তো তাদের সত্যিই কোন ক্ষতি করবেন না!'

'না তা আমি পারবো না।'

'সেজন্যে সাধু-সন্নিসি মানুষের সঙ্গ তাদের কাছে ভালই লাগবে।'

মায়া ঠিকই বলেছিল।

সেদিন আমি ওদের জগতে চলে এসেছিলাম। চলে আসার পর বুঝতে পেরেছিলাম ভয়ও ওরা পেয়েছিল, ভালও ওদের লেগেছিল। অদ্ভুত ওদের জগৎ মহানগরীর উপকণ্ঠে আঁকা-বাঁকা পথ পার হয়ে, অলি-গলি ঘুরে বিরাট এক বস্তি। গোলকধাঁধার মত বিস্তীর্ণ এক এলাকায় পরিব্যাপ্ত। মাঝে মাঝে দু-একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ। কাঁচা রাস্তা, কাঁচা বাড়ি, খোলার ছাউনি, পাশে পচা নর্দমা। আরও ভেতরে গেলে ছোটখাটো একটা শ্যাওলা পড়া মাঠ। মাঠের উত্তরদিকে নোনাধরা ইটের একটা পায়খানা। তার চারপাশের দেওয়ালে শিকড় ছড়িয়ে উঠেছে গোটা কতক অশ্বত্থ, বট আর নিমের চারা। চটের একটা পর্দাও দেখা যায় শতজীর্ণ অবস্থায়। একেবারে দক্ষিণে একটা টিউবওয়েল। কর্দমাক্ত হয়ে উঠেছে তার চারপাশটা। শুধু তাই নয়, একপাশে ছাইয়ের গাদা, ছেঁড়া কলাপাতা আর ভাঙা ভাঁড়ের স্তূপীকৃত গাদা। টিউবওয়েলটায় বাসন মাজা থেকে মোষ নাওয়ানো সবই হয় বোধ করি। দাঁতনের ছিবড়ে, গয়ের সিকনি কোন কিছুরই অভাব নেই সেখানে।

ভোর না হতেই পিলপিল করে এখানকার মানুষগুলো এদিকেই আসে, কারণ সকলেরই দরকার জলের। তাই ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাওয়া যায় টিউবওয়েলের হাতল নাড়ার ঘটাং ঘটাং শব্দ।

বস্তির অসংখ্য খোপে অসংখ্য মানুষ। এ মানুষকে সভ্যসমাজের মানুষ চেনে না। অদ্ভুত এদের ভাষা, অদ্ভুত এদের জীবনযাত্রা।

কে যে ঠিক কি উপায়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে তা ঠিক বোঝাও যায় না, জানাও যায় না। অথচ মানুষগুলো যেন সদাই ব্যস্ত, সদাই কি একটা করছে যেন।

মায়া আর অন্ধ গায়কের সঙ্গে আমি এসেছিলাম। আসার দু-একদিনের মধ্যেই এ অবস্থাটা আমার চোখে পড়েছিল।

প্রথম আসার দিনটিতে এসে যে বিস্ময় আমার চোখে লাগে সে যেন ভোলার নয়। বস্তির মধ্যে আসতেই অন্ধ লোকটা মায়াকে বললে, 'তাহলে মায়া তুই যা।'

মায়া বললে, 'কিন্তু যাব কি শুধু হাতে?'

'ঐ দ্যাখ ভুলে গেছি' বলে অন্ধ লোকটা তার ফতুয়ার পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে মায়ার হাতে দিলে। তারপর বললে, 'কাল ঠিক সময়ে আসবি তো?'

মায়া বললে, 'মাকে বলতে হবে।'

'আবার বলতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

অন্ধ বললে, 'আচ্ছা তাহলে তাই—'

মায়া আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'দাদা চলুন।'

আমি মায়ার কথামত পা ফেলতে লাগলাম বটে, কিন্তু বারবার পিছন ফিরে দেখতে লাগলাম অন্ধ গায়ক সোজা চলে যেতে লাগল। এই লোকটাই যে ট্রেনে অন্ধ সেজে ভিক্ষা করছিল, এখানে দেখলে কস্মিনকালেও কারো মনে হবে না।

অন্ধ গায়কটি চলে যেতে এসে উঠলাম মায়াদের বাড়িতে।

আহা, সে তো বাড়ি নয়—উত্তর-দক্ষিণ আর পূর্ব-পশ্চিমে কতকগুলো খুঁটি দিয়ে মাথার ওপর একটা টালির চাল খাড়া করা শুধু। তারপর বাঁশের ওপর কাদা ধরিয়ে দেয়াল, তারি একদিকে দুটো আওয়াজী জানলা আর বিপরীত দিকে একটা ফুট পাঁচেকের মত

দরজা। ঘরখানার পরিসর কতখানি তা বোধ হয় না বললেও চলবে। বড় জোর তাতে কাপড়চোপড়ের আলনা, হাঁড়ি-কলসী বাসনপত্র রেখে মেঝেতে গোটা চার-পাঁচ মানুষ শুতে পারবে পাশাপাশি। রান্না করে ওরা তোলা উনুনে বাইরে ফুট তিনেকের মত চওড়া দাওয়ায়।

দাওয়াটাও দেখলাম ভাড়া দেয়া হয় রাতে।

মায়ার পিছু পিছু আমি আসছিলাম। দাওয়ার সামনে এসেই মায়া ডাকল, 'মা-আ!'

'আয়,' ঘরের ভেতর থেকে সাড়া এল।

মায়া চট করে ঘরে ঢুকে পড়ে মাকে সম্ভবত আমার আগমন-বার্তাটা জানিয়ে দিলে। ওর মা বেরিয়ে এলেন। বছর চল্লিশ বয়সের একটি বিধবা মহিলা। যেন কোন তপস্যাক্লিষ্ট জীবনের লক্ষ্যহারা অবশেষ তিনি। অফুরন্ত রূপ ছিল বোধ করি কোন কালে, কিন্তু আজ আর তা ঠাহর করা যায় না, মহাকালের নির্মম তুলিকায় তা আচ্ছাদিত। তিনি ঘর থেকে এসেই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যেন আমাকে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। প্রসন্নতার চিহ্নলেশহীন মুখমণ্ডলে তাঁর মনের ছবিখানি আমিও যেন মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করে নিলাম। মায়ার দৃষ্টিও বোধ হয় এই দৃশ্য থেকে অন্য দিকে নিবদ্ধ হতে পারল না।

ওর মায়ের মনের ভাবটা এই, মায়া কিনা শেষ পর্যন্ত বাড়িতে টেনে নিয়ে এল আমার মত একটা মুণ্ডিতমস্তক গেরুয়াপরা মানুষকে! আমি যদি খাঁটি গেরুয়াবাদী হই তবে সেখানে মায়ার ভবিষ্যৎ কোথায়? সংসারের মাথায় অন্তহীন ফাঁকির বোঝা চাপিয়ে দিয়ে যাওয়া ছাড়া মায়া আর কি-ই বা করতে পারবে? আবার অন্যদিকে আমি যদি তা না হই তবে আমি তো শুধু তাঁদের পরিবেশে নতুন একটি প্রতারকের সংখ্যাই বাড়াবো এবং তার ফলে তাঁর কন্যার জীবন-শকট চলবে কোন্ রাস্তা ধরে?

মায়ার মায়ের মানসিকতার এই ক্ষণিক অভিব্যক্তিটুকু যারপর নাই আমার মনটাকে নাড়া দিলে। এখানকার এই অভিশপ্ত আবেষ্টনীর মধ্যে মা তাঁর মনের ডানা দিয়ে আড়াল করে রাখতে চান মেয়েকে এবং বলা বাহুল্য যে সেটা অত্যন্ত আন্তরিকভাবেই চান। আমার পরনে গেরুয়া দেখে মা বিভ্রান্ত হন নি। বাস্তবিক সেদিন আমি যেন প্রত্যক্ষ করলাম গেরুয়ার ট্র্যাজেডী।

আসল কথা গেরুয়াকে কেউই বিশ্বাস করে না—না উঁচু তলার মানুষ, না নিচুতলার। অবশ্য এও দেখা যায় যে উঁচুতলার মানুষেরাই আবার মোটা অঙ্কের চাঁদা দিয়ে গেরুয়াবাদীদের ছেড়ে দেয় সাধারণ মানুষের মাঝখানে, আফিম খাইয়ে তাদের ঝিমিয়ে রাখার জন্যে। নিচুতলার লোকেরা কিন্তু জীবনের দুর্বিষহ কঠিন বাস্তবে পড়ে তাকে আমল দিতে পারে না, তাই তারা বিশ্বাসও করতে চায় না। তবে গেরুয়াকে যদি কেউ বিশ্বাস করে তবে সে মধ্যশ্রেণীর কিছু মানুষ—যারা উচুতলারও নয়, নিচুতলারও নয়। গেরুয়ার একটা অলৌকিকতা আছে বলে তারা বিশ্বাস করে এবং সেই অলৌকিকতায় তারা মনে করে যদি তারা উঁচুতলার নাগাল ধরতে পারে কোনরকমে তবে সেটা হবে তাদের জীবনের পক্ষে আশীর্বাদ এবং এ ছাড়া তা যদি নাও ঘটে তবে সেও হবে মন্দের ভাল, যদি গেরুয়ার প্রভাবে তাদের নিচে নেমে যেতে না হয় অবস্থার ফেরে

যাই হোক, মায়ার মা সেই মুহূর্তে আমাকে ভালভাবে গ্রহণ করলেন না এবং মেয়ের প্রতি যেন একটু বিরক্তিই প্রকাশ করলেন তিনি। তবু ভয় আছে, সে ভয় সংস্কারের—সাধু-সন্ন্যাসী মানুষকে অশ্রদ্ধা করলে যদি কোন অকল্যাণ হয়! তাই তিনি আমাকে নেহাত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নিলেন এবং মায়াকে আমায় ঘরে নিয়ে যেতে বললেন।

তখন বেলা বিশেষ ছিল না। তাই বলে দিনের আলো যে তখনই নিভে গিয়েছিল এমন নয়। ঘরে ঢুকতে দেখলাম অন্ধকার,

অজস্র অন্ধকার। তারই মাঝে মেঝেয় একখানা চট পেতে মায়া আমায় বসতে দিলে। তারপর বললে, 'আপনি বসুন দাদা—আমি চা নিয়ে আসি।'

আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, 'না না, চা আনতে হবে না।'

'কেন?'

'চা আমি এখন খাব না।'

'কখন খাবেন তাহলে?'

'পরে।'

'তাহলে এখন একটু জল খান—ছুটো মিষ্টি নিয়ে আসি।'

'না না, ওসব করতে যেও না।'

'কেন দাদা,' এবার মায়া বললে 'গরীব বোনের খরচ হবে বলে খাবেন না?'

'না' ঠিক তা নয়' আমি বললাম, 'প্রথমত আমি সাধু-সন্নিসী মানুষ। খাওয়া-দাওয়ার অতো লোভ নেই আমার। দ্বিতীয়ত তোমাদের এখানে যখন আমি এসেছি খেতে তখন আমাকে হবেই। তাই অতো তাড়াতাড়ি করার কি আছে বোন?'

সম্ভবত আমার এই 'বোন' সম্বোধনে মায়ার মায়ের মনে সঞ্চিত মেঘটা কেটে গেল। ঘরের দরজার সামনে এসে তিনি বললেন, তা হলেও যখন এসে পড়েচো এখানে—একটু জল তো তোমাকে খেতেই হবে!'

'সেটা কি পরে হলে হয় না মা?'

মায়ার মা কেমন যেন নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। বুঝলাম জলখাবার খাওয়ার প্রসঙ্গ থেকে মা যেন ছিটকে কোথায় কোন্ দূরে চলে গেলেন। কেমন একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা নেমে এল মা, মায়া ও আমার মধ্যে। তীব্র অনুভূতি-প্রবণা মেয়ে মায়া—সে বুঝতে পারল পরিস্থিতিটা। আমার পক্ষে সে সময় কোন কিছু উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না। কারণ আমি তখনও ওদের সব কিছু

সম্পর্কে ছিলাম অপরিচিত ও অপরিজ্ঞাত। মায়া তাই সেই অবস্থার আবরণ উম্মোচন করে দিলে একটি কথায়, 'আপনি মা বলে ডাকতে আমার দাদার কথা মনে পড়ে গেছে মায়ের।'

আমি মায়ার দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকালাম। পরক্ষণে মায়ের দিকেও দৃষ্টি পড়ল। দেখলাম মায়ের দু' গালে তখন মুক্তোর মত অশ্রুধারা। তখনই সংক্ষেপে মায়া জানালো আমায় সমস্ত ব্যাপারটা। বাবা মারা গেলে দারিদ্র্য আর অনাহারে, আত্মীয়স্বজনের অহেতুক আক্রমণ ও নিষ্ঠুর নির্যাতনে লাঞ্ছিতা মাকে একদিন ছেলে-মেয়েদের হাত ধরে পথে বেরিয়ে পড়তে হয়। তারপর তিনি এসে উঠেছিলেন এইখানে—এই অভিশপ্ত বস্তির রাজ্যে। এই রাজ্যের সম্রাট যে লোকটা সে লোকটা সেদিন ভার নিয়েছিল তাদের ভরণপোষণের। দাদার বয়স তখন বছর পনেরো-ষোল হবে। উঠ্‌তি সা-জোয়ান সুন্দর চেহারা দাদার। শুধু অনাহারের কৃষ্ণ-কালো স্পর্শ ছিল তার চোখে-মুখে। বস্তি-সম্রাটের করুণায় কয়েক-দিনের মধ্যেই মা ও মায়ার সঙ্গেই দাদাও ফিরে পেল তার হৃত শক্তি ও রূপ। কিন্তু সেই হল তার সর্বনাশের পথ। বস্তি-সম্রাটের হাতে তখন সে সম্পূর্ণ বন্দী। সেদিন মা-ও বোঝেন নি, দাদাও বোঝে নি।—এ কোন্ জগতে এসে নীড় বেঁধেছে তারা। প্রথম প্রথম দাদা পুলিশের হাতে ধরা পড়ত, দু' মাস তিন মাস করে জেলে থাকত, আবার বাড়ি ফিরে আসত, আবার জেলে যেত। কিন্তু তারপর কি যে হল—এক খুনের মামলায় তার বছর দশেক জেল হয়ে গেল। সেই থেকে সে জেলে। তাই যখন এ বাড়িতে দাদার মতই আরেকজন মাকে 'মা' বলে ডাকল, আবার যখন একজোড়া ভাই-বোনের স্নেহ-ভালবাসা প্রত্যক্ষ করা গেল তখন মায়ের মনটা ভারাক্রান্ত না হয়ে উঠবে কেন? আর দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত সেই অতীত কাহিনীর নিঃশব্দ প্রকাশে অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টিই বা হবে না কেন?

মায়ার মুখে এই সংবাদ পেয়ে আমি রীতিমত চমকে উঠলাম আর তার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের প্রতি আমার সমস্ত সহানুভূতি, সমস্ত আবেগ যেন কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠল। এ মা তো অসৎ নন, এ মা তো জীবনের যাত্রাপথে এই অভিশপ্ত পরিবেশকে বাসনা-কামনার অগ্নিদগ্ধ অতৃপ্তি নিয়ে বরণ করে নেন নি—গোটা দেশ ও জাতির গলিত সমাজের ধাক্কায় তিনি ছিটকে এসে পড়েছেন এখানে। আমি মনে মনে মাথা নোয়ালাম তাঁর পায়ে।

নিমেষের মধ্যে আমি বুঝে নিলাম এ মায়ের সংগ্রামী জীবনের শেষ বোধ করি আজও হয় নি। এই পরিবেশ থেকে এখনও তিনি চেষ্টা করেছেন মেয়েটাকে কোনরকমে বাঁচাতে। তাই হয়তো অন্ধ-গায়ক-সাজা লোকটার সঙ্গে ভিক্ষা করতে পাঠিয়ে দেন তাকে মাত্র দৈনিক দুটো টাকা রোজগারের আশায়। তবু তো এটা মন্দের ভাল তবু তো এতে সর্বনাশের পথ থেকে মেয়েটাকে দূরে রাখা যাবে!

এবার মাকে বুঝতে আমার আর কোন অসুবিধা হল না। মেয়েকে সাধু-সন্ন্যাসী ধরে আনতে দেখে মায়ের বোধ হয় মনে হয়েছিল, মায়া তাঁর কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সোজাসুজি কোন পথ ধরতে চাইছে এবং সে পথে সন্ন্যাসী যদি প্রতারক হয় (যা হওয়া তাঁর কাছে স্বাভাবিক) তবে মেয়েটার যে ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে, সেই কথা ভেবেই মা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি এবং মেয়ের ওপরেও বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন মায়ার সঙ্গে আমি ভাই-বোনের সম্পর্ক স্থাপন করে নিয়েছি, তখন তিনি খানিকটা আশ্বস্ত হলেন এবং শুধু আশ্বস্তই নয়, তিনি তাঁর বুকে কারারুদ্ধ সন্তানের শূন্য স্থানটিতে আমাকে স্থানও দিয়ে ফেললেন। আর তারই প্রকাশ দেখা গেল তাঁর ঐ কান্নায়।

অনেক কথা হল এর পর মায়ের সঙ্গে।

কথাটা বলে রাখি আগে। আমার থাকা-খাওয়ার জন্য আমি তাঁকে কোন খরচ করতে দেব না, এটা আমি স্থির করেই রেখেছিলাম এবং জোর করে আমি তাঁকে সেজন্য কয়েকটা টাকাও হাতে দিয়েছিলাম। কিন্তু চোখের জলে ভাসতে ভাসতে তিনি বলেছিলেন, 'এমনি করে একদিন আরেকজনের টাকা হাতে করে নিয়ে সর্বনাশ করেছিলুম বাবা! শেষ-কালে তুমি, তুমি দেখো বাবা...' এর পর আর তিনি বলতে পারেন নি, কেঁদে উঠেছিলেন আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে। আমিও চোখের জল রোধ করতে পারি নি—সজোরে তাঁর হাত দুটো চেপে ধরে বলেছিলাম, 'সেদিন আপনার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, ঠকেছিলেন—কিন্তু আজ আপনার অভিজ্ঞতা হয়েছে মা। তাছাড়া আজ যেটা আপনার ভয় সেটা আপনার মায়ার সম্পর্কে। কিন্তু মা, মায়া তো আমার কাছে আর কেউ নয়, পথে কুড়িয়ে পাওয়া একটা বোন! ঘটনাচক্রে একদিন আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। পথে কুড়িয়ে পাওয়া এই বোনটার কথা চিরকাল আমার মনে থাকবে।'

মায়া ছেলেমানুষের মত বলে উঠেছিল, 'যেতে দিলে তো!'

মা কান্নামুখেই হেসেছিলেন।

অতঃপর কথা চলল এগিয়ে।

মা জিগ্যেস করলেন, 'তোমার বাড়ি কোথায়?'

বললাম, 'নাই বা জিগ্যেস্ করলেন মা!'

'বাপ-মা আছেন?'

'আছেন।'

'তুমি সন্ন্যাসী হয়ে গেলে তাঁরা দুঃখু করবেন না?'

'সেটা তো খুব স্বাভাবিক মা।'

'তাহলে তোমার কি এটা উচিত কাজ হয়েছে বাবা?'

'সাংসারিক মানুষের দৃষ্টিতে ঠিক হয় নি—কিন্তু আমি তো

সংসারী মানুষ নই মা—তাই আমার দিক থেকে কি আমি ঠিক করি নি ?'

মা এর কি উত্তর দেবেন ? দুঃখে-জ্বালায় নির্যাতিত জীবনের চক্ররেখায় চলতে চলতে তিনি চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলেছেন। অন্ধ পুত্রস্নেহ আর কন্যা-স্নেহের গণ্ডীবদ্ধ জীবনের মধ্যে তাঁর আপন জগৎ। সে জগতের বাইরে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি কেমন যেন নিষ্করুণ বিশুষ্ক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তবে আমি তাঁকে আশ্বস্ত করলাম এই বলে 'কি জানেন, গেরুয়া পরেছি বলেই আমি ঠিক গেরুয়া-মার্কা সন্ন্যাসী নই। জীবনের চলার পথে সংসারকে ফাঁকি দিয়েও আমি সন্ন্যাসী হতে চাই নি—শুধু একটি উদ্দেশ্যই আমার জীবনে আছে সে কথা সময় এলে আপনাকে আমি বলে যাব মা। এখন যেন আমায় ভুল বুঝবেন না।'

মা কথাগুলো স্থিরভাবেই শুনলেন। মায়াও শুনল। মা কিছু বললেন না বটে, কিন্তু মায়া বলে উঠল 'তা হলে সে উদ্দেশ্যটা আপনার কি ?'

বললাম, 'সেইটেই তো এখন বলতে চাইছি না।'

কথায় কথায় সেদিন রাত হয়ে গেল অনেক। রাত্রির অভিশপ্ত জগৎ। অদ্ভুত সব চিৎকার, শব্দ, মাতালের প্রলাপ গান, হুল্লোড় আর কাতরানি সবই চলেছে এক সঙ্গে ঐক্যতান বাদনের মত। মায়াদের সেই একটিমাত্র ঘর। একদিকে শুয়েছেন মা তাঁর স্নেহের কন্যাকে বুকে নিয়ে, আমি শুয়েছি আরেক পাশে। আমার গেরুয়ার পুঁটলিতে ছিল কম্বল। তাই বিছিয়েই আমার শয্যা। আমি নাকি সাধু সন্ন্যাসী মানুষ। আমাকে এই কম্বল-শয্যাতেই মানায় !

নতুন জায়গা। নতুন পরিবেশ। অনেক রাত হয়েছিল ঘুম আসতে। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা জানি না—ঘুম

ভাঙ্গল একেবারে নারীকণ্ঠের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। আগেই বলেছি মায়াদের দাওয়াটা রাতে ভাড়া দেওয়া হত। ভাড়াটে যে সে হচ্ছে পাঁচির মা। পাঁচির মা তার বছর সাতেকের পাঁচি আর কোলের খোকাটাকে নিয়ে রাতে এখানে ঘুমোয়। ভাড়া দেয় মাসে পাঁচ টাকা। সে চিৎকার করে বলছে, 'ডাইনি মেয়েছেলেকে আর আমি ছেলে দোব না, দোব না দোব না!'

আরেকটি মহিলা বলে উঠল, 'আমি ডাইনী ভালখাকি? তোর ছেলেকে আমি কি না খাওয়াই! সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তিন টাইম তিনপো দুধ খাওয়াই। দুটো করে ছ'টা সন্দেশ খাওয়াই, কলা, পেঁপে কিছু বাদ দিই না। আর তুই বলবি আমায় ডাইনী?'

'ডাইনী না তো কি, পাঁচির মা বললে, দ্যাখ্ দিকি মাগি, ছেলের পাছাটা খিম্‌চে খিম্‌চে নখ বসিয়ে দিয়িছিস্ কি রকম? ছেলেকোলে সোহাগ করে বাবুদের কাছ থেকে পয়সা চাইবি, তখন কি খেয়াল থাকে ছেলেকে কতখানি খেমচালি? মাগো, বাছার পাছাটা একেবারে দাগড়া-দাগড়া হয়ে গ্যাছে।'

প্রতিদ্বন্দ্বী মহিলাটি বললে, 'তাহলে তুই ছেলে দিবি না?'

'না না না', পাঁচির মা চিৎকার করে উঠল।

ঘরের ভেতরে মায়া আমাকে বললে, 'বুঝতে পারছেন দাদা ব্যাপারটা?'

বললাম, 'অন্ধ গায়ক যদি তোমাকে দু' টাকা রোজে নিয়ে যেতে পারে, ছেলে ভাড়া নিয়ে ওই বা ব্যবসা চালাতে পারবে না কেন?'

'ধরেছেন তো ঠিক দেখছি।'

এই সেই জগৎ, যে জগতের রহস্য আজও অজানা।

ঝগড়া পাঁচির মার আর থামছে না যেন।

বিছানা ছেড়ে সবাই আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালাম। ভোরের

অন্ধকার তখন প্রভাতী আলোয় স্বচ্ছ হয়ে উঠছে। দেখলাম দাওয়ার নিচে দাঁড়িয়ে একটি মহিলা। এই মহিলাটিই পাঁচির মার খোকাকে নিতে এসেছিল। মাথায় কাপড় দেয়া সিঁদুরের টিপ পরা অল্প বয়সী মহিলাটি। পরনে অত্যন্ত সাদাসিধে একখানা শাড়ী। পাঁচির মা একটা শতজীর্ণ মশারি থেকে আধখানা বেরিয়ে এমনভাবে ফুঁসছে যে, দেখলে মনে হবে হাতের কাছে যদি সে কিছু পায় তো এখুনি তা ছুঁড়ে মারবে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ঐ মহিলাটিকে।

মা বললেন, 'ছ্যাখ্ পাঁচির মা, তুই ছেলে না দিস্ না দিবি, কিন্তু তুই এই সাত-সকালে মেনকাকে গাল পাড়বি কেন বল্ তো?'

'গাল কি সাধে বেরোয় মাসি! পাঁচির মা তার ছেলেটাকে মশারির ভেতর থেকে প্রায় একরকম হেঁচকা টান দিয়েই বের করে ফেললে। তারপর বললে, 'ছ্যাখো দিকি বাছার পাছাটা!'

সবাই তাকিয়ে দেখল সত্যিই ছেলেটার পাছায় দাগড়া দাগড়া দাগ।

মেনকা বললে, 'ছ্যাখো তো মাসি, ছ্যাখো ভাল করে ও দাগ খিম্‌চি কাটার দাগ, না ওগুলো মুতকুড়ি? পেটে ধরলেই ছেলের মা হয় না। নিজে সারারাত ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমোবে, ছেলেকে তুলে মোতাবে না, সারারাত মুতো ক্যাঁতায় পড়ে থাকবে ছেলে—হ্যাঁগা তাতে মুতকুড়ি হবে না মাসি? কিরে মায়া বলদিকি ভাই! তা না হলে ছেলের মর্ম আমরাও বুঝি!'

পাঁচির মা সহসা রণে ভঙ্গ দেবার মানুষ নয়। সে চিৎকার করে বলে উঠল, 'ছেলের মর্ম তুই কি বুঝবি লা—ধরিচিস পেটে, না ধরতে পারবি?'

এবার মা ধমক দিলেন পাঁচির মাকে। তারপর বললেন, 'এই সাতসকালে এসব কথা তুই তোর মতই আরেক হতভাগীকে এমন করে ইতরের মত ঘা মারবি কেন বল্‌তো? আমি তো দেখি মেনকার মত মেয়ে আমাদের এ তল্লাটে নেই—পক্ষাঘাতে পড়ে থাকা স্বামীকে

নিয়ে সে তো ভিক্ষে-সিক্ষে করে যা হয় করে বাঁচিয়ে রেখেছে। ছেলেপুলে ওর হয় নি, সে ওর কপালে নেই। কিন্তু তোর মত তো ও ভেসে বেড়ায় নি ?'

মায়ের এই একটা কথাতেই যুগপৎ দুটি বিবদমানা নারীর সম্পর্কে আমার একটা স্বচ্ছ ধারণা হয়ে গেল। বিশেষ করে মেনকা সম্পর্কে আমি কেমন যেন অভিভূত হয়ে গেলাম। যেমনি বিচিত্র তার জীবন, তেমনি বিচিত্র তার জীবিকা। তবু তার মধ্যে জীবনকে দুরারোগ্য সংক্রামক আবহাওয়া থেকে বাঁচিয়ে চলার কি অকুণ্ঠ প্রয়াস!

পাঁচির মা মায়ের কথার ওপর, বিশেষ করে তার সম্বন্ধে মায়ের 'ভেসে বেড়ানো' উক্তির প্রশ্নে কি যেন একটা কড়া কথা বলতে যাচ্ছিলো। সবে সে বলে উঠেছে, 'ছাখো মাসি', ঠিক সেই সময়ে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল—পাঁচির মার খোকাটা 'মাতি' 'মাতি' করে মেনকার দিকে দুহাত বাড়িয়ে মায়ের কোলে ছটফট করে উঠল।

মেনকা স্থির থাকতে পারল না। দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল। ছেলেটা তেমনি করে পুনরায় হাত বাড়িয়ে আরও ছটফট করে উঠল। অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের মোহানায় দাঁড়িয়ে পাঁচির মা আর স্থির থাকতে পারল না—বসিয়ে দিলে ছেলের পিঠে প্রচণ্ড একটা চাপড়। ছেলেটা ককিয়ে কেঁদে উঠল, 'মা-তি-ই-ই-ই!'

'আহা হতভাগী, ওকি করলি? আহা-আ, আ!' চেঁচিয়ে উঠে মা ছুটে গিয়ে ছেলেটাকে কেড়ে নিলেন পাঁচির মার হাত থেকে। ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে মার কোল থেকে মেনকার দিকে হাত বাড়াতে লাগল। মেনকা এগিয়ে আসতেই ছেলেটা তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুহূর্তে তার কান্না গেল থেমে এবং মুখে ফুটে উঠল শিশুর সেই মিষ্টি বোল, 'মাতি তলো—!'

মা বলে উঠলেন, 'আরে বিটুলে—'

মায়া ও আমি হেসে ফেললাম। পাঁচির মা সম্পূর্ণ পরাজিত।

তাই পরাজয়কে বিস্ময়ের আবেগে মেনে নিয়ে সে বলে উঠল, 'আশ্চর্য! ছেলে যেন আমার নয়।'

মা বললেন, 'ওরে পাঁচির মা, শিশুরা হোল অন্তর্যামী—ওরা বুঝতে পারে সব।'

পাঁচির মা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল শুধু। মেনকা পিছন ফিরে একবার তাকিয়ে জয়ের আনন্দে হাসিমুখে ছেলে কোলে চলে গেল।

আমরা ঘরের ভিতরে চলে আসছিলাম। হঠাৎ দাওয়ার নিচে সেই অন্ধ গায়ক একটা চাদর গায়ে এসে বলে উঠল, 'মা-সি-ই-ই!'

মা তাকে দেখে বলে উঠলেন, 'কি ভানু, কি খবর?'

'মায়াকে নিতে এলুম মাসি!'

'মায়া যা-বে-না!'

ভানু বললে, 'যাবে না ও, আমি আগেই বুঝেছিলুম। এই যে দাদাবাবুকেও দেখছি সামনে। মায়া কাল আমার দাদাবাবু ধরে এনেছে। এখন কি আর তার ভানুদাকে কোন কাজে লাগবে?'

মায়া বললে, 'কী আবোল-তাবোল বকছ ভানুদা?'

'আবোল-তাবোল কী! আমরা যে ওস্তাদের রাজত্বে বাস করছি—সেখানে কি এসব কথা অচল মায়া? তবে দাদাবাবুই আনো আর যাই-ই করো, তার বাজপাখীর মত নজর থেকে তুমি ফস্কাবে না কোনদিন।'

মা বললেন, 'ভানু, সব কথার একটা সীমা আছে।'

'তা আমিও জানি মাসি।'

'তবে?'

'তবে আর কি। ও সাধু-সন্নিসি দেখে মন গলবে না ওস্তাদের। তাছাড়া তার সাগরেদ বসন্তকেও তো জানো? দরকার হলে সে পারে না, এমন কোন কাজ নেই।

মা বললেন, 'তাতে আমার কী?'

'তাতে তোমার কি নয় মাসি', ভানু বলতে লাগল, 'মায়ারই ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। এই ধরো, বসন্ত বা ওস্তাদ যদি টের পায়, মায়া অন্য কোথাও ভিড়ছে, তাহলে এখুনি তারা মায়াকে টাইট দিয়ে দেবে।'

মা এবার রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, 'সেই ভয় দেখিয়েই কি তুমি মায়াকে নিতে এসেছো?'

'না মাসি!' এর পর সঙ্গে সঙ্গে ভানু গায়ের চাদরটা খুলে দু'হাত মেলে ধরে বললে, 'এই গ্যাখো—মায়া যে যাবে না সে জেনেই আমি এই ব্যবস্থা করে এসিচি!'

আশ্চর্য! দেখলাম একখণ্ড উত্তরীয় বাঁধা গলায়। তাতে ঝুলছে একটা চাবি। অর্থাৎ যেন কোন গুরুজন মারা গেছে। আর তাই সে কাছা গলায় করেছে। আমাদের বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতে ভানু অতঃপর বলে উঠল, 'মাতৃ দায় বলে আজ ট্রেনে ভিক্ষে করব—কাজেই মায়া না গেলেও আমার কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু মায়া করবে কি?'

মা চুপ করে গেলেন। কোন কথা বলতে পারলেন না। সব কথার শেষ কথা—মায়া করবে কী! এই কথাটাতেই তিনি কেমন যেন চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

সেইখানে সেই সকালবেলায় দাঁড়িয়ে প্রভাতের ক্রমবর্ণায়মান আকাশের মত আমার মনের দিগন্তে যেন কোন এক ক্রমবর্ণায়মান জগৎ ধীরে ধীরে প্রকাশিত হতে লাগল। যে রাজত্বে বাস করে এরা, সে রাজত্বে আছে সম্রাট আর সে সম্রাটকে বলে এরা ওস্তাদ। ওস্তাদের সাগরেদ আছে—সে সাগরেদের নাম বসন্ত। ওস্তাদের বাজপাখীর মত নজর। সে নজর থেকে মায়া ফস্কাবে না। তার ওপর বসন্ত—দরকার হলে সে পারে না এমন কোন কাজ নেই। সহসা বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা ভয়ের শিহরণ শুরু হল। ইতিপূর্বে মায়ার দাদা প্রসঙ্গে এই সম্রাট বা ওস্তাদের কথা শুনেছি।

তখন তা শুনে কিন্তু আমি এতখানি ভয় পাই নি—যা এখন পেলাম। এমনিতরো এক ভয়ংকর পরিবেশের মধ্যে মা কি পারবেন তাঁর স্নেহের কন্যাটিকে মনের ডানা দিয়ে আড়াল করে রাখতে? মন আমার হু হু করে উঠল। না, না, মা কিছুতেই পারবে না।

ভানু তখনও যায় নি। যাবার সময় সে শুধু বলে উঠল 'মাসি যতই যা করো, এই শর্মাকে তোমার দরকার হবেই—মায়া যখন ছোট্ট এতটুকু, তখন থেকে আমিই ওকে দেখিচি আর দরকার হলে আমিই ওকে রক্ষে করতে পারব। আর কেউ নয়—'

মা বললেন, 'ভানু, এসব কথা তো আমি বলি নি তোমায়! মায়া যাবে না কেন সে তুমিও বোঝো, আমিও বুঝি। একটা ভদ্দর লোকের ছেলে, হতে পারে সন্নিসি, সে এসেছে আমার বাড়ীতে। তাকে রেখে মায়ার যাওয়াটা কি ঠিক হবে?'

'আমিও তো সেকথা বলি নি মাসি! ভানু বললে, 'যদি মায়ার মনে 'সন্নিসির গেরুয়ার মত রঙ ধরে থাকে, তাহলে যে তার রক্ষে নেই, আমি শুধু সেই কথাটাই বলতে চেয়েছি।'

'কি বলছ ভানু' মা বললেন, 'ওদের মধ্যে ভাই-বোনের সম্পর্ক

ভানু প্রায় এক বিঘৎ জিব কেটে বলে উঠল, 'আরে তোবা তোবা, এতক্ষণ বলতে হয়। সন্নিসি ঠাকুর আমার দাদামণি। ছিঃ ছিঃ আমি শুধু এতক্ষণ আসমানেই ঘুসি ছুঁড়িছি।'

এবার মায়া বললে, 'মানে?'

'মানে তুই বুঝতে পারলি না! তোর বয়স হয়েছে। এখন তোর মনে কত রঙ লাগবে। সে রঙে ডগমগ হয়ে তুই কি আর আমায় দেখতে পারবি? আমি সেই কথাটাই বলতে গেসলুম। এখন দেখছি শালা একেবারে উল্টো!'

'কেন তোমার মনে এসব কথা উঠছে বলদিকি?'

'মনটা মানুষের এমনিই রে!' ভানু বলতে লাগল, 'যাকে স্নেহ

করা যায় ভালবাসা যায়, অপরে সেখানে নাক গলাতে এলে বড় কষ্ট হয় রে, বড় কষ্ট হয়। হ্যাঁরে মায়া, আমি কি তোকে ফেলতে পারব কখনো? তুই বুঝিস না আমাকে? তোর দাদা শংকর আর আমি, আমরা যে পরস্পর দুটো ভায়ের মত রে! যাক্, আমার বেলা হয়ে যাচ্ছে—আমি চলি!' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'দাদামণি—ভাই কিছু মনে কোরো না—ভুল করে আমি তোমার সম্বন্ধে ওসব কথা ভেবিচি।'

ভানু চলে যেতে আরেক অনুভূতি আমার মনকে আচ্ছন্ন করে তুলল। এক নোংরা অভিশপ্তময় জগতে এরা বাস করে, কিন্তু অদ্ভুত সব মানুষ। নিজেদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না সবই এদের অন্যান্য মানুষের মত। সেখানে একটুও তফাত নেই। 'যাকে স্নেহ করা যায়, যাকে ভালবাসা যায়, অপরে সেখানে নাক গলাতে এলে বড় কষ্ট হয় রে, বড় কষ্ট হয়'—এই সহজ সত্য কথাটা আমি জীবনে কখনো ভুলব না। নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনে এ তো আমরা অহরহ দেখি। মা তার পুত্রকে স্নেহ করে এবং সে স্নেহের তুলনা হয় না, কিন্তু যেই পুত্রবধূ আসে ঘরে, যেই সে পুত্রবধূ স্বামীকে তার আরও বেশি কাছে টানতে চায়, সেই মা তার সব কিছু যেন চলে যাচ্ছে বলে হাহাকার করে ওঠে, ক্ষুব্ধ হয়, যত রাশ টেনে ধরতে চায়, তত যেন হারাবার ভয় হয়। অনেক স্ত্রীকে এ অবস্থায়ও পড়তে দেখা যায়, স্বামী যখন অন্য মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করছে তখন সে কিছুতেই তা সহ্য করতে পারছে না। তার একান্ত ভালবাসার পাত্রের ওপরে অপরে ভাগ বসাচ্ছে—এ সে সহ্য করবে কি করে? বন্ধুত্বের ক্ষেত্রেও তাই। তাই ভানুর কথাটায় তার ওপর মনটা আমার কেমন যেন প্রসন্ন হয়ে উঠল। গতকাল হতে অন্ধ সাজা থেকে আজকের কাছা গলায় করে তার ভিক্ষা উপার্জনের চেষ্টা—এ দেখে তার যে লোক ঠকানো চরিত্র—সে চরিত্রে যে এমন মাধুর্য আছে—এ আমি ধারণাও করতে পারি নি। এখন এই

মুহূর্তে সেটুকু প্রত্যক্ষ করে মনটা যেমন প্রসন্ন হয়ে উঠল, তেমনিই এক স্নিগ্ধ-সুন্দর পরিবেশের মধ্যে আমি যেন এক অন্য লোকের সন্ধান পেলাম।

আমার মনের প্রসন্নগম্ভীর প্রতিচ্ছবি বোধ করি আমার মুখমণ্ডলে ফুটে উঠেছিল এবং মা ও মায়া দুজনের কাছেই তা ধরা পড়েছিল, তাই দুজনেই ওরা একসঙ্গে ঘরে যাবার জন্য আমাকে ইঙ্গিত করলেন।

আমি ঘরে এলাম। ওঁরাও আমার পিছন পিছন এলেন।

পাঁচির মা তখনও গজ গজ করছিল। বিরক্তি যেন তার থামার নয়। গজ গজ করতে করতে বললে, 'সাত বছরের বুড়ো মেয়ে তুইও রোজ বিছানায় মুতবি?'

পাঁচি নাকি সুরে বললে, 'আমি নাকি—ভাই তো!'

'হারামজাদি, ভাই যদি মুতবে তো তোর জাঙিয়া ভিজে কেন?"

'হ্যাঁ, বলেছে ভিজে?'

'কি—কি এটা' বোধ হয় পাঁচির জাঙিয়া ধরে পাঁচির মা গোটাকতক হেঁচকা টান মারলে। পাঁচি বললে—'এ রকম করলে আমি পালাবো!'

'পালাবি কোথায়—পালা না!'

'পালাবই তো!' দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম পাঁচি ভোঁ ভোঁ করে দৌড় দিলে কোথায়। পাঁচির মা গজ গজ করতে করতে বলতে লাগল, 'পালা না, মরগে না—তোর সেই বাবাটা, কাণাকড়ি মুরোদ নেই যে মিন্সেটার, সেই তো সম্বল তোর। মোল্লার দৌড় মসজিদ। যাবি কোথায়, তিন কুলে সব খেয়ে বসে আছিস। সেখানেই তো যাবি। তা সেখানে কি তোকে দু-মুঠো দেবে, সেখানে আছে জাঁহাবাজ মাগি, সোহাগিনী সুন্দুরি! দেবে মুড়ো ঝাঁটা মুখে গুঁজে! আবার এলতলা, বেলতলা—সেই পাঁচির মার ছেঁচতলা—যাবি কোথা লো হারামজাদি!'

এর পর মা বললেন, 'দেখলে তো বাবা এখানে আমরা কি সুখে থাকি ?'

আমি ঘাড় নাড়লাম।

মা বললেন, 'মায়া, যা এবার তোর দাদার চা-টার ব্যবস্থা কর! সেই ঘুম থেকে উঠতে না উঠতে বেচারী শুধু ঝগড়াই শুনছে।'

'বললাম. 'তাড়াতাড়ি করতে হবে না। আমি মুখটুখ ধুই মা! তারপর চা খাব।'

চা-টা খাওয়ার পর বেলা বেড়ে চলল।

নিয়মিত অভ্যাসের বশে মায়াকে দিয়ে একখানা খবরের কাগজ আনিয়েছিলাম। সেটাই তন্ন তন্ন করে পড়ছিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে কেমন করে যেন রটে গিয়েছিল মায়াদের বাড়ী এক গেরুয়াপরা সন্ন্যাসী এসেছে। এখানে যারা আসে তাদের ওপরটাকে কেউ বিশ্বাস করে না। ভিতরে সে কী—সেইটাই সবাই জানতে উৎসুক। তারই জন্যে দুজন একজন করে লোক আসছিল মায়াদের বাড়িতে। মা দাওয়ায় তোলা উনুনে রান্না করছিলেন। মায়া মাকে সাহায্য করছিল টিউবওয়েল থেকে জল এনে দিয়ে, তরকারি কুটে, বাটনা বেটে।

লোকে আসছিল আর মাকে জিজ্ঞাসা করছিল, 'সাধুটি কে গো ?'

মা বলছিলেন, 'সাধু সাধুই—সাধু আমাদের আবার কে হতে যাবে!'

কয়েকবার কয়েকজন স্ত্রীলোক আর পুরুষও উঁকি দিয়ে আমাকে দেখে গেল। আমিও তাদের মুখ তুলে তুলে কয়েকবার দেখলাম। সকলের মুখেই কেমন একটা অনুসন্ধিৎসু ভাব! এর পর একটি মুখ আমার নজরে পড়ল—যে মুখখানা শুধু আমাকে একবার দেখেই চলে গেল না—ঘরের মধ্যে ধীরস্থিরভাবে এসে ঢুকে পড়ল। সুন্দর একটি যুবক। বয়স হয়তো আমার চেয়ে বছর পাঁচ-সাতেক ছোট

হবে। হয়তো সতেরো-আঠারো। আমি তার চোখের দিকে তাকাতে, সেও নিষ্পলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো। সে এসে আমাকে প্রণাম করল।

এ রাজ্যে এমন সহবৎ আছে! বিস্ময়ে তার দিকে তাকালাম। তারপর বললাম, 'বোসো।'

ছেলেটি বসল।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি নাম ভাই তোমার?'

'মণ্টু।'

'হঠাৎ আমার কাছে কি মনে করে এলে মণ্টু?'

'এমনই। শুনলুম যে আপনি একজন সাধু—আমাদের এখানে এসেছেন, তাই এলুম।'

'সাধু শুনেই এলে?'

মণ্টু ঘাড় নেড়ে জানালো, 'হ্যাঁ।'

বললাম, 'একটু খোঁজ নিলে না—আমি সত্যিকারের সাধু না ভণ্ড সাধু।'

'ভণ্ড হবেন কেন?'

'তোমার কি বিশ্বাস হল, আমি ভাল সাধু?'

'সেই মনে করেই তো এসিছি!' মণ্টু আরও বললে, 'ভণ্ড সাধু হলে কখনো খবরের কাগজ পড়তেন না।'

'তুমি লেখাপড়া করো?'

'না।'

'কি করো?'

মণ্টুর মুখে বেদনামিশ্রিত হাসি ফুটে উঠল আমার প্রশ্নে। বেশ বুঝতে পারলাম, এই অভিশপ্ত জগতে আবার এমন একটি চরিত্র পেলাম—যাকে পরবর্তী সময়ে এক অদ্ভুত ধরনের বলে মনে হতে পারে।

মণ্টুর মুখে বেদনামিশ্রিত হাসি দেখে আমি বলে উঠলাম,

'তুমি অমন করে হাসলে কেন বলো তো? আমি তো তোমায় শুধু লেখাপড়া না করে কী করো, তাই জিজ্ঞেস করেছি!'

ঘাড় নিচু করে সে বললে 'সে ঠিক বলার মত কিছু নয়।'

'কি এমন কাজ কারো যে, বলার মত নয়?'

মন্টু শুধু আমার দিকে লজ্জা-ভীত-দৃষ্টিতে তাকালো, কোন জবাব দিতে পারল না। বোধ করি, জবাব দেয়ার মত তার তখন কিছু ছিলও না। কারণ, সে যে কাজ করে তা লোকের কাছে প্রকাশ করার মত নয়। আর যদিও বা কোন সময় কোন লোকের কাছে তা প্রকাশযোগ্য হয়. তবে তা আমার মত সন্ন্যাসী মানুষের কাছে একেবারেই নিষিদ্ধ। এটা আমি তখন জানতে পারি নি, জেনেছিলাম পরে। সেদিন, সেই মুহূর্তে সে আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয় করে খাওয়া দাওয়া হলে আবার আসবে বলে চলে গিয়েছিল। আমি বলেছিলাম, 'এসো।'

সে চলে গেলে মায়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ছেলেটা কেমন বলো তো মায়া?'

'কেমন দেখলেন?'

'ওকে দেখে তো আমার খুব বুদ্ধিমান বলেই মনে হল।'

'হ্যাঁ তা ঠিক। তাছাড়া ওর অনেক গুণও আছে।'

কি রকম?'

'ওস্তাদ আর বসন্ত ওরা দুজনেই মন্টুকে খুব ভালবাসে।'

অদ্ভুত গুণের পরিচয় দিলে মায়া। ওস্তাদ আর বসন্ত তাকে ভালবাসলেই তার অনেক গুণ আছে বুঝতে হবে—ঠিক এ ধরনের কথা আমি তার কাছে আশা করি নি। বরং এতে তার গুণ সম্পর্কে আমার কেমন একটা বিশ্রী ধারণা হয়ে গেল। কারণ, অনুভব করলাম সে গুণ কখনো সদ্‌গুণ হতে পারে না। তবে মন্টুকে দেখে এবং তার সঙ্গে কথা বলে ছেলেটাকেও আমি অন্য-ভাবে অর্থাৎ খারাপভাবে দেখতে পারি নি। তাই অনুসন্ধিৎসুর

মত জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু কেন ওরা ভালবাসে তা জানো কী?'

'না, তা জানি না।'

সত্যিই কেন যে ওরা ওকে ভালবাসে তখন বুঝি নি, বুঝেছিলাম পরে। মায়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মন্টুর আর কে আছে?'

'এক মাসি ছাড়া ওর আর কেউ নেই।'

'এখানেই থাকেন?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি কি করেন?'

এবার মায়া উত্তর দিলে না, মা বলে উঠলেন, 'বাবা, এখানে যে পোড়াকপালীরা এসে বাসা বাঁধে, তাদের জবনে কাজকর্মের কি কোন ঠিক-ঠিকানা থাকে, না তারা সহজভাবে দিন কাটাতে পারে? তাদের বেঁচে থাকার জন্যে এমন কিছু করতে হয়, যার পরিচয় দেবার মতও কিছু থাকে না, আর ইচ্ছে করলেও তারা তা থেকে সরে যেতে পারে না।'

মায়ের কথায় কেমন সন্দেহ হল মন্টুর মাসি সম্পর্কে। হয়তো সত্যিই পরিচয় দেবার মত কোন কাজ তিনি করেন না। আর করবেনই বা কি করে? এ রাজ্যে তাঁর ইচ্ছার দাম দেবে কে? এখানে সম্রাট আছে এখানে আছে তার মন্ত্রী। সম্ভবত তাদের খেয়াল-খুশি ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপরই তাঁকে নির্ভর করতে হয়।

আহারাদির পর আবার খবরের কাগজটা নিয়ে বসেছিলাম। ভাবছিলাম বাকিটা শেষ করে ফেলব, এমন সময় মন্টু এসে হাজির হল। বললাম, 'কি খবর মন্টু?'

মন্টু তেমনি ধীর-স্থির সলজ্জভাবে আমার দিকে এগিয়ে এল।

বললাম, 'বোসো।'

সে বললে, 'না বসব না।'

'কেন ?

'আপনাকে একবার আমাদের বাড়ি নিয়ে যাবো—মাসি বলে দিলে।'

'সে কি!' অবাক হয়ে আমি বললাম। মন্টু বললে, 'মাসি বলছিল, আপনি সাধু-সন্নিসি মানুষ, আমাদের বাড়িতে আপনার পায়ের ধূলো পড়লে আমাদের জীবন সার্থক হবে।'

আমি হাসতে হাসতে মা ও মায়ার দিকে তাকালাম। তারপর মন্টুর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'মন্টু, তোমার মাসির ধারণা ভুল। আমি কোন পেশাদার সাধু নই।'

মায়া হেসে বলে উঠল, 'দাদা পেশাদার সাধুটা কি ?'

'বুঝলে না কথাটা ? যারা সাধুগিরির ব্যবসা করে আর কি।'

'সাধুগিরির আবার ব্যবসা আছে নাকি ?'

'আছে বলেই তো বললাম', বলে আমি মন্টুর দিকে তাকালাম। মন্টুর মুখে-চোখে দেখলাম, এক অদ্ভুত নিষ্ঠা। সম্ভবত সাধু বলে সে আমাকে দেখতে চায় নি, মানুষ বলেই সে আমাকে দেখেছে এবং মাসিকে গিয়ে হয়তো সেই কথাই বলেছে। মাসি তাই এই মানব-দুর্ভিক্ষের জগতে মানুষ হিসাবেই আমাকে দেখতে চেয়েছেন। তাই হয়তো আমাকে নিয়ে যাবার এই তাগিদ।

কিন্তু আশ্চর্য হলাম অন্য কথা ভেবে। এই রাজ্যে মানুষের যা পেশা বা জীবিকা, সে পেশা-জীবিকার প্রতি আগ্রহে এদের কি ভয় বলেও কিছু নেই ? এমনও তো হতে পারে, আমার মত গেরুয়া পরে বা ছদ্মবেশে কোন গোয়েন্দাও তো আসতে পারে ? এমনি করে আমার মত ধীরে ধীরে ওদের সঙ্গে মেলামেশা করে তারপর সবশুদ্ধ ওদের ধরপাকড় করে জেলে নিয়ে যেতে পারে। এদের জীবন ও জীবিকা যদি সভ্যজগতের অনুমোদিত রাস্তা ধরে না চলে, তবে তো এদের ভয় পাওয়ারই কথা আমার মত উটকো আগন্তুককে দেখে। কিন্তু তথাপি এরা আমাকে এত আপন করে

নেয়ার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠছে কেন? তবে কি মানুষের মনোরাজ্যে পেটের ক্ষুধার মত, দেহের ক্ষুধার মত, মানুষের ক্ষুধাও আছে—যে মানুষকে মন দিয়ে ওরা ক্ষুধা মেটাবে? কে জানে—এই হয়তো মানুষের জীবনে চিরন্তন সত্য, শাশ্বত, বাস্তব!

আমি অস্বীকার করলাম না মন্টুকে। বললাম, 'চলো মন্টু আমি যাব তোমাদের বাড়ি।' কিন্তু কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের কানে আমার কেমন যেন বেখাপ্পা লাগল। আরও বেখাপ্পা লাগল আমার গেরুয়াটা। সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, যে গেরুয়া আমি পরেছি নিজের পরিচয় গোপন করার উদ্দেশ্যে, তার যেন আর কোন প্রয়োজনই নেই আমার কাছে। এই গেরুয়া পরে মন্টুর সঙ্গে আমি পথ দিয়ে যাব--দুসারি লোক আমায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে। এখানকার পরিবেশে সবাই কি তারা আমায় সাধু বলে ভাববে? বরং তারা মনে করবে, এই রাজ্যেরই আমি কোন ভণ্ড তাপস্বী, মানুষকে ঠকিয়ে জীবিকা উপার্জনের জন্য ভেক ধরেছি এই গেরুয়ার। অথচ সত্যিই আমি সাধু নই --আমি যা আমি তা-ই--কিন্তু সে পরিচয়ও আমার ঢাকা পড়ে যাবে তাদের চিন্তার পলেস্তারায়। তাই আমার মনে হল, গেরুয়াটা ত্যাগ করতে পারলেই আমি বাঁচি। কিন্তু উপায় নেই।

মন্টু ইতিমধ্যে উৎসাহিত হয়ে বললে, 'তাহলে চলুন—'

আমি মায়ার দিকে তাকালাম। মায়াদের এখানে এসে উঠেছি আমি, নেহাৎই ঘটনাচক্রে। তবুও তাদের এখানে এসেই আমার মন্টুর সঙ্গে পরিচয়। এখন মায়াদের দূরে সরিয়ে রেখে যদি মন্টুদের ওখানে আমি পৃথকভাবে হৃদ্যতা স্থাপন করতে যাই, তবে তাতে তাদের প্রতি আমার অবজ্ঞাই প্রকাশ পাবে। অথচ সেরকম কিছু করা আমার মনের অভিপ্রায় নয়। তাই আমি মায়াকে বললাম, 'মায়া চলো ঘুরে আসি মন্টুদের বাড়ি থেকে।'

মায়া রীতিমত খুশি হয়ে উঠল। সে যেন মনে মনে এইটুকুই আশা করছিল। আমার কথায় সে পরম উৎসাহভরে বলে উঠল, 'চলুন।'

সেই বস্তির আঁকাবাঁকা গোলকধাঁধার মত পথ। ঘুরে ঘুরে আমরা চলতে লাগলাম। মাত্র মিনিট তুই-তিনের পথ। তবু মনে হল যেন অনেক দূরে এসে পড়লাম। মায়াদেরই অনুরূপ একখানা ঘরের দাওয়ার সামনে এসে মণ্টু খুশি মনে ডেকে উঠল, 'মা—সি।'

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন নাকে তিলক কাটা এক মধ্যবয়সী বৈষ্ণবী মহিলা। তিনি বেরিয়ে আসার মধ্যে শুধু মুহূর্ত-মাত্র —হঠাৎ আমি বিস্ময়ে বলে উঠলাম, 'রা নী-দি।'

'বি-জ ন!' তিনিও চিৎকার করে উঠলেন।

আরও একটা মুহূর্ত! রানীদি ছুটে এসে আবেগের সঙ্গে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। হঠাৎই আমি কেমন যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। তাঁর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে তাকালাম, মায়া আর মণ্টুর দিকে। ওদের চোখে তখন গভীর বিস্ময়! ওরা নিশ্চয়ই ভেবে নিয়েছে রানীদি আমার পূর্বপরিচিত এবং বহুদিন অদেখার পর আজই বোধ করি যবনিকা উঠল সর্বপ্রথম।

বাস্তবিক ওদের সে বিস্ময় আদৌ অমূলক নয়। শুধু ওদেরই বা বলব কি—এ বিস্ময় তো আমারও। কত দিন, কত বছর পার হয়ে গেছে, হঠাৎ এমন অবস্থায় আমি রানীদিকে দেখব, এ তো আমিও কোনদিন ভাবি নি। প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতে রানীদি বললেন, 'চ চ ঘরে চ।' তারপর একরকম ঠেলেঠুলে রানীদি আমায় তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। তারপর ডাকলেন, 'আয় মায়া, আয় মণ্টু। মণ্টু, বিজন তোর মামা হয়রে—প্রণাম কর মামাকে!'

মণ্টু প্রণাম করল আমাকে।

ঘরের ভিতরটা রানীদির এক অপূর্ব সুষমায় পূর্ণ। একদিকে

কৃষ্ণ-রাধিকার যুগলমূর্তি। সামনে একটা চৌকি। চৌকির ওপরে ধূপদানিতে জ্বলছে ধূপ। সামনে জড়ো করা অজস্র ফুল। পাশে চন্দনের বাটি আর চন্দনপিঁড়ি। ঘরের একদিকে একখানা তক্তাপোশ। তাতে সুন্দর একটি শুভ্রশয্যা পাতা। একদিকে আনলা, আলমারি, নিচে জলচৌকিতে বাসন আর তৈজসপত্র। ঘরের উপরদিকটায় শুভ্র চাদরের চাঁদোয়া। সত্যিই ভিতরটা সুরুচির পরিচয়ে পরিচ্ছন্ন।

মণ্টু আমাকে প্রণাম করে উঠতেই রানীদি বললেন, 'বিজন এখানে এই নরককুণ্ডে তোর সঙ্গে আবার কখনো দেখা হবে, এ আমি কখনো ভাবি নি!'

'আমিও ভাবি নি রানীদি!'

'কিন্তু এ তোর কি রূপ রে,' এবার রানীদি মেয়েদের স্বাভাবিক শাসক-মূর্তিতে ফুটে উঠে আমাকে বললেন, 'তুই সন্নিসি হতে গেলি কোন্ দুঃখেরে?' তারপর বললেন, 'আচ্ছা আগে বোস্ তারপর বলছি।'

শুভ্র বিছানার ওপর বসতে বসতে আমি বললাম, 'দুঃখে কি মানুষ সন্নিসি হয় রানীদি?'

'দুঃখে নয়তো কি', রানীদি বললেন, যাক্গে আগে বল্ কাকাবাবু কাকিমা সব কেমন আছেন—তোর আর আর ভাইবোনেরা?'

'সবাই ভাল আছেন।'

'কাকাবাবুর, শরীরটা বেশ ভাল?'

'বুড়ো হয়েছেন তো?'

'কাকিমা তেমনিই পরোপকার করে বেড়ান?'

'মা আমার দেবী ভগবতী। বিপদ-আপদ কারো দেখলে তেমনিভাবেই ছুটে যায়।'

'আহা—অমন মানুষ হয় না।'

আনন্দের উচ্ছ্বাসে রানীদির মনের সবগুলো দরজা যেন একসঙ্গে

খুলে গেছে। অনর্গল তিনি অতীতের দিনগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগলেন।

'কতদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা হল, বল্ তো বিজন ?'

'প্রায় বারো বছর পরে।'

'বারো বছর—উঃ একটা যুগ!

হ্যাঁরে বিজন! তোর মনে পড়ে আমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে তুই ঘুমোতিস ?

বললাম, 'পড়ে।'

'রানীদিকে না দেখতে পেয়ে তোর কষ্ট হয়েছিল প্রথম প্রথম ?'

'হ্যাঁ।'

'কি করে তোরা আমাকে ভুলে গেলি বল্‌তো ?'

বলতে যাচ্ছিলাম, রানীদি তোমায় তো আমরা ভুলি নি, তুমিই আমাদের ত্যাগ করে চলে এসেছিলে। কিন্তু পাছে মণ্টু বা মায়ার মনে বেচারার চলে আসা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠে পড়ে, সেই ভেবে আমি বলতে পারলাম না। কিন্তু রানীদি দেখলাম, সে প্রশ্নের মীমাংসা নিজেই করে দিলেন। তিনি বললেন, 'আমি জানিরে জানি। তোরা সবাই ভেবেছিলি রানীদি মেয়েছেলে হয়ে যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গেছে, তখন সে জাহান্নামের পথই ধরেছে। তাই অসতী কুলটা মেয়ের আর কে খবর রাখবে বল্ ?'

বললাম, 'রানীদি এ কথা কেউ যে মনে করে নি, তা নয়। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো, আমি কোনদিন তা মনে করি নি।'

রানীদি বললেন, 'ঠিক বলচিস্ ?'

'হ্যাঁ রানীদি।'

রানীদি হঠাৎ যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর সেই ভাবেই বললেন, 'জানি না মানুষের মন অন্তর্যামী কিনা, মণ্টুর কাছে যখন তোর কথা শুনলাম, তখন কেবলই আমার মনে হচ্ছিল যেন আমার খুব আপনজন এসেছে মায়াদের বাড়িতে। শুধু বার বার

মনে হচ্ছিল, হয়তো কোনদিনই আমার কথা কেউ জানবে না, জানতে চাইবেও না। তবু যদি কোন আপনার লোককে সকল ঘটনা জানিয়ে যেতে পারি তাতে আর কিছু না হোক্, বংশের কলঙ্কটা মুছে যাবে।'

'কিন্তু আমি তো জানি রানীদি তুমি কলঙ্কিনী নও।'

'সব কথা তুই জানিস?'

'জানি।'

'কি করে জান্‌লি?'

'মনে নেই তোমার—আমার হাতের লেখা ভাল বলে সন্দেশ রসোগোল্লা খাইয়ে তুমি জামাইবাবুকে চিঠি লেখাতে আমাকে দিয়ে?'

'সে সব কথা তোর মনে আছে?'

'সব মনে আছে। কিছুই আমি ভুলি নি।'

'যাক্ গে, কি কথায় সব কি কথা এসে যাচ্ছে' বলে একটা উদ্‌গত দীর্ঘশ্বাসকে বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে রানীদি বললেন, 'ওরে মণ্টু, মামাকে জল দে—বহুদিন পরে ওকে আমি পেয়েছি। ওকে আমার ঠাকুরের প্রসাদ দিই।'

এবার দুষ্টুমি করে বলে উঠলাম, 'প্রসাদ আমি খাব না।'

'কেন?'

'আমি মিষ্টি খেতে পারি তোমার হাতে। ঠাকুরের প্রসাদ আমি খাব না।'

সেই এক প্রশ্ন, 'কেন?'

'ঠাকুরের চেয়ে আমার দিদির প্রসাদ আমার কাছে অনেক সত্যি।'

'সে কি রে, অমন কথা মুখে আনিস্ নি, পাপ হবে!'

'তোমার ঠাকুরের কি পাওয়ার আছে যে আমায় পাপ দেবে?'

'ছিঃ ছিঃ অমন কথা মুখে আনিস্ নি বিজন। এতে তো তোর সাধু হওয়াই মিছে হয়ে যাবে!'

'আমি তো সাধু নই।'

'তবে গেরুয়া পরিচিস্ যে!'

'শিগ্‌গিরই পরা ছেড়ে দেবো!'

'রানীদি আমার পেরে না উঠে শেষ পর্যন্ত বললেন, 'তুই ঠিক ছেলেবেলার মতই আছিস বিজন—একটুও যদি বদলে থাকিস্? যাক, তোকে ঠাকুরের প্রসাদ খেতে হবে না আমিই তোকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছি নিজে হাতে। মণ্টু যা তো বাবা একবার'...তারপর আঁচল থেকে পয়সা খুলে মণ্টুকে দোকানে পাঠালেন রানীদি।

মণ্টু চলে যেতে রানীদি সস্নেহে মায়াকে বললেন, 'তোদের বাড়িতে এই দস্যিটা কি করে এল রে?'

মায়া তার যথাযথ বিবরণ দিলে। রানীদি বললেন, 'তা-ই। চিরটা কাল ও এমনিই। কারো হাঁকডাক বারণ কিছু শুনত না। তাই হয়তো কারোকে না মেনে সোজা ও বেরিয়ে পড়েছে সন্নিসি সেজে। তারপর কৌতূহল হয়েছে তোর সঙ্গে চলে এসেছে, তোদের বাড়িতে দেখবে এখানে কি আছে।'

'ঠিক বলেছো মাসি।'

একেবারে মিথ্যে বলেন নি রানীদি। প্রথম দিকটা সত্যি না হোক্, শেষদিকটা যে সত্যি সে তো আর আমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না। কিন্তু আশ্চর্য, কতদিন পরেও রানীদি আমাকে মনে রেখেছেন, একেবারে ঠিক ঠিকভাবে মনে রেখেছেন ভেবে আমি যার পর-নাই বিস্মিত হয়ে যাচ্ছি। আমার স্বভাবটি পর্যন্ত তিনি ভোলেন নি।

ইতিমধ্যে মণ্টু এসে পড়ল মিষ্টি কিনে নিয়ে।

ছোট্ট একখানি ঘর। সেখানে আড়াল করার কিছু নেই। রানীদি মণ্টুর হাত থেকে মিষ্টির ঠোঙাটা নিয়ে চৌকির ওপর থেকে

একখানা রেকাবি তুলে নিলেন। তারপর মিষ্টিগুলো রেকাবিতে ঢেলে আমার দিকে এগিয়ে এলেন।

বললাম, 'রেকাবিতে করে আমি তো খাব না রানীদি। তুমি কি আমায় কুটুম পেয়েছো। আমি তোমার ভাই নই?'

রানীদি হেসে বললেন, 'আমি কি সে কথাই বলিছিরে পাগলা! মিষ্টিগুলো একটা জায়গায় তো ঢালতে হবে। আয় না, আমি তোকে খাইয়ে দিচ্ছি।'

'এই তো আমার দিদির কথা।'

'তুই যে ঠিক সেইরকমই আছিস্ এ তো আমি তোকে আগেই বলিছি। আয় নে—'

আমি বিছানায় বসে মুখ বাড়িয়ে হাঁ করলাম। রানীদি টুক্‌টুক্ করে সন্দেশগুলো আমার গালে ফেলে দিতে লাগলেন আর আমি খেয়ে যেতে লাগলাম।

মিষ্টির ঠোঙা মাসিকে দিয়ে ইতিমধ্যেই জলের গ্লাস হাতে মণ্টু পাশে দাঁড়িয়েছিল। সব মিষ্টিগুলো শেষ করবার আগে আমি মণ্টুর দিকে জলের গ্লাসের জন্য হাত বাড়ালাম। মণ্টু এগিয়ে আমাকে জল দিলে। জল খাবার পর রানীদিকে বললাম. আমি আর খাব না।' এবার মায়া আর মণ্টুকে দাও—'

মায়া ও মণ্টু দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠল, 'না. না।'

আমি ওদের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তা হয় না—আমি বলছি খেতে তোমাদের হবেই।'

অগত্যা রানীদিকেও বলতে হল, 'নে তোরা খা।'

রানীদি সম্ভবত আমাকে খাওয়ানোর তৃপ্তিটা ভাল করেই অনুভব করেছিলেন। তাই তারই আবেগে তিনি বলে উঠলেন. 'বিজন কতদিন পরে তুই আবার আমার হাতে খেলি বল্ তো?'

'রানীদি, এ-ও সেই বারো বছর পরে। তুমি যাকে একটু আগে বল্‌লে একটা যুগ।'

'হ্যাঁ একটা যুগই বটে।'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস তাঁর বুক থেকে বাইরে আছাড় খেয়ে পড়ল। সম্ভবত অনেক অতীতের কথা মনে পড়ে মনটা তাঁর হু হু করে উঠল। বাস্তবিক মানুষের জীবনে কোথায় যে কোন্ হারানো সূত্র থাকে, আর কোথায়ই বা থাকে তার আবার মিলনসূত্র তা মানুষ হয়ত নিজেই জানতে পারে না। অথচ ব্যাপারটা কত সত্যি!

রানীদির সঙ্গে আমার কতদিনের সম্পর্ক এবং তা যে কত নিবিড় তা মায়া বা মণ্টু কারোর কাছেই আর অস্পষ্ট রইল না। মায়া সম্ভবত মনে করল সে থাকলে রানীদি আর আমার মধ্যে হয়তো কথা-বার্তার কিছু অসুবিধা হবে অথবা যেখানে গভীর হৃদয়াবেগের প্রশ্ন ও বিস্ময় জড়িত, সেখানে তার থাকাটা বেমানান হয়ে পড়বে —তাই তার কেমন যেন উঠি-উঠি ভাব দেখা গেল। তা ছাড়া তার মধ্যে আরও একটা কথা তোলপাড় করে উঠছিল বোধকরি এবং সেটা আর কিছুই নয়, রানীদির সঙ্গে আমার এমন নিবিড় পরিচয়ের খবরটা সে মাকে না দিয়ে থাকবে কি করে? তাই হঠাৎ সে বলে উঠল, 'দাদা, আপনি গল্প করুন—আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাব।'

আমি তার কথামত হঠাৎই যেন ঘাড় নেড়ে দিলাম। মায়া ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে মণ্টুও পা-পা করে বেরিয়ে গেল। কে জানে, সেও হয়তো মায়ার মত কিছু ভেবেছে। কিংবা হয়তো একথাও সে ভেবেছে, বড়রা যেখানে তাদের জীবনের সুখ-দুঃখের কথা বলাবলি করে, সেখানে ছোটদের থাকতে নেই। মণ্টুর সহবৎ শিক্ষার এ পরিচয় আমি আগেই পেয়েছিলাম।

ওরা চলে যেতে রানীদি বললেন, 'মণ্টুটা আর মায়াটা—ওরাও কেমন যেন খুশি হয়ে উঠেছে তোর আর আমার পরিচয় দেখে।'

'তাই তো দেখছি।'

রানীদি এবার বিছানায় আমার সামনে মুখোমুখি বসে পড়ে

বললেন, 'এখন বল্ তো বিজন, আমাকে এখানে এইভাবে দেখে তুই কি মনে করলি?'

'মনে আমার অনেক কথাই হয়েছে। কিন্তু তুমি বলো তো—এমন করে তিলক কেটে তুমি বৈষ্ণবী হলে কি করে?'

রানীদি মৃদু হেসে বললেন, 'তুই গেরুয়া পরে সন্নিসি হয়েছিস্ যেমন করে।'

আমি বললাম, 'আমি তো সন্ন্যাসী হয়েছি নিজের পরিচয় গোপন করার জন্যে।'

'পরিচয় গোপন করার জন্যে!'—রানীদির চোখে-মুখে কেমন যেন একটা জিজ্ঞাসু ভাব ফুটে উঠল এবং তারই প্রকাশ দেখা গেল তাঁর পরবর্তী প্রশ্নে।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'সত্যি বলছিস্?'

'হ্যাঁ।'

হঠাৎ যেন রানীদি গম্ভীর হয়ে উঠলেন। তারপর কেমন যেন একটা চাপা যন্ত্রণায় বলে ফেললেন, 'তোর মত যদি ওকথাটাও আমি বলতে পারতুম রে বিজন, তাহলেও বোধ হয় শান্তি পেতুম!'

বুঝলাম, কোথায় যেন রানীদির একটা প্রচ্ছন্ন বেদনা রয়েছে। ঘরে তাঁর কৃষ্ণ-রাধিকার যুগলমূর্তি। ধূপ, চন্দন আর অজস্র ফুলের সৌরভে সে ঘর তাঁর আমোদিত। নাকে তার তিলক। অনেক-দিনের পোষমানা রূপ তাঁর শরীরে জড়ানো, অবাধ্য উচ্ছলতায় এখনও সে রূপ ঠিকরে পড়ে। এ অবস্থায় আমার মত পরিচয় গোপন করার জন্য তিনি বৈষ্ণবী সেজেছেন—একথা বলতে পারলেও রানীদি শান্তি পেতেন—এ কথার অর্থ কি? তা হলে কি বৈষ্ণবী হওয়ার জন্য তাঁর আগ্রহ ছিল না—অথচ বৈষ্ণবী সাজতে বাধ্য হয়েছেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে? না আরও কিছু আছে তাঁর জীবনে?

রানীদি কেমন যেন এক যন্ত্রণার আবেগে বলে উঠলেন, 'এ জীবনে বিজন, অনেক জ্বালা। তুই যখন এখানে এসিছিস্, তখন সবি জানতে পারবি একে একে—কেন আমি বৈষ্ণবী হয়েছি। কিন্তু একটা কথা তুই আমাকে বল ভাই!'

'কী বলো!'

'হ্যাঁরে, তুই কখনো তোর রানীদিকে ঘৃণা করবি না?'

বললাম 'ঘৃণা করব কেন রানীদি?'

'যদি কোনদিন বুঝতে পারিস তোর স্বর্গের রানীদি নেমে গ্যাছে নরকের পাঁকে—তাহলেও কি তুই ঘৃণা করবি না আমাকে?'

'না। কখনই না।'

বস্তুত মানুষকে ঘৃণা করতে আমি শিখিনি কখনো। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র আর নজরুলের যুগে মানুষ হয়েছি আমি। এ যুগে মানুষকে তো ঘৃণার শিক্ষা দেয়া হয় নি—এ যুগে অবারিত উদার আকাশ, দিকহারা, কূলহারা সমুদ্রের অপরিমেয় প্রশস্ত-প্রশান্ত রূপ, এ সবই তো ছায়া ফেলে যেত জীবন-সরোবরের তীরে তীরে। আমি যে জেনেছি মানুষকে ঘৃণা করা মহা পাপ। আমার মনের এ ধারা রানীদির জানার কথা নয়। তাই বিস্মিতভাবে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'বলিস কিরে, তবুও তুই আমায় ঘৃণা করবি না?'

'বলেছি তো রানীদি', আমি বললাম 'মানুষ মানুষকে ঘৃণা করবে কেন বলো তো?'

আমার পাল্টা প্রশ্নে রানীদি কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়লেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, তুই অনেক লেখাপড়া শিখেছিস, অনেক কথাও তুই জানিস। সব কথা আমি তোকে গুছিয়ে বলতে পারব না। কিন্তু মানুষ তো মানুষকে ঘৃণাও করে!'

'তা করে হয়তো। কিন্তু কেন তা করে, সে কি তুমি কোনদিন তলিয়ে দেখেছ?'

'মানুষ যদি নরককুণ্ডে নামে, যদি সে পাপ করে, তবে মানুষ তাকে ঘৃণা করবেই।'

'সেখানেই তো আমার মন সায় দেয় না রানীদি!' আমি প্রশ্ন করলাম, 'পাপ কি মানুষ নিজে করে—না, মানুষের পাপ করার জমি তৈরি করে রাখা হয় বলেই মানুষ পাপ করে?'

রানীদি বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন শুধু, 'কি জানি আমি এসব ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।'

বাস্তবিক, পাপ আর পুণ্য, এর কোন সঠিক সংজ্ঞা আমি আজও খুঁজে পাই নি। তবে এই কথাটুকু আমি জানি, পাপই হোক আর পুণ্যই হোক, কোন মানুষ ব্যক্তিগতভাবে তা অনুষ্ঠিত করে না—পাপ-পুণ্য মানুষের সামাজিক পরিবেশের অবদান। যে সমাজে লোভ আর হিংসা, শাসন আর শোষণ, ধনী আর দরিদ্র, উঁচু আর নিচু থাকবে, সে সমাজে পাপ আর পুণ্য দুই-ই থাকবে। পুণ্যলাভ করবে তারা, যারা থাকবে সমাজের ওপরতলায়, আর পাপ করবে তারা, যারা থাকবে নিচু তলায়। তাই পাপ-পুণ্যের সংজ্ঞা কি হবে আমার কাছে এবং তা আমি স্থির করবই বা কোন্ মাপকাঠিতে, সেকথা আমার কোনক্রমেই বোধগম্য হয় না। আর যা আমার কাছে বোধগম্য হয় না তা দিয়ে আমি মানুষের পাপ-পুণ্যের কুকাজ-সুকাজের পরিমাপ করব, এ মূর্খামি আর যেই করুক, আমি অন্তত করতে পারব না। ঘৃণার বেলাতে সেই একই কথা আমার মনে উদয় হয়।

আমি যখন এই সব কথা ভাবছিলাম, তখন বাইরে থেকে কে যেন এক মহিলা রানীদিকে ডাকল 'দিদি!'

'কে?' রানীদি সাড়া দিয়ে বাইরে গেলেন।

ইতিমধ্যে ঘরের ভিতরে কৃষ্ণ-রাধিকার মূর্তির সামনে ধূপগুলো পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই তার গন্ধ অন্তর্ধান করে কেমন যেন একটা বিশ্রী গন্ধ নাকে এসে লাগছিল। এতক্ষণ কথা-

বার্তার মধ্যে সেটুকু খেয়াল করি নি। এখন বেশ তীব্রভাবে সেটা অনুভব করলাম। বাইরে শুনতে পেলাম রানীদিকে সেই মহিলাটি বলছে, সর্ষে-ভোর কটা গুলি দাও দিদি, তা না হলে আমার হীরে-মুক্তো-চুনী-পান্না—সবগুলো একেবারে বেঘোরে মরে যাবে!'

রানীদি বললেন, 'চুপ কর পোড়ারমুখি, ঘরে আমার ভাই আছে।'

'ভাই?'

'হ্যাঁ,'

'দেখি দেখি', বলে মহিলাটি ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। আশ্চর্য—দেখলাম কাঁধের ওপর দুটো আর হাতের সঙ্গে দুই বগলে দুটো—মোট চারটে বিড়াল মহিলাটির সঙ্গে। মহিলাটিকে দেখতে অনেকটা পাঁচির মার খোকাকে নিয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায় যে মেনকা, তার মত। বয়সও প্রায় তেমনিই হবে। একটু আগে তো কটা আফিমের গুলি যে হীরে মুক্তো-চুনী-পান্নার জন্যে সে চাইছিল—সেই বহুমূল্য জীবগুলি বোধহয় তার কাঁধের আর বগলেরই হবে বলে অনুমান করলাম। আমি অবাক হয়ে তার হীরে-মুক্তো আর চুনী-পান্নার দিকে তাকালাম।

মহিলাটিও তাকালো আমার দিকে এবং আমারই মত বিস্ময়ে সে বলে উঠল, 'ও দিদি, এ যে সন্নিসি।'

'সন্নিসি তা কি হয়েছে?' রানীদি বললেন, 'সন্নিসি হলে আর ভাই হতে নেই আমার?'

'তা কেন?'

রানীদি তারপর আনলার নিচে রাখা একটা তোরঙ্গ খুলে তা থেকে একটা কৌটো খুলে চারটে সর্ষে-ভোর আফিমের গুলি তুলে নিয়ে বললেন, 'আয় মাধু, তোকে বিদেয় করি আগে—'

মাধু হাত বাড়িয়ে আফিমের গুলিগুলো নিয়ে আবদারের সুরে বললে, 'বিদেয় করবে কেন দিদি—ভাই পেয়েছো বলে?'

রানীদি তোরঙ্গ বন্ধ করে মাধুর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ঈষৎ হেসে বললেন, 'হ্যাঁ'।

মাধুর কাজ মিটে গিয়েছিল। তাই সেও তেমনিভাবে হেসে বলে উঠল, 'নাও ভাই নিয়ে তুমি গল্প করো তবে'···তারপর সে চলে গেল।

তখন ঘরের মধ্যে আগেকার সেই বিশ্রী গন্ধটা যেন আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল। গভীর রাতে ম্যাগনোলিয়া ফুলের গন্ধের উৎসটা যেমন লাগে, যেমন লাগে সোঁদাল ফলের চটচটে আঠার গন্ধ, ঠিক তেমনি একটা তীব্র গন্ধ। এইমাত্র রানীদি তোরঙ্গ খুলে আফিমের কৌটো থেকে হীরে-মুক্তো-চুনী-পান্নার জন্যে যে আফিম বের করে দিলেন, এই গন্ধটার সেই কৌটোর গন্ধর সঙ্গে যেন কেমন মিল রয়েছে বলে মনে হল। হঠাৎ গভীর এক সন্দেহে আমার মনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তারই আবেগে আমি বলে উঠলাম, 'রানীদি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

'কি কথা রে?'

'তোমার ঘরে এ কিসের গন্ধ বলো তো?'

ঝটিতি রানীদি তাকালেন কৃষ্ণরাধিকার যুগল মূর্তির দিকে। ধূপগুলো নিভে গেছে! তাই তো! আমার দিকে অসহায়ের মত তাকালেন তিনি। মুহূর্তের ভগ্নাংশের মধ্যে তাঁর মুখে এমন একটা যন্ত্রণার ঢেউ বয়ে গেল, যা আমার চোখ ছাড়া আর কারো চোখে কোনদিন পড়বে বলে মনে হয় না। তাই তাঁর যন্ত্রণাকে লাঘব করবার উদ্দেশ্যে বললাম 'রানীদি, আমি সব বুঝতে পেরেছি। আর কিছু তুমি আমার কাছ থেকে লুকোতে যেও না।'

রানীদি তেমনিভাবেই আমার দিকে এগিয়ে এলেন। তারপর সহসা আমার দুই কাঁধের ওপর দু'খানা হাত রেখে প্রবলভাবে চাপদিয়ে বলে উঠলেন, 'তোর রানীদিকে তুই বুঝতে পেরেছিস্?'

মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকালাম। দেখলাম, তাঁর গাল বেয়ে

অশ্রুর ধারা। ভেঙে পড়লেন যেন একেবারে আমার কাছে। টস্ টস্ করে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ঝরে পড়ল আমার কপালে, গালে, বুকের ওপর, গেরুয়ায়। তাঁর দুটো হাত ধরে এরপর বসালাম বিছানার ওপর। বসতে বসতে রানীদি বললেন, 'ওরে বিজন, কতদিন এমন করে কাঁদতেও পারি নি আমি!'

'জানি রানীদি,' সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'তুমি কেঁদো না। আমি বুঝতে পারছি, সমস্ত অতীতটা ভেসে উঠছে তোমার চোখের সামনে। তুমি ভাবছ তুমি কি ছিলে আর কি হয়েছ। মনটা তোমার হু হু করে উঠছে। কিন্তু এ পথ তো তুমি স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছো!'

'তা নিয়েছি।'

'তবে? যে পথ মানুষ স্বেচ্ছায় বেছে নেয় সে পথের যত দুঃখ যত কষ্ট সে তো তোমার যন্ত্রণা নয়, সে তো তোমার সাধনার সোপান দিদি।'

'হ্যাঁ, এ পথে আমি এসেছিলাম ঠিক সেই উদ্দেশ্য নিয়েই কিন্তু আমি তো পারলুম না। আমি হেরে গেলুম ভাই—আমি হেরে গেলুম।'

রানীদি বিছানার ওপর উপুড় হয়ে মাথা রাখল। তারপর কেমন অস্বাভাবিকভাবে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

রানীদির ঘরে কৃষ্ণ-রাধিকার যুগল মূর্তি। সামনে একটা চৌকি। চৌকির ওপর ধূপদানিতে জ্বলে ধূপ। সামনে জড়ো করা থাকে অজস্র ফুল। পাশে থাকে চন্দনের বাটি আর সুবাসিত চন্দন পিঁড়ি। রানীদির নাকে থাকে তিলক। এই পরিবেশে কে না তাঁকে মনে করবে তিনি পরম বৈষ্ণবী এবং তিনি তাঁর জীবনকে সঁপে দিয়েছেন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার বেদীতলে? অথচ এইটাই সত্যি নয় তাঁর জীবনে। তাই আমি প্রথমে আসতেই আক্ষেপ করে তিনি বলেছিলেন, ওরে, তোর মত যদি পরিচয় গোপন করার কথাটাও বলতে পারতুম বিজন, তাহলেও বোধহয় শান্তি পেতুম। হ্যাঁ,

শান্তি এতে মানুষ পায় না। কারণ এই ধরনের কাজ—এটা পরিচয় গোপন করা নয়, এটা সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করা। প্রবঞ্চক কখনও মনে শান্তি পায় না।' বুঝলাম রানীদির দুঃখটা কোথায়, জ্বালাটা কোথায়।

একদিন রানীদির বুকের মাঝে শুয়ে ছেলেবেলায় আমি মানুষ হয়েছি। স্নেহে, যত্নে, আদরে, আবদারে তিনি আমাকে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। কে জানে, আজ হয় তো আমার পালা—তাঁকে সেগুলি শোধ দিতে হবে জীবনের এই নতুন রূপান্তরের দিনে। তাই ছোটবোনকে যেমন করে সস্নেহে সান্ত্বনা দিতে হয় দুঃখের দিনে, তেমনি করে উপুড় হওয়া রানীদির পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম, 'ছেলেমানুষের মত কেঁদ না রানীদি—ওঠো।'

কান্না কিছুটা স্তিমিত হয়ে এসেছিল বোধকরি। একটুখানি উঠলেন তিনি। আবার আমি বললাম, 'ওঠো, চোখ মোছো—মন্টু বা মায়া এসে পড়লে কি মনে করবে বলো তো ? মনে করবে, অতীতে তুমি হয়তো এমন কিছু অন্যায় করেছো বা অপরাধ করেছো যা তুমি আজ আর ভুলতে পারছ না। তারা তোমায় অন্যভাবে ভাববে।

এবার সম্পূর্ণভাবে উঠে বসে তিনি বললেন, 'ভাববার আর কিছু নেই বিজন।'

'ওরা সব জানে ?'

'মায়া জানে না। মন্টু জানে।'

বললাম, 'এ ঘরে গন্ধ যা বেরিয়েছে তাতে তো মনে হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে স্টক করেছো।'

'হ্যাঁ।'

'কত হবে ?'

'মণ তিনেক হবে।'

'কে এসব করে ?'

'মণ্টু ছাড়া আমার আর কে আছে বল ?'

আমি সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, 'মণ্টু আফিম স্মাগ্‌ল করে ?'

রানীদি আমার দিকে একবার তাকিয়ে তারপর একটা বাক্সর ওপর থেকে দেশলাইটা নিয়ে নতুন কতকগুলো ধূপকাঠি জ্বেলে দিতে গেলেন ধূপদানিতে। আমি অবাক হয়ে মণ্টুর কথা ভাবছিলাম। অমন সুন্দর সুঠাম চেহারার ছেলেটা, ভাব-ভঙ্গী সহবতে অমন চৌকস—সে ছেলে আফিম স্মাগ্‌ল করে! কে জানে, এই জন্যেই হয়তো মায়া বলেছিল, ওস্তাদ আর তার সাগরেদ বসন্ত খুব ভালবাসে। হ্যাঁ, সে সময় আমার মনে হয়েছিল, এই যদি তার গুণের পরিচয় হয়, তবে সে গুণ কখনো সৎ-গুণ হতে পারে না। এখন দেখছি আমার সে ধারণা আদৌ ভুল নয়।

ধূপ জ্বেলে রানীদি বললেন, 'চা খাস তো বিজন ?'

'চা খাব না কেন ?'

'তবে বোস্, চা করি। চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবি ?'

'না। তুমি কি মনে করো, আমি খুব খাইয়ে মানুষ ? আসতেই মিষ্টি-ফিস্টি একগাদা খাওয়ালে!'

বেলা তখন পড়ে আসছিল। চায়ে চুমুক দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মণ্টু এসে পড়ল। স্বভাবসুলভ মিষ্টি হেসে বললে, 'ঠিক সময়েই এসে পড়েছি মাসি।'

'হ্যাঁ বাবা। আসল তাল যদি ফস্কাও।'

মণ্টু তক্তাপোশের নিচে থেকে একজোড়া কাপ-ডিস বের করে রানীদির সামনে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'দাও।'

রানীদি কেট্‌লি থেকে চা ঢেলে দিলেন মণ্টুর কাপে। মণ্টু চা খেতে যেতে বললে, 'মামাবাবু এখন এখানেই থাকবেন তো ?'

'এখানে মানে ?'

'আমাদের বাড়িতে ?'

'তোমাদের বাড়িতে জায়গা কোথায়? জায়গা করো, তারপর থাকব।'

'ঠিক বলেছেন তো?'

এমন সময় মায়া ঢুকে বললে, 'কি হয়েছে—আমার দাদাকে কে কি বলছে?'

মন্টু বললে, 'আমি বলছি—এখানে থাকতে হবে মামাবাবুকে।'

'ইস্,' মায়া বললে, 'বললেই হল অমনি। দাদা এসেছে আমাদের বাড়ি। সেখানে আমি আছি, মা আছে। আমাদের মত না নিয়ে কেউ দাদাকে নিতে পারবে না।'

'তাই হবে—তাই হবে', এবার রানীদি হাসতে হাসতে বললেন। আমি বললাম, 'শেষকালে দেখো ভাগের মা যেন গঙ্গা পায়।'

মায়া খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে বললে, 'দাদার কি সুন্দর কথা।'

রানীদি হাসলেন।

এরপর সেদিনের মত বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বেলা তখন সন্ধ্যার কোলে ঢলে পড়েছে। রানীদি দাওয়ায় এসে বললেন, 'কাল এখানেই খাওয়া-দাওয়া করবি বিজন—সকাল সকাল আসবি।'

'তুমি যখন খাওয়াবে তখন আসতে তো হবেই।'

মায়া বললে, 'নেমন্তন্নটা পাকা করে নিলেন দাদা।'

রানীদি বললেন, 'তুইও আসিস না নেমন্তন্নয়।'

'আমাকে তো আগে বল নি,' মায়া অনুযোগের ভঙ্গীতে বললে। রানীদি বললেন, 'নাই বা আগে বললুম—পরে বলছি বলে তুই আসবি না?'

'বাঃ রে, আমি সেকথা বলিছি নাকি? নিজের ভাইটিকে আগে বলতে পাবলে আর—'

'থাম থাম পোড়ারমুখি। ভাই আমার কত গুণের জানিস্?'

'জানি।'

এরপর আবার সেই পথ। সেই আঁকা বাঁকা। সেই গোলক-

ধাঁধার মত। দুটো বাড়ির পরই একটা ছেঁচাবেড়ার ঘর, সামনেই দরজাটা। সেখানে আসতেই দেখলাম সেই মাধু—যে রানীদির কাছে গিয়েছিল তার হীরে-মুক্তো-চুনি-পান্নার জন্যে সর্ষেভোর আফিমের গুলি আনতে। মাধু বসে রয়েছে তার মহামূল্য সম্পদগুলিকে আগলিয়ে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম তাকে, 'ওরা তোমার রোজ আফিম খায় ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন খাওয়াও বলো তো ?'

'আফিম খেলে আর কোথাও যাবে না ওরা।'

'কোথাও যাবে না ?'

'না।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি এত বিড়াল পোষ কেন'

'বিড়াল বড় উপকারী দাদা।'

বিড়াল খুব উপকারী এ তো কই কখনো শুনি নি। তবে, হ্যাঁ—একথা ঠিক গৃহস্থ মানুষেরা ইঁদুরের উৎপাতে মাঝে মাঝে বিড়াল পোষে বটে, কিন্তু খুব যে একটা উপকারী প্রাণী হিসাবে লোকে বিড়ালকে দেখে তা তো মনে হয় না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম মাধুকে, 'এগুলো তোমাদের কি উপকারে লাগে বলো তো ?'

'উপকারে লাগা,' মাধু এবার দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আপনি, বোস্টুমীদির ভাই—'

'হ্যাঁ।'

'আপনি এখানকার সবকিছু জানেন ?'

'জানি।'

'তাহলে বেড়াল আমাদের কি কাজে লাগে তা তো আপনার জানা উচিত। মাধু এবার মায়ার দিকে তাকিয়ে বললে, 'কিরে মায়া বল্ না।'

'তুইই বল্ না দিদি !'

মাধুর ভাব দেখে মনে হল, সে ঠিক মনখুলে আমাকে সব কথা বলবে কি না, সম্ভবত সেই কথাই ভাবছিল। তাই তাকে আমি আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'অনেক কথাই তোমাদের এ রাজ্যের আমি জানি কিন্তু বিড়াল-টিড়াল এসব ব্যাপার তো আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তাছাড়া তুমি আমাকে নির্ভয়ে সব কথা বলতে পারো। আমি তোমাদের বোষ্টুমীদির ভাই এবং মায়ারও আমি দাদা হই।'

'আপনি থাকেন কোথায় ?'

'এখন মায়াদের বাড়ি আছি। তারপর হয়তো এখানেই আর কোন বাড়িতে থাকব।'

মাধু এবার আমার কথায় নিশ্চিন্ত হল যেন। সে বললে, 'বিড়াল যে কত উপকারী মায়া তো সেকথা জানে। ওর দাদা শঙ্করকে তো এই হীরের দিদিমা কোহিনূরকে দিয়ে এসেচি।'

'শঙ্কর তো জেলে আছে।'

'হ্যাঁ জেলেই তাকে দিয়িচি।'

'সেখানে সে কোহিনূরকে নিয়ে কি করবে ?'

এবার মাধু একটু হাসল।

ইতিপূর্বে আমিও জেল ঘুরে এসেছি কয়েকবার। সেখানে অবিশ্যি দেখেছি—অনেক কয়েদীই বিড়াল পোষে। দীর্ঘকাল যাদের জেলে থাকতে হয়, স্নেহ-মমতা, ভালবাসা প্রভৃতি মানুষের সহজাত যেসব মানবিক গুণ, সে সব প্রকাশের পক্ষে তাদের আর কোন অবলম্বন থাকে না, তাই বিড়ালকে কেন্দ্র করেই তারা তা মেটায়। কিন্তু তাছাড়া আর বিড়ালের কি উপকারিতা আছে তা তো তেমন করে ভেবে দেখি নি কোনদিন।

মাধু বলল, 'এসব বেড়াল আমার তালিম দেয়া আপিম খাওয়ানো বেড়াল। জেলখানায় ওস্তাদের লোকদের এরা খুব সাহায্য করে।'

'কি রকম ?'

'জেলখানার যে-কোন ছোট ফোঁকর, তা সে নর্দমাই হোক, আর জানলার ঘুলঘুলি হোক, ফুস করে গলে যেতে পারে। অনেক সময়ে এদের গলায় চিঠি বেঁধে দিই আমরা, আর সে চিঠি ঠিকভাবে পৌঁছয় গিয়ে মালিকের কাছে। তাছাড়া গাঁজা, আপিম, চরস, কোকেন এদের গলায় বেঁধে দিয়ে জেলের ভেতর চালানও করি আমরা।'

সেইখানে সেই আসন্ন সন্ধ্যায় মাধুর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম তার কথা শুনে। এই অভিশপ্ত জগতের রহস্যকাহিনী যেন ধীরে ধীরে আমার কাছে ক্রমশ প্রকাশ্য উপন্যাসের মত প্রকাশিত হতে লাগল।

সেদিন ফিরে এলে মা ও মায়ার সঙ্গে অনেক রাত অবধি কথাবার্তা হল। সে কথাবার্তা, বলা বাহুল্য রানীদির সম্পর্কেই। আমি আসার আগেই মায়ার মুখে মা সব শুনেছিলেন। সুতরাং বিস্ময়টা তাঁর মনে সৃষ্টি হয়েছিল এবং সে বিস্ময়ের জিজ্ঞাসার জবাব দিতে আমাকে অনেক কথাই বলতে হল। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম—এঁরা পরস্পরের এত কাছাকাছি থাকেন, তবু সবাই সবায়ের কথা জানেন না। রানীদির যে অত বড় একটা বে-আইনী আফিমের কারবার আছে, একথা মা বা মায়া, কারোরই জানা নেই। এটা একমাত্র আমারই আবিষ্কার।

অবশ্য আমার এ আবিষ্কারের কথা আমি মা বা মায়া কারোকেই কিছু বললাম না। কারণ, বলা আমার উচিত নয়। যে কথা এদের জানা নেই, সে কথা জানাবার প্রয়োজন কি? তা ছাড়া রানীদি সম্পর্কে অনেক কথাই তো আমি জানি, যে কথাগুলি অন্যের কাছে একেবারে অজানা কাহিনী। ছেলেবেলা থেকে কখনও আমি সে সব কথা কারোকে বলি নি। কে জানে হয়তো

ঠিক এই কারণেই আমি যখন তাঁর এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে জেনে ফেললাম, তিনি সেকথা কোথাও আমাকে বলতে নিষেধ পর্যন্ত করলেন না। এমন কি এ কথাটুকুও তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল না যে, 'বিজন ভাই, একথা তুই কারোকে বলিস নি যেন।' এ রানীদির গভীর বিশ্বাস আমার প্রতি। তিনি জানেন আমার প্রকৃতি কোন্ ধরনের।

রানীদির এই বিশ্বাসের মর্যাদা বরাবর আমি রেখে গিয়েছিলাম।

সেদিন সেই রাতে কিছুতেই আমার ঘুম আসেনিকো। কেবলই মনে পড়েছে রানীদির কথা। ছেলেবেলার সেই দিনগুলো আমার কাছে কোনদিন বিস্মৃতির ধুলোয় চাপা পড়ে যাবে না। তাঁকে বোধ করি আমি জ্ঞান হওয়ার আগে থাকতেই চিনেছিলাম। আমার অনুভূতির মধ্যে এখনও যেন ধরা রয়েছে একটি নরম বুক, সে বুকে আমি মাথা গুঁজে রয়েছি। কেমন এক উষ্ণ সৌরভে আচ্ছন্ন আমার মন, মহাকাল সেখানে কাজ করে যাচ্ছে গোপনে, অথচ কি সশব্দে। রানীদির বুকে সে কি একটানা কলরোল, যেন উচ্ছলা নদী উধাও হয়ে ছুটেছে কোন্ অজানা সাগরের অনন্ত বিস্তৃতির দিকে। মাঝে মাঝে তাঁর বুক থেকে মুখ তুলে তাঁর মুখের দিকে তাকাতাম। তারপর নিজের বুকের ওপর হাত দিয়ে উপলব্ধি করতাম, আমারও বুকে তো অনুরূপ প্রবাহধারা। তবে কি এরই নাম জীবন?

মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে রানীদি বলে উঠতেন, 'কি দেখছিস্ রে দুষ্টু?' আমি অবাক হয়ে তাকিয়েই থাকতাম। তিনিও অবাক হয়ে তাকাতেন আমার দিকে। তাঁর পলকহীন দৃষ্টি আমাকে আরও জিজ্ঞাসু করে তুলত। চোখের পাতাগুলো যেন তাঁর গোনা যেত, এত স্পষ্ট। ভ্রূ দুটো যেন দূর আকাশে উড়ন্ত কোন চিলের ডানা। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি যেন দেখতাম আমার মায়েরই ছবিখানা তাঁর মুখে বসানো। কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে

ভাবতাম, তিনি আমার মুখে কি দেখবার জন্য, কি খোঁজবার জন্য যেন ব্যাকুল হয়ে উঠতেন।

তখন সেই শৈশবে বুঝিনিকো রানীদির চাওয়ার কথা। একটু বড় হয়েও কতবার মনকে জিজ্ঞাসা করেছি, রানীদি আমাকে তাঁর বুকের মধ্যে নিয়ে কি পেতে চেয়েছেন? কিন্তু হদিস্ আমি তার ঠিক করতে পারি নি। তবে কৈশোরে পা দিয়ে আমি যা উপলব্ধি করেছিলাম সেই উপলব্ধিই আমার আজও রয়ে গেছে রানীদি আমার শৈশবের মুখখানার মধ্যে খুঁজে পেতে চাইতেন আমারই মত একটি সন্তানকে—যে সন্তান হবে তাঁর আপন নাড়ী-ছেঁড়া ধন। অনেকবার রানীদির কথার মধ্যে এ বেদনা প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে রানীদির সেই চিঠি লেখার কথা। তাঁর হাতের লেখা ছিল খুব খারাপ। জামাইবাবু নাকি তাঁর হাতের লেখা বুঝতে পারতেন না। তাই তিনি চিঠি লেখাতেন আমাকে দিয়ে। সে চিঠির মাঝে কতকগুলি কথা আজও আমার বেশ মনে আছে। তিনি বলছেন আর আমি লিখছি: 'ফাল্গুনের বাতাসে যখন আমাদের ফুলগাছগুলোয় কুঁড়ি ধরেছে অজস্র, বাতাসে যখন মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ, তখন আমার মনে কত কথা ওঠে তা কি তুমি বুঝতে পারো না নিষ্ঠুর? বাবা তোমার মুখ দেখবেন না। তুমি যে কাজ করেছো তার কোন ক্ষমা নেই। কিন্তু তুমি আমাকে ফেলে গেলে কেন? কেন তুমি আমাকে নিয়ে গেলে না? আমি কি তোমার পথে বাধা হতুম? আমি একাকিনী তোমার কলংকের বোঝা মাথায় নিয়ে এইখানে শুধু কি বুকের আগুন বুকে চেপে রেখে জ্বলে-পুড়ে মরব? আজ যদি আমার একটা সন্তানও থাকত, তা হলেও না হয় জ্বালাটা ভুলতে পারতুম, কিন্তু এ তুমি কি করলে?'

শুধু কি সন্তানের বেদনাই রানীদির? জীবনটাই যেন তাঁর প্রত্যক্ষ এক বেদনার প্রতীক। অনেক দুঃখ রানীদির।

অনেক জ্বালা তাঁর। তাঁর বিয়ের ঠিক পরেই যে ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটে গেল, অন্য মেয়ে হলে সে যে কি করত তা আমি জানি না, কিন্তু রানীদিকে দেখেছিলাম তিনি যেন সব কিছুতেই অচলা অটলা। নীরব নিস্তব্ধ ধ্যানগম্ভীর পর্বতের মত আপনার পরিবেশে আপনিই তিনি একান্ত। শুধু সেখানে একটি নির্ঝরিণী ধারা—সে ধারা বোধ করি মানুষের শাশ্বত-ধারা। সে ধারায় আমি ছিলাম নিত্যস্নাত সহচর তাঁর।

…সেই অসলারের আলো। সেই ডারহামের বাজনা। দূর থেকে অভ্যর্থনা করে আনা হচ্ছে বর আর বরযাত্রীদের। গোলাপ-জলের ফোয়ারা ছুটিয়ে দেওয়া হয়েছে ময়ূরপঙ্খী গাড়ি থেকে। পথের দুধারে কাতারে কাতারে মানুষ। অভিভূত হয়ে দেখছে সবাই। রানীদির বাবা বড় সরকারী চাকুরে। সাহেবসুবো আমলা-অফিসার, রায়বাহাদুর, খানবাহাদুর, জজ্ ম্যাজিস্ট্রেট সব কত এসেছেন। রানীদি সেদিন যেন সত্যিই রানী। আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে কতবার রানীদিকে দেখে যাচ্ছিলাম। কাছে যেতে সাহস হচ্ছিল না। যদি কেউ কিছু বলে' রানীদিও মাঝে মাঝে আমাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন। কয়েকবার সস্নেহে অল্প অল্প হেসেছিলেনও, কিন্তু কিছু বলছিলেন না। সমস্ত পরিবেশটাই সেদিন যেন অন্যরকমের।

তারপর বর এল। হ্যাঁ, রাজপুত্তুরের মতই বর। সকলেই তারিফ করলেন। রাতে একবার শুধু দেখলাম রানীদির সিঁথির সামনেটা আবিরের মত টক্‌টক্ করছে একগাদা সিঁদুরে। মাথায় তাঁর সোনার মুকুট। ঝলমলে স্বর্ণখচিত শাড়ির দীপ্তি পর্যন্ত বুঝি রানীদির রূপকে সেদিন পাল্লা দিতে পারে নি। মহীয়সী সম্রাজ্ঞীর মত বরের উত্তরীয়ের সঙ্গে বাঁধা, ধীরে ধীরে চলেছেন রানীদি বাসর-ঘরে। তারপর আমি আর জানি না। কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ে-ছিলাম বিয়ে বাড়িরই এক কোণে। সকালে ঘুম ভাঙতেই অবাক

হয়ে গেলাম। দেখলাম, আমি শুয়ে রয়েছি আমাদেরই বাড়িতে বাবার বিছানায। নিশ্চয়ই কখন মা ঘুমন্ত আমাকে তুলে এনে শুইয়ে দিয়েছিল এখানে। তা না হলে এখানে আমি এলাম কি করে? চোখের সামনে আমার ভেসে উঠল গত রজনীর সেই মায়াপুরীর মত আলো-ঝলমল করা দৃশ্য। সম্রাজ্ঞীর মত বাসর ঘরে যাচ্ছেন রানীদি। হঠাৎ মনটা কেন কি জানি আমার হু হু করে উঠল। তবে কি রানীদি আজ চলে যাবেন—চলে যাবেন সম্রাজ্ঞীর মত অন্য কোন রাজ্যে?

বিছানা থেকে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে ছুটলাম আমি রানীদিদের বাড়িতে। ফটক পার হতেই গাড়িবারান্দা। সেখানে যেতেই দেখা হয়ে গেল রানীদির বোন বাণীদির সঙ্গে। বাণীদিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বর-কনে চলে গেছে বাণীদি?

'এখুনি যাবে কিরে? কুসুমডিঙা হচ্ছে যে—'

আমি একরকম প্রায় ছুটেই চললাম। দেখলাম গিয়ে ভিতরের উঠোনে দাঁড়িয়ে বর-কনে। কতরকমের কি সব আচার-অনুষ্ঠান হচ্ছে। রানীদিকে অদ্ভুত দেখিয়েছে যেন। সকালবেলার সদ্য ফোটা গোলাপের মত রানীদির মুখখানা যেন বার বার করে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কতদিন কত সকাল-সন্ধ্যা-রাত্রি রানীদির এ মুখ আমি দেখেছি, কিন্তু এমনটি যেন আর কখনো দেখি নি। স্বর্ণমুকুটে বিচ্ছুরিত প্রভাতসূর্যের আলোর নিচে কোন শিল্পীর তুলিকার স্পর্শে অঙ্কিত এ মুখ। এ যেন আজই প্রথম সৃষ্টি হল। সেই টানা টানা ভ্রূ—দিগন্তে হারিয়ে যাওয়া চিলের ডানার মত, সেই নিষ্পলক চোখের পাতায় কালো চুলের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি, রূপপ্রাচুর্যে পরি-পূর্ণ অপরিমেয় স্বাস্থ্যের অধিকারিণী রানীদি যেন আজ আমার বিজয়িনীর বেশে কোন অজানা রাজ্যের অভিযাত্রী। ফুলের পাপড়ির মত নরম দুটি ঠোঁট তাঁর কেঁপে কেঁপে উঠছিল সংকল্পের দৃঢ়তায়।

আমি চুপ করে গিয়ে দাঁড়ালাম সামনে। একবার মুখ তুলে দেখলেন তিনি। তারপর কুসুমডিঙার কাজ শেষ হলে হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরে ফেলে বললেন, 'কাল থেকে কেবল পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস দুষ্টু!'

রানীদির বর এবার তাকালেন আমার দিকে। দিব্যি সুন্দর দীর্ঘ ঋজু দেহ তাঁর। রানীদির বর হিসাবে ভারী সুন্দর মানিয়েছে তাঁকে। তিনি, বোধ করি আমি রানীদির খুব প্রিয় একথা উপলব্ধি করে, স্নেহভরে আমার কাঁধে হাত দিলেন। এমন কি তিনি আমাকে জিজ্ঞাসাও করে বসলেন, 'কি নাম তোমার?'

উত্তর দিলাম।

তিনি শুনে বললেন, 'বাঃ, বেশ নামটি তো তোমার!'

এই ভদ্রলোকের সঙ্গে সেই আমার প্রথম ও শেষ কথা। আর কখনো তাঁর সঙ্গে আমার কথা বলার সুযোগ হয় নি।

এই বিয়েরই কয়েকদিন পরের কথা।

কি যে ঘটল রানীদির জীবনে। গোটা বাড়িটা তাঁদের যেন নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে গেল। নেমে এল কেমন যেন একটা কালো ছায়া। শুনেছিলাম রানীদির বর এসেছিলেন প্রথম শ্বশুরবাড়িতে। যাবার সময় নিয়ে গিয়েছিলেন রানীদিন ছোট বোন বাণীদিকে। তারপর আর না রানীদি, না জামাইবাবু—কেউই আর ফিরে আসেন নি। জ্যাঠাবাবু অর্থাৎ রানীদির বাবা অত্যন্ত রাশভারী কড়া প্রকৃতির মানুষ। শুনেছিলাম তিনি গিয়েছিলেন জামাই-বাবুদের বাড়ি। জামাইবাবুর মা-বাবা জ্যাঠাবাবুর মতই দুশ্চিন্তা ও মর্মপীড়া-জনিত সহানুভূতি জানানো ছাড়া আর কিছু করতে পারেন নি। জ্যাঠাবাবু পুলিশকেও জানিয়েছিলেন। কিন্তু তখন-কার পুলিশ সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষের পুলিশ, ইংরেজদের বদ-অভ্যাস ত্যাগ করতে পারে নি। সহানুভূতি বা দরদ দেশবাসীর প্রতি তাদের ছিল না। আর পাঁচটা অভিযোগের মত এ

ব্যাপারটাকেও লালফিতার মধ্যে তারা শুধু আবদ্ধ করে রেখে দিয়েছিল।

মাঝে মাঝে শুনতাম জ্যাঠাবাবু অস্ফুট স্বরে বলে উঠতেন, 'অমন জামাইয়ের আমি মুখদর্শন করতে চাই না।'

জ্যেঠিমা দারুণ মানসিক যন্ত্রণায় ছিলেন আচ্ছন্ন। তিনি বলতেন, 'শুধু জামাইয়েরই নয়—সে মেয়ের মুখও আমি দেখতে চাই না। কুলে কালি দিয়ে চলে যায় যে মেয়ে সে-ও কি কম অপরাধী?'

জ্যাঠাবাবু বলতেন, 'মেয়ের আমার কি দোষ—তাকে আদর করে নিয়ে গেছে বলেই তো সে গেছে!'

'কিন্তু তার তো বোঝা উচিত ছিল', জ্যাঠাইমা যুক্তি দিতে চেয়েছেন।

জ্যাঠাবাবু বলেছেন, 'সে অসহায়া একটা মেয়ে। তাকে যদি কোথাও আটকে রাখে কোন গোপন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তবে সে তা বুঝবে কি করে?'

বেশ কয়েক মাস পরের কথা। হঠাৎ রানীদির চিঠি লেখার পালা শুরু হল। সম্ভবত রানীদি ঠিকানা একটা পেয়েছিলেন জামাই-বাবুর কাছ থেকে। তা যদি না হবে তো রানীদি চিঠি লিখবেন কোথায়! কিন্তু তিনি সে কথা কারোকে ভাঙেন নি। এমন কি আমার কাছেও নয়। আমাকে দিয়ে তিনি শুধু চিঠিই লেখাতেন। একখানা চিঠির কথা এই প্রসংগে আমি কখনই ভুলব না। সে চিঠিতে রানীদির যেমনি ছিল অসীম ধৈর্য আর আশাবাদী মনের পরিচয়, তেমনিই আকাশের মত উদার মনের অভিব্যক্তি। তিনি আমায় বললেন, 'বেশ ভাল করে লেখ তো বিজন!'

আমি লিখতে লাগলাম, 'ছাখো এখনও সময় আছে। বাণী আমার ছোট বোন। তাকে তুমি বিয়ে করে নাও। তারপর এসো দুজনে, বাবা-মার পায়ে ধরে ক্ষমা চাও। আমি সব রাস্তা বেঁধে

রাখব। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, ছোট বোনকে আমি স্নেহ করি, ভালবাসি, কোনদিন তার সঙ্গে আমার বিরোধ হবে না। কিন্তু আমি স্বামী বর্তমানে স্বামীহীনা হয়ে থাকতে পারব না। আশা করি, তুমি আমার মনের কথা বুঝবে!'

এ চিঠির কোন উত্তর তিনি পেয়েছিলেন কিনা তা আমি জানি না। এরকম চিঠি আরও চার-পাঁচ বছর ধরে লেখালেখি চলে। হঠাৎ একদিন শুনলাম রানীদি গৃহত্যাগ করে চলে গেছেন। যাবার আগে শুধু লিখে রেখে গেছেন, 'তোমরা ভেব না। আমার পথ আমাকে দেখে নিতে দাও।'

সে আজ বারো বছর আগেকার কথা।

দীর্ঘ বারোটা বছর কেটে গেছে। রানীদির সম্বন্ধে আর কিছু জানা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে আজও আমি বিশ্বাস করি তিনি তাঁর মনের সম্পদ হারান নি। এমন কি তাঁকে যদি কেউ কুলটা ভাবে, তাও আমি সমর্থন করি না। হয়তো তাঁর জীবনে এমন কোন রহস্য আছে--যা ভবিষ্যতে কোনদিন উদঘাটিত হবে। কিন্তু তা না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সম্বন্ধে শেষ কথা বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। তবু আমার মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাঁকে আফিমের কারবার করতে দেখে। তা ছাড়া সবচেয়ে যেটা খারাপ লেগেছিল মন্টুর মত একটা ছেলেকে রানীদি এই কাজে লাগিয়েছেন দেখে।

এই সব ভাবতে ভাবতে রাত কত হয়েছিল তা খেয়াল করতে পারি নি। বিনিদ্র রজনীর সবচেয়ে বড় অভিশাপ হচ্ছে অস্বাভাবিক যন্ত্রণা। আর এ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় একলাকেই। অন্যকে এ যন্ত্রণা উপশম করার পথে কোনরকমেই কাজে লাগানো যায় না। তা না হলে কয়েক হাত পাশেই নিদ্রিতা মা ও মায়া—ওঁদের ডেকেও কিছু গল্প করতে পারতাম। কিন্তু মন যেন সেদিকেও কোন সাড়া খুঁজে পাচ্ছিল না।

দূরে কোথায় যেন গান-বাজনার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। চিৎকারও দু-একটা উঠছিল এই বস্তির কোন কোন জায়গা থেকে। তা ছাড়া নামগোত্রহীন বস্তির কুকুরগুলোর যেন বিরাম ছিল না ঘেউ ঘেউ করার। রাত্রির দিগন্ত বিস্তৃত অন্ধকারের বুকে তার প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছিল সুস্পষ্টভাবে।

হঠাৎ দরজায় ধাক্কা দিলে কে। আমি চমকে উঠলাম। ভয়ও বোধ করি পেয়েছিলাম। চিন্তা ভারাক্রান্ত মানুষের দেহে ও মনে কখনও কখনও এমন শূন্যতা সৃষ্টি হয়, যখন সামান্যতম শব্দেও সে চমকে ওঠে এবং তা ভয়েরই নামান্তর। তবে সে ক্ষণিকের। ক্ষণিক ভয় যখনই সচেতনতার কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে যায়, তখন আর তাকে ভয় বলে মনে হয় না। আমারও তাই হল। তা ছাড়া এই অল্প সময়ে এই রাজ্যে এসে পড়ে অনেক কিছুই তো আমার জানা হয়ে গেছে। কাজেই ভয়টা আর আমার কিসের? আমার এই চিন্তা-স্রোতের মধ্যেই আবার দরজায় ধাক্কা শোনা গেল। আমি বলে উঠলাম, 'কে!'

বিকৃত এবং জড়িত কণ্ঠস্বরে আগন্তুক জবাব দিলে, দ-র-জা-টা খো-লো!'

এত রাতে মাকে বা মায়াকে না ডেকে দরজা খোলাটা কি ঠিক হবে? বরং ওঁদের ডাকাই ভালো। তাই ডাকলাম 'মা— ও মা?'

'কি বাবা', মা সাড়া দিলেন।

বললাম, 'কে যেন ডাকছে।'

কে ডাকছে,' মায়া ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল।

মা বললেন, 'দ্যাখ তো মায়া—'

মায়া এবার বলে উঠল, 'কে?'

বাইরে থেকে তেমনি কণ্ঠস্বরে উত্তর এল, 'আ-মি রে। দ-র-জা-টা খোল!'

'মাধুদি!'

'হ্যাঁ।'

মায়া বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে বললে, 'দ্যাখো আবার কি বলে।'

মা বললেন, 'বলবে আবার কি? বোধ হয় মদ গিলেছে—এবার এসে জ্বালাবে!'

'মদ তো মাধুদি আর খায় না।'

'তবে কি করতে এসেছে এত রাতে?'

মায়া বললে, 'যাক উঠিছি যখন দেখি একবার।'

মায়া আগে কেরোসিনের লম্পটা জ্বালালো। তারপর দরজাটা খুলল। দরজা খুলতেই মাধু ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে আরও চারটে প্রাণী লেজ উঁচু ক'রে তড়াক করে লাফিয়ে ঘরের মধ্যে এল। তারা মাধুর হীরে-মুক্তো-চুনী-পান্না।

মায়া বললে, 'কি ব্যাপাররে মাধুদি!'

তারপর সে খানিকটা পিছিয়ে এসে বললে, 'ইস্, আবার তুই মদ খেয়েছিস্।'

'কি করব ভাই! কিছুতেই ছাড়লে না—জোর করে খাইয়ে দিলে তোর দাদা।'

মায়া সবিস্ময়ে বসে উঠল, 'আমার দাদা!'

মাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, শং-ক-র!'

'হ্যা গো হ্যাঁ, মাধু বল্‌তে লাগল, 'জেল থেকে পালিয়ে এসেছে।'

এবার মা-ও ধড়মড় করে উঠে পড়ে বললেন, 'জেল থেকে পালিয়ে এসেছে। কোথায়! কোথায় সে?'

তিন বছর আগে দশ বছর জেল হয়ে গিয়েছিল শঙ্করের। দীর্ঘকাল মা তাকে কাছে পান নি। সমস্ত ঘটনা ছাপিয়ে মায়ের সেই বেদনাই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিল। তিনি বলে উঠলেন, 'সে আমার এখানে এল না!'

'তোমার এখানে আসবে কি গো—আমি তার জন্যে তিনটে বছর বসে থাকি নি ?'

মা বললেন, 'থাম হারামজাদি ! সে আমার ছেলে—'

'তোমার ছেলে কিন্তু আমার 'মনের মানুষ' বলে মাধু নির্লজ্জের মত খিল খিল করে হেসে উঠল। মায়া ব্যাপারটা উপলব্ধি করে বললে, 'মা, থামো তুমি !' তারপর মাধুকে বললে, 'দাদা কি তোর ওখানে আছে মাধুদি ?'

'না এইমাত্র ফুর্তিটুর্তি করে বসন্ত আর ওস্তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেল।'

'ওদের সঙ্গে দেখা করতে গেল। কিন্তু আমার কাছে আসতে পারল না !' বলে মা যেন যন্ত্রণায় ভেঙে পড়লেন। তারপর বললেন, 'আমি মা, আমি তাকে কত কষ্টে মানুষ করেছিলুম। সে-কথা কি সে ভুলে গেল ?'

'আক্ষেপ করে কি লাভ মা !' মায়া বললে, 'সবই তো জানো ? রাতে আসে নি হয়তো অন্য সময় আসবে।'

'অন্য সময় আবার আসবে কি করে ? এর পর তো পুলিশ পেছনে লাগবে। তখন আর কি আমার সঙ্গে দেখা হবে তার ?'

মাধু বললে, 'বেশ তো, যাও না কেন ওস্তাদের আড্ডায়। দেখতেই যদি চাও—দেখে এসো না।'

কথাটা মাধু মন্দ বলে নি। মা উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'তাই—আমি তাই যাবো।'

মায়া বলে উঠল, 'তাই যাবো—তোমার কি মাথা খারাপ হল নাকি ?'

'মাথা খারাপ তুই কাকে বলছিস মায়া,' মা বললেন, 'মা হওয়ার জ্বালা তুই কি বুঝবি ? আমি যাবো, নিশ্চয়ই যাবো—'

'এই রাতে তুমি ওখানে যাবে !' মায়া বললে, 'তুমি ওদের

ওখানকার সব জানো কি? পথ চিনে ওখানে যাওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব।'

'ছেলের জন্যে মা যমালয়ে পর্যন্ত যেতে পারে' মা বললেন, 'অসম্ভব বলে কিছু নেই। তুই আমায় বাধা দিস্ নি মায়া!'

'বাধা আমি দিই নি', মায়া বললে 'আমি শুধু তোমাকে রাতে যেতে দিতে চাই না। সকাল হলে বরং যেও—'

'আমি আর সময় পাব না হয়তো,' মা অসহায়ের মত আমার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'তুমি যাবে বাবা একবার আমার সঙ্গে!'

'উনি কি পথঘাট চেনেন ওদের আড্ডার?'

'ও না চিনুক, আমি চিনি। অনেকদিন অনেকবার ওদের ওখানে যেতে হয়েছে আমাকে শুধু দিনান্তে তোদের মুখে দুমুঠো দিতে হবে বলে। সে সব দিনের কথা তোরা জানিস না, জানি শুধু আমি আর আমার অন্তর্যামী। অনেক দুঃখ অনেক জ্বালা আমি পেয়েছি, কিন্তু ও শত্তুর আমাকে যে জ্বালা দিয়েছে, সে জ্বালা ভয়ানক জ্বালা!'

'মায়ের মনের কথা না বোঝবার নয়। আমি বললাম, 'একটু ভেবে দেখলে হত না মা! মায়া যখন বলছে—'

মায়া বুঝবে না বাবা, মায়া বুঝবে না', মা বললেন, 'শঙ্কর মরণের পথ ধরেছে। এর পর পুলিশ আসবে। ওকে ধরতে যাবে, ওকে তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য রুখে দাঁড়াতে হবে। তারপর হয়তো গোলাগুলি কিছু ছুঁড়ে বসবে। আর তার ফল কি হবে জানো তো—তার ফল হবে ওর ফাঁসি, নয় পুলিশেরই হাতে ওর মৃত্যু। ওকে সেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আমাকেই টেনে আনতে হবে বাবা, আমাকেই টেনে আনতে হবে। আমার আর কেউ নেই।' তারপর উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তুমি শুধু আমার সঙ্গে একটিবার চলো বাবা।'

এর পর আর কথা চলে না। সেই নিশুতি রাতে মাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পথে। যাবার সময় শুধু আমার ঝুলিটা নিয়ে গেলাম সঙ্গে। ঘরের চৌকাঠ পার হতেই পাঁচির মা মশারির ভেতর থেকে শুধু বলে উঠল, 'কি হয়েছে গো?'

মা বললেন, 'কিছু না।'

তারপর সেই পথ।

মা ও আমি চলতে লাগলাম পথে।

মাথার ওপর অন্ধকার আকাশ। এখানে সেখানে ঝাঁকে ঝাকে বিক্ষিপ্ত নক্ষত্র। একে সরু গলি-ঘুঁজি আঁকা-বাঁকা পথ, তার ওপর ঘন অন্ধকার। আগেই বলেছি আমি ঝুলিটা নিয়েছিলাম। ঝুলি থেকে বার করলাম টর্চ। এক দল কুকুর কোথায় ছিল, ঘেউ ঘেউ করে পিছনে তেড়ে এল। আমি টর্চের আলো ফেলতেই তারা এক-সঙ্গে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

মা বললেন, 'যাক বাবা, আলোটা যে নিয়ে এসেচো—এ তুমি খুব উপকার করলে।'

কি করব মা, সব সময়ে এগুলো কাছেই রাখি, কখন কি দরকারে লেগে যায়, বলা যায় না।'

'বেশ করেচো বাবা, বেশ করেচো।'

দেখলাম আমি আগে আগে চলায় আমারও অসুবিধা হচ্ছিল, মায়েরও অসুবিধা হচ্ছিল। আমার অসুবিধা হচ্ছিল কারণ, আমি পথ চিনি না, তাই ইতস্তত করছিলাম প্রতিটা বাঁকের মুখে। আর মায়ের অসুবিধা হচ্ছিল, সামনে থেকে সব সময়ে পিছনদিকে আমি টর্চটা ফেলতে পারছিলাম না, ফলে আলো-আঁধারে তিনি ভয়ানক মুশকিলে পড়ে যাচ্ছিলেন। তাই বললাম, 'মা আপনি এগিয়ে আসুন। আমি পিছন থেকে বরং আলোটা ফেলি।'

'তাই করো বাবা—তাই করো'

মায়ের মন তখন বোধ করি আর বারণ মানছিল না। তিনি যেন আর দেরিও করতে পারছিলেন না। তাঁর মনে হচ্ছিল তাড়াতাড়ি গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে পারলে তিনি যেন বাঁচেন। ছেলের জন্য মনে তাঁর ঝড় বয়ে চলেছে। স্বামী মারা গেলে দারিদ্র্য আর অনাহারে, আত্মীয়-স্বজনের অহেতুক আক্রমণ ও নিষ্ঠুর নির্যাতনে একদা তিনি পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন ছেলেমেয়ের হাত ধরে। তারপর তিনি উঠেছিলেন এইখানে এসে। কত আশা ছিল তাঁর, কত স্বপ্ন ছিল—এমনিতরো অবস্থার মধ্যে দিয়েই তিনি তাঁর শঙ্করকে মানুষ করে তুলবেন। শঙ্কর মানুষ হলে তাঁর সকল দুঃখ সকল জ্বালার আপনা-আপনিই অবসান হয়ে যাবে। কিন্তু হায়, কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল তা তিনি বুঝতেও পারলেন না। এবং আজ সে কথা ভাবলে তিনি শিউরে ওঠেন।

আজ সবই তাঁর গেছে। এখনও তবু ক্ষীণ আশা। আশার বিরুদ্ধে আশা। সমগ্র পরিস্থিতিটাকে যদি মায়ের অন্ধ আগ্রহ দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়।

সেদিন সেই রাতে পথ চলতে চলতে শুধু মায়ের 'পড়ি-কি-মরি' করে চলাটাই লক্ষ্য করেছিলাম, আর বিশেষ কিছু বুঝতে পারি নি। বুঝতে পারি নি, মায়ের আসল কথাটা কি। পথে বেরুবার আগে তিনি বলেছিলেন, শঙ্কর মরণের পথ ধরেছে। এরপর পুলিশ আসবে। ওকে ধরতে যাবে, ওকে তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে রুখে দাঁড়াতে হবে। তারপর হয়তো ও গোলাগুলি কিছু ছুড়ে বসবে। আর তার ফল কি হবে জানো তো—তার ফল হবে ওর ফাঁসি, নয় পুলিশেরই হাতে মৃত্যু। ওর মৃত্যুর হাত থেকে আমাকেই টেনে আনতে হবে বাবা, আমাকেই টেনে আনতে হবে।' শুধু কি এই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার আগ্রহেই মায়ের এমন করে ছুটে চলা? আর কিছু কি উদ্দেশ্য ছিল না তাঁর?

সেই উদ্দেশ্য কি বুঝেছিলাম, তখন নয়, রাত্রিশেষে ফিরে এসে।

ঘরের এক পাশে জ্বলছে কেরোসিন লম্পটা। মেঝেয় বসে কাঁদতে কাঁদতে বলে যাচ্ছেন আগাগোড়া সব কাহিনী। শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি। হ্যাঁ, শুধুই প্রাণ ধারণের গ্লানি। 'তুমি সম্রাট—সম্রাট তুমি বাঁচাও আমার এই দুটি ছেলে-মেয়েকে।'

'বাঃ বেশ ফুটফুটে ছেলেটি তো তোমার মা!'

'হ্যাঁ—ও আমার শ্বশুরকুলের দেবতা।'

সম্রাট আপাদমস্তক দেখলে ছেলেটিকে। কে জানে তখন যদি সেই সম্রাটের সামনে আয়না থাকত, তাহলে সে যেমন করে তার মাধ্যমে মুখ দেখত, ঠিক তেমনি করে সম্ভবত মহাকালের আয়নায় একবার নিজের মুখখানাও দেখে নিত! হ্যাঁ, কপালে বলিরেখার ছায়া যেন। চিরকাল এই দুর্ধর্ষ জীবনের মধ্যাহ্ন-মার্তণ্ড কর-বিকিরণ করবে না। তার জন্য চাই নতুন সূর্য আরও নতুন। জিজ্ঞাসা করল 'নাম কি তোমার—খোকা?'

'শঙ্কর।

'শঙ্কর!' তারপর সম্রাট নিজের কাছে টেনে নিলে। পকেট থেকে দুখানা দশটাকার নোট বার করে শঙ্করের হাতে দিয়ে বললে 'মাকে দাও।'

মা বললেন, 'অদ্ভুত তোমার দয়া বাবা।'

'দয়া'! সম্রাট সেদিন যেন একটু জোরে জোরে হেসে উঠল।

তারপর প্রতিদিন লোকটা আসত। আসার সময় নিয়ে আসত প্রচুর খাবার। শঙ্কর তো খেতই তার ওপর মায়ার, এমন কি মায়েরও কোন কোনদিন খাওয়া হয়ে যেত। লোকটা এরপর প্রায়ই শঙ্করকে ডেকে নিয়ে যেত। ধীরে ধীরে এমন হল, শঙ্কর আর আসতেই চাইত না লোকটার কাছ থেকে।

সে দেরি করে ঘরে ফিরলে বা না ফিরলে মা যখন কথাটা

তুলতেন, তখন শঙ্কর বলত, অদ্ভুত খেলা শেখায় মা লোকটা—আসতে ইচ্ছে করে না।'

'কি খেলা রে ?'

'এই ধরো কেমন করে লোকের পকেট থেকে টাকা তুলে নিতে হয়, কেমন করে হাতের ঘড়ি খুলে নিতে হয়, কেমন করে ট্রেন-যাত্রীর বাক্স-প্যাঁটরা সরাতে হয়—এই সব খেলা।'

মা বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষু তুলে বলতেন, 'এসব খেলা কিরে—এ তো চুরি শেখায় তোকে !'

শঙ্কর বলত, 'চুরি তো আমি করি-না মা।'

'তা না হোক। তুই আর যাস্ নি বাপু।'

'কিন্তু না গিয়ে যে আমি থাকতে পারি না !'

'কেন থাকতে পারিস্ না ?'

ওস্তাদ আমাকে খুব খাওয়ায় যে !

'কি খাওয়ায় ?'

'মিষ্টি-টিষ্টি কত কি খাবার। খাবারগুলো এত ভালো যে, খেলেই আমার যেন কেমন নেশা লাগে। আমার আরও খেতে ইচ্ছে হয়। তারপর যত খাই, ততই কেমন যেন বুঁদ হয়ে পড়ি। তখন আমার শুয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না।'

······এসব কথা শুনে মা ভয়ে কেমন যেন অসাড় হয়ে যেতেন। মনে মনে প্রমাদ গুণতেন, এখানে এসে তিনি এ কি করলেন জীবনে। এক এক সময়ে মনে হত আর এখানে নয়—অন্য কোথাও, অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে পারলে তিনি যেন বাঁচেন। কিন্তু পর-ক্ষণেই মনে পড়ে যেত, উপায় কিছু নেই। ওরা সবাই মিলে তাহলে তাঁর পিছনে ধাওয়া করবে, আবার ধরে আনবে তাঁকে এইখানে। তা না হলে তিনি বেশ বুঝতে পারবেন যে, লোকটা খাবারের সঙ্গে তাঁর শঙ্করকে নিশ্চয়ই আপিম-টাপিম কিছু খাওয়ায় আর খাওয়ায় এই জন্যেই হয়তো তার পরবর্তী অধ্যায়গুলি তাকে দিয়ে সম্পন্ন

করাতে হবে বলে। অর্থাৎ কেমন করে লোকের পকেট থেকে টাকা তুলে নিতে হয়, কেমন ক'রে হাতের ঘড়ি খুলে নিতে হয়, আর কেমন করেই বা ট্রেন যাত্রীর বাক্স-প্যাঁটরা সরাতে হয়—সেই কাজগুলোই এবার তাকে দিয়ে করাবে।

মা বলতেন, 'খাবারের সঙ্গে তোকে লোকটা নিশ্চয়ই আপিম খাওয়ায়।'

'হতে পারে মা', শঙ্কর বলত, 'বোধহয় সেই জন্যেই সর্দার আমাকে খাবারগুলো গিলে গিলে খেতে বলে।'

মা জিজ্ঞাসা করতেন 'কোনদিন খেতে খেতে চিবিয়ে ফেলিস্ নি?'

'হ্যাঁ, চিবিয়ে ফেলিচি দু'-একবার।'

'কেমন লেগেছে তখন?'

'একেবারে তেতো হাকুচ।'

'তাহলে আমি যা ভেবিচি তাই। এই আপিমের কাজ চলে তোর দেহে—তাই তুই ওখানে না গিয়ে পারিস না!'

'সত্যি মা। তুমি ঠিক বলেছো। এক-একদিন দুপুরে তোমার কাছে বসে বসে যখন কথা বলি তখন আমার খুব ভাল লাগে। মনে করি আর যাব না ওস্তাদের আখড়ায় কিন্তু তোমার কাছে বসে থাকতে থাকতে ক্রমশ আমার গা হাত-পা এমন কামড়াতেথাকে যে, মনে হয় আর যেন বসে থাকতে পারছি না আমাকে সব ফেলে তখন ছুটে যেতে হয় আখড়ায়। গিয়ে সে কি অবস্থা হয় আমার—কেবল সেই খাবারগুলো কোথায় আছে তা খুঁজে বেড়াই, একেবারে পাগলের মত খুঁজে বেড়াই। তারপর খাবারগুলো খেতে পেলে আমার মনে হয় আমি যেন বেঁচে গেলাম।'

মা অবরুদ্ধ নিশ্বাসকে আরও অবরোধ করে বলে উঠতেন, 'ওরে শঙ্কর, এ তোর বাঁচা নয়—এ তোর মৃত্যু, অপঘাত মৃত্যু।'

কি করবেন মা। শঙ্করের এ অপমৃত্যুর জন্য তিনিই তো দায়ী। কেন এসেছিলেন তিনি এখানে? এসেছিলেনই বা যদি—

তবে হাত পেতেছিলেন কেন ঐ লোকটা, ঐ যাকে শঙ্কর বলে ওস্তাদ, মা যাকে মনে করেন, এ রাজ্যের সম্রাট,—সেই লোকটার কাছে? সে লগ্নী করে টাকা আর কেনে মানুষ, যে মানুষকে দিয়ে পরবর্তী সময়ে সে তার কারবার ফলাও করে! ফুটফুটে ছেলে দেখে লোভ হয়েছিল তার। তাকে দিয়ে সে অনেক কাজ করাতে পারবে। কাজেই আর কখনো সে-সুযোগ হারায়?

তবু মা একদিন চলে গিয়েছিলেন শঙ্কর আর মায়াকে নিয়ে। বেলেঘাটা থেকে দমদম, দমদম থেকে বেলঘরিয়া, বেলঘরিয়া থেকে বারাকপুর, বারাকপুর থেকে আবার এদিকে অর্থাৎ কলকাতায়। মা ভেবেছিলেন কোন বাড়িতে দাসীবৃত্তি কিম্বা রাঁধুনীর কাজ করে তিনি শঙ্কর আর মায়াকে মানুষ করে তুলবেন। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, একদিন পুলিশ এসে এক বাড়ি থেকে তাঁদের সবাইকে ধরে নিয়ে গেল।

থানায় দেখা গেল বসন্তকে। বসন্ত—ওস্তাদের সাগরেদ বসন্ত। সেই লোকটা, কপালের ওপরটায় তার রামধনুর মত অর্ধবৃত্তাকার একটা কাটা দাগ, চোখগুলো ভাঁটার মত গোল গোল, সর্বদাই যেন জবা ফুলের মত লাল। মাথায় বাবরি চুল। মোটাসোটা ঘাড়েগর্দানে জোয়ান চেহারা। হাতের গুলো অবধি আস্তিন গুটোনো জামা। হেঁড়ে গলায় সে বললে, কিরে শঙ্কর পালাবি আর?'

অবাক হয়ে গেলেন মা। অবাক হবারই কথা। মা তাঁর ছেলে-মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন কিন্তু কি অদ্ভুত, পুলিশ তাঁদের ধরে নিয়ে এল! শুধু তাই নয়, সেখানে বসন্তকেও ডেকে আনল আবার। কে জানে এদের সঙ্গে পুলিশের কি সম্পর্ক। বসন্ত মাকে বললে, ওস্তাদ তোমাকে মা বলে খাতির করেছিল আর তুমি তার সঙ্গে এই রকমভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করলে?'

মা বলেছিলেন, 'এর মধ্যে তুমি বিশ্বাসঘাতকতা কি দেখলে বসন্ত?'

'বিশ্বাসঘাতকতা নয়—এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কেবলই তো তোমরা পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছো।'

'তোমার ওস্তাদের রাজত্বে বাস করি বলে কি কোথাও ছু'-দণ্ড বেড়াতে যাবারও আমাদের অধিকার নেই ?'

'পাঁচশো বার আছে। কিন্তু বলে যাও নি কেন ?'

আবার ভাগ্যে কি আছে সেই কথা ভেবে মা যেন কেমন শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাছাড়া ওরা আবার কি করে বসবে সেই ভয়ে তিনি ওদের ঠাণ্ডা করার উদ্দেশ্যেই বলে ফেললেন, 'ভুল হয়ে গেছে বাবা সেটা।'

বসন্ত বলেছিল, 'এ ভুল যেন আর কখনো না হয়।'

ভুল আর মায়ের কোনদিন হয় নি। কিন্তু আশ্চর্য ! থানায় বসে থানার দারোগার সামনে সেদিন এইসব কথাবার্তা এমনভাবে হতে লাগল দেখে মা চমকে গিয়েছিলেন। তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে, বসন্তদের দলের সঙ্গে থানার বেশ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। পুলিশ সেদিন মাকে ও মায়াকে ছেড়ে দিয়েছিল। তাঁরা আবার ফিরে এসেছিলেন অভিশপ্ত জগতে। কিন্তু শঙ্কর আর ফিরে আসে নি।

মায়েরই চোখের সামনে শঙ্করকে পুলিশ হাজতে বন্ধ করল। বসন্ত তার সামনে গিয়ে বললে, 'এখন কিছুদিন তোকে টাইট দিই—তারপর বাইরে আসবি।' সেই প্রথম, শঙ্করকে থানা থেকে যেতে হল কোর্টে। কোর্ট থেকে ভবঘুরে আইনে 'ভ্যাগরান্টস্ হোমে।'

মা বলতে লাগলেন. 'সেটা একটা সাক্ষাৎ নরককুণ্ড।'

সত্যিই। ভ্যাগরান্টস্ হোম তৈরি হয়েছিল নাকি ভবঘুরেদের এক জায়গায় রেখে তাদের বদ অভ্যাসগুলিকে সংশোধন করে সুস্থ সামাজিক মানুষ হিসাবে সমাজকে উপহার দেবার জন্যে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার বদলে সেখানে পাকা অপরাধী তৈরি করাই

হয়।' ভ্যাগরান্টস্ হোমের পরিচালক থেকে প্রহরী, কেরানী, সরকার সকলেই এক-একটা পাকা ক্রিমিন্যাল। মন্ত্রীরা বিধানসভায় বাজেট পেশ করেন, এই খাতে ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করার সময় বড় বড় মানবিকতার বুলি আওড়ান। তারপর দেখা যায় যে. অব্যবস্থা ও যে অমানুষিকতা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছিল সেটাই এক-টানা চলতে থাকে। ভ্যাগরান্টস্ হোমে খাবার থেকে, ওষুধ থেকে, কাপড়-চোপড়, আসবাবপত্র. কনটিনজেন্সি এমন কি ডাক টিকিট পর্যন্ত কর্তৃপক্ষেরই কেউ না কেউ চুরি করে। সেখানে দেখার কোন লোক নেই। দীর্ঘকালের আমলাশাহী যে কায়েমী স্বার্থচক্রের সৃষ্টি করেছে তাকে ভাঙবে কে? প্রগতিশীল মানুষ হলে বড় জোর তাদের ধরতে পারেন কিন্তু প্রতিকার কিছু করতে পারেন না। কাউকে বরখাস্ত করলে তারা সুকৌশলে ধরাধরি করে রেহাই পেয়ে যায়। এছাড়া ভ্যাগরান্টস্ হোমগুলিতে প্রহরী, কেরানী, অফিসার-দের মাধ্যমে গাঁজা, চরস, আফিম, কোকেন সব রকমই বিক্রি হয়। ক্রিমিন্যাল গ্যাং শুধুমাত্র টাকার জোরে প্রহরীদের ঘুষ দিয়ে প্রয়োজনীয় ভবঘুরেদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে। এটা ক্রিমিন্যাল গ্যাংদের একটা রিক্রুটিং সেণ্টার।

এই পরিবেশের মধ্যে শঙ্করকে তিন মাস কাটাতে হল। বসন্ত আসত। তার সঙ্গে দেখা করে যেত। খাবার-দাবার. আফিম, গাঁজা, চরস দিয়ে যেত নিয়মিত। এখান থেকেই শঙ্করের জীবনের লক্ষ্য স্থির হয়ে গেল। মুক্তির পর আর সে মায়ের কাছে যেতে পারল না—গিয়ে উঠল একেবারে আড্ডায়। অবশ্য মাঝে মাঝে যে সে বাড়ি আসত না তা নয়, কিন্তু সেও মায়ের জন্য নয়—ঐ মাধু মেয়েটার জন্যে। একদিকে ওস্তাদ আর তার সাগরেদ—আরেক দিকে ঐ মাধু। মায়ের কাছে ফিরে আসার পথ তার বন্ধ।

তবু একদিন সে এল। সেই বোধ করি তার শেষ আসা। সেদিনটা মা ভুলতে পারেন না। কান্নায় ভেঙে পড়ে তিনি বলতে

লাগলেন, ওস্তাদ আর বসন্ত ওরা যে কি মানুষ তা ধারণা করা যাবে না। সেদিন আধমরা অবস্থায় বসন্ত আর দলের কারা যেন সব চ্যাংদোলা করে তাকে মায়ের কাছে নিয়ে এল। সারা গায়ে চাবুকের দাগ, কপালে বড় বড় কালো-শিরার নীল-নীল ফুলো। মুখখানা প্রায় বিকৃত—থে'তো হয়ে গেছে মনে হয়। মা আছাড় খেয়ে পড়লেন শঙ্করের বুকে। শঙ্কর মায়ের গলা জড়িয়ে কেঁদে উঠল, 'আর আমি বাঁচব না মা।'

মাও কাঁদলেন তেমনি করে।

বসন্ত বললে, 'ভয় নেই, ভয় নেই, বাঁচবি।'

মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি করে ওর এ অবস্থা হল—কে এমন নির্দয়ভাবে বাছাকে আমার মারল!'

বসন্ত হেসে বললে, 'কে আবার মারবে, আমিই মেরেছি।'

'তুমি।'

'হ্যাঁ আমি। ওরই ভালর জন্যে আমাকে মারতে হয়েছে।'

'ভালর জন্য কেউ এমন করে মারে,' মা শিউরে উঠলেন। বসন্ত বললে, 'এরপর পুলিশে ধরা পড়লে পুলিশে যখন ওকে নির্দয়-ভাবে ঠেঙাবে তখন কি আর ও বাঁচবে। এটা তারই মহড়া শুধু।' কথাগুলো বলার পর টেনে টেনে হাসতে হাসতে বসন্ত তার অপরাপর সঙ্গীদের বললে, 'চল্‌রে-চল্‌। শঙ্কর এখন একটু মায়ের আদর খাক।'

অদ্ভুত এ অভিশপ্ত জগৎ। আর অদ্ভুত এই শঙ্কর। মায়ের আদরে একটু ভাল হতেই সে আবার পালিয়ে গেল ওদের আড্ডায়। মা বুঝলেন কি দুর্নিবার আকর্ষণ ওদের। সে আকর্ষণের টানে মা, বোন, সমাজ-সংসার সব মিছে শঙ্করের কাছে।

সেই রাতেও শঙ্কর সেই দুর্নিবার আকর্ষণের বেগেই আড্ডার দিকে এসেছিল এবং তার সমগ্র অতীতের কথা ভেবে মা বোধ করি এত উতলা হয়ে আমাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, যদি কোন রকমে

এখনো তাকে ফেরাতে পারেন। তিনি তাঁর আগ্রহকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারবেন কি-না এবং সে ভরসা তাঁর আছে কি-না তা আমি বুঝতে পারলাম না—কিন্তু এটুকু বুঝতে পারলাম, মা অন্ধ-আবেগে এগিয়ে চলেছেন তাঁর পথে।

অনেক ঘুরে, অনেক গলি-ঘুঁজি অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত একটা জায়গায় এসে পড়লাম। দক্ষিণে ও বামে ছোট ছোট খোলায় ছাওয়া কতকগুলো দোতলা ঘর, সামনে একটা গলি। সেইখানে থমকে দাঁড়িয়ে মা বললেন, 'এখানটাতেই হবে।' আমি বুঝতে পারলাম, এমন জায়গায় আমি এলাম, যেখানে আমাকে প্রতিটা মুহূর্তেই প্রস্তুত থাকতে হবে যে-কোন অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্যে। সম্বল আমার কাঁধের ঝুলিটা আর তার ভেতরে আমার সযত্নে রাখা কতকগুলি জিনিস। জিজ্ঞাসা করলাম, 'বুঝতে পারছেন ?'

মা বললেন, 'মনে হচ্ছে তো এখানটাতেই।'

সম্ভবত আমাদের টের পেয়ে হঠাৎ সশব্দে সামনের বাড়িটার দরজা খুলে গেল। শক্তিশালী একটা টর্চের আলো পড়ল আমাদের মুখে-চোখে। লোকটা বাজখাঁই গলায় বলে উঠল, 'টুনটুনি, জবা-কুসুমটা নিয়ে আয়তো।'

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। লোকটার ভাষা আমি বুঝতে পারলাম না এবং এখন কি কর্তব্য আমার তাও স্থির করতে পারলাম না। ভাবলাম মা বোধহয় লোকটাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন! কিম্বা হয়তো লোকটাও আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু এসবের কিছুই হল না—মুহূর্তের মধ্যে আমার হাতের আলোয় দেখলাম, একটা মেয়ে, বেশ সুন্দরী মেয়ে বলেই বোধ হল, ছুটে এসে রুমালের মত কি একটা লোকটার হাতে দিলে আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লোকটা ছুটে এসে মায়ের মুখখানা চেপে ধরল। আমি এই সর্ব-প্রথম ঝুলি থেকে বের করলাম, সিক্স চেম্বার্ড রিভলবারটা।

মা পড়ে গেলেন মাটিতে। বাতাসে দুর্গন্ধ। বুঝলাম টুনটুনির জবাকুসুম মানে আর কিছুই নয়—ক্লোরোফর্ম।

কিন্তু এভাবে ক্লোরোফর্ম করার কারণ কি ওদের? ওরা কি শঙ্করের মাকে জানে না, না চেনে না, না এই মুহূর্তে চিনতে পারে নি—কোন্‌টা? না, এখানে যে কেউ আসুক রাতে, তাকে ওরা এমনিভাবেই 'জবাকুসুম' দেয়? এবার নিশ্চয়ই আমার পালা। আমি রিভলবারটা উঁচিয়ে ধরলাম। লোকটা পিছিয়ে গিয়ে, হাত তুলে বলে উঠল. 'ওরে শালা একেবারে তৈরি হয়ে এসেছে। খবর দে টুনটুনি ওস্তাদকে, বসন্তকে—'

টুনটুনি দরজার দিকে যাবার আগেই আমি ছুটে গেলাম দরজার দিকে। আমার স্থির বিশ্বাস, শঙ্করের মাকে ক্লোরোফর্ম করা হয়েছে শুধু শুধু, একথা ওদের ওস্তাদকে আর বসন্তকে আমি বলতে পারলে নিশ্চয়ই আমার কোন বিপদ ঘটবে না। তাই ঢুকে পড়লাম ভেতরে। ঘরের ভেতর দিয়ে আরেকটা ঘর—সেখানে যেতেই দেখলাম ডানদিকে লম্বা একটা বারান্দা। বারান্দায় কতকগুলি বিছানা। অনেকগুলি ছেলে চোখবাঁধা অবস্থায় শুয়ে রয়েছে সেই বিছানাগুলোয়। দেখে মনে হল স্থানটা যেন হাসপাতালের একটা অংশবিশেষ। হ্যাঁ ঠিক তাই। একদিকে অপারেশন থিয়েটার—সেখানে অত্যন্ত শক্তিশালী আলো জ্বলছে। এ যে রাজ্য, হয়তো এই ছেলেগুলোকে এইভাবে চোখ উপড়ে নিয়ে অন্ধ সাজিয়ে ভিক্ষা করানো হয়। কে জানে সেকথা! অকস্মাৎ দরজা ঠেলে আমার ভেতরে ঢুকে পড়ার শব্দে আগাগোড়া শ্বেত-শুভ্র এ্যাপ্রন পরা মুখে মাস্ক আঁটা ডাক্তার আর নার্স ছুটে বেরিয়ে এল।

আমি অবাক। এ কোন্ রাজ্যে আমি এসে পড়লাম। ডাক্তার মুখের ঢাকনাটা তুলে আমার দিকে এক ভয়-বিহ্বল সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালে। দৃষ্টিটা যেন আমার খুব পরিচিত। কোথায় দেখেছি-দেখেছি বলে মনে হল। কিন্তু সময় নেই আমার—ওস্তা-

দের কাছে পৌঁছুতে না পারলে এখুনি হয়তো কোন অঘটন ঘটে যাবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ডাক্তারকে, ওস্তাদের ঘর কোন-দিকে ?

ডাক্তার সত্যিই ভয় পেয়েছিল আমার হাতে রিভলবার দেখে। লোকটা সোজা ভেতরদিকে ইঙ্গিত করে আঙ্গুল দেখালো।

ঠিকই দেখিয়েছে লোকটা। কারণ, ঐদিকের দোতলা থেকে পায়ে ঘুমুর-বাঁধা কোন নর্তকীর নাচ আর গানের আওয়াজ আস-ছিল। সামনে একটা উঠোনমত। উঠোন পার হয়ে সিঁড়ি। আমি ছুটে গেলাম সেদিকে। দেখলাম টুনটুনির সেই ক্লোরোফর্ম দেওয়া লোকটা তখন ঘর থেকে একটা পাইপগান নিয়ে আমাকে তাক করতে করতে ছুটে আসছে। আমি সিঁড়ির আড়ালে নিচু হতে হতে একছুটে গিয়ে দোতলায় যে ঘরে নাচ-গান হচ্ছিল সেই ঘরে ঝড়ের মত ঢুকে পড়লাম।

কিন্তু এ-কি !

ঘরের মেঝেয় দামী কার্পেটের ওপর হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে একজন, পাশে তার তবলচি। সামনের সোফায় একটি পানোন্মত্ত মানুষ বসে—সাদা পাঞ্জাবীর ওপর কাজকরা এক মটকার জহর-কোট তার গায়ে। সামনে তার ততোধিক পানোন্মত্তা এক নর্তকী ঘাঘরা ঘুরিয়ে নাচছে অপূর্ব ছন্দে। সশব্দে আমার ভেতরে ঢোকায় তারা সবাই সচকিত হয়ে একসঙ্গে বলে উঠল, 'কে !'

পিছনে আমার পাইপগান নিয়ে লোকটা ছুটে আসছে। মুহূর্তের বিলম্বতায় আমার পিঠ গুলীবিদ্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই যেমনি আকস্মিকভাবে আমি ঢুকেছিলাম তেমনি আকস্মিকভাবেই দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু কি দেখলাম, কাকে দেখলাম, আমার সামনে !

আমি যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলাম 'রা-নী-দি !'

রানীদি ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করে উঠলেন, 'বি-জ-ন।'

ওস্তাদ ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। পাইপগানধারীও তখন এসে পড়েছে। ওস্তাদ হাত নেড়ে তাকে ইসারা করল চলে যেতে। আমি বললাম, 'ঐ লোকটা শঙ্করের মাকে ক্লোরোফর্ম করেছে!' পাইপগানধারী তখনও চলে যায় নি। ওস্তাদ হাঁকলে, 'জ-গ-দী-শ! তুমি?'

'হ্যাঁ ওস্তাদ।'

'বুড়িকে বাড়ি দিয়ে এসো।'

দুরন্ত উত্তেজনার পর এই পরিবেশে এমনিভাবে রানীদিকে দেখে আমি যেন হতবাক হয়ে গেলাম।

শৈশবের সেই আমি যেন রানীদির বুকের মধ্যে।

ঘটনার আকস্মিকতায় অপ্রকৃতিস্থা রানীদি তখনও আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। মুখ থেকে তাঁর মদের ঝাঁঝালো গন্ধ বেরুচ্ছে। যুগযুগান্তের সংস্কার তখন আমার বিস্ময়কে ছাপিয়ে যেন প্রবল-বেগে নাড়া দিচ্ছিলো। মুখফুটে আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হল, 'রানীদি, তুমি এ কি করলে! কেন, কেন তুমি আমার সমস্ত স্বপ্নকে এমন করে ধূলিসাৎ করে দিলে, এই রাতে এমন করে নর্তকীর বেশে?' কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই ভাঙ্গা গলায় তিনি বলতে লাগলেন, 'বিজন, কেন এখানে এলি—কেন এলি? বল তুই কেন এলি?' আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না। মনের মধ্যে তখন আমার সংস্কারের ঝড়। রানীদি, আমার স্বপ্নের রানীদি, তাঁকে শৈশব থেকে আমি বসিয়ে রেখেছি সম্মানের এক উচ্চ আসনে। আমার চিরদিনের সশ্রদ্ধ দিদি তিনি। তাঁকে আমি মায়ের পাশাপাশি বসিয়ে ভালবেসেছি। এইভাবে মদ্যপায়ী এক নর্তকীর বেশে তাঁকে আমি দেখব, এ যে আমি স্বপ্নেও কল্পনা করি নি! অবশ্য নাচতে তাঁকে এর আগে আমি দেখেছি। কলেজে

পড়ার সময় তিনি অনেক উৎসবে নাচতেন। সেজন্য বাড়ীতে মহড়া দিতেন। সে সব কথা আমার মনে আছে কিন্তু এ কী! এ যে আমার জীবনে কত বড় আঘাত, কত বড় শাস্তি তা আমি ছাড়া আর কে বুঝবে? কেউ যদি কখনো তোমরা আমার অবস্থায় পড়ো, মনে মনে ভেবে দেখো আমার কথাগুলো, অনুভব কোরো এই অবর্ণনীয় যন্ত্রণার দুঃসহ ব্যথা। মুহূর্তের ভগ্নাংশে ভগ্নাংশে বুকের মধ্যে একটানা ব্যথার মীড় কোন্ সুরের লহর তোলে, শুধু একবার—একবার তোমরা স্মরণ কোরো। রানীদিকে আমি দ্বিধাহীনকণ্ঠে বলেছিলাম অন্য কেউ তাঁকে অসতী, কুলটা মেয়ে মনে করলেও আমি কখনো তা করি নি। আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'তুমি বিশ্বাস করো রানীদি, 'তুমি কলংকিনী নও।' আর ঘৃণা করা? ঘৃণা সম্পর্কেও আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'ঘৃণা করবো কেন—মানুষকে ঘৃণা করা মহাপাপ'! কিন্তু আমার সে দ্বিধাহীন কণ্ঠকে আজ এমন করে অবরুদ্ধ করে দিলে কে? এই মুহূর্তে কেন আমার কণ্ঠ এমন নীরব হয়ে গেল? কেন আমি রানীদির দু'হাতের বেড়াজালে তাঁর বুকে আবদ্ধ অবস্থায় লৌহ-ভীমের মত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে বসেছি? রানীদির সঙ্গে আমার তো কোন শত্রুতা ছিল না?

রানীদি মদের খেয়ালে তেমনি করেই আমাকে বলতে লাগলেন, 'বল তুই কেন এখানে এলি—কেন এলি?'

আমার চোখ ফেটে জল আসবার উপক্রম হয়েছিল আহত মন ও প্রচণ্ড অভিমানে, আবেগে আমি ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠলাম, 'ছেড়ে দাও তুমি আমায়!'

'ছেড়ে দেবো—কিসের জন্যে ছেড়ে দেবো?'

যন্ত্রণায়, ব্যথায় ভেঙে পড়ে তেমনি-ভাবেই আমি বললাম, 'তোমাকে আমি এখানে এইভাবে দেখব, এ কখনো আশা করি নি। তুমি আমায় ছেড়ে দাও রানীদি—'

'ছেড়ে দেবো—বলিস কিরে', রানীদি বললেন।

ইতিপূর্বে তাঁর ঘরে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির আড়ালে আফিমের কারবার প্রত্যক্ষ করেও যা আমার মনে হয় নি এবং যা আমি মেনেও নিয়েছিলাম, এখন রানীদির এই অবস্থা দেখে সেটুকু মেনে নেওয়া তো দূরের কথা. আমি যেন চরম বিরক্তিতে তাঁর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য ছটফট করতে লাগলাম। নেহাৎ ঘটনাচক্রে আমি এখানে এসে পড়েছি এবং এসে এই যে অবস্থা দেখছি, এতে সে মন আমি কোথায় পাবো, যে মনকে সংযত করে আমি এ পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করব? এ পরিস্থিতি আমার কাছে ঝড়ের পরিস্থিতি, ভূমিকম্পের পরিস্থিতি কিংবা রাজ-ছত্র ভেঙে পড়ার মত এ আমার কাছে কোন স্বপ্নসৌধ ভেঙে পড়ার পরিস্থিতি।

আমার ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখে বোধকরি রানীদির কিছু একটা মনে হয় এবং তারপর লক্ষ্য করলাম তাঁর হাতের বাঁধনটাও কেমন যেন খানিকটা শিথিল হয়ে গেল। আমি এবার জোর করে তাঁর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে উঠলাম, যেতে দাও আমাকে।'

রানীদি হঠাৎ যেন কয়েক পা টলে গেলেন। তারপর দৃঢ়ভাবে আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন. 'চলেই যদি যাবি তো এসেছিলি কেন?'

বললাম. 'ভুল করেছিলাম।'

'ভুল—না দেখতে এসেছিলি তোর রানীদি কতখানি অসতী, কতখানি কুলটা কিংবা সে কি পরিমাণ কলংকিনী, না?'

রানীদি অপ্রকৃতিস্থা। কিন্তু তবু তাঁর এসব কি কথা!

যে নারী গভীর রাতে অভিসারিকা নায়িকার মত নর্তকীর ভূমিকা পালন করে, ঘাগরা পরে আর সুরা পান করে. তাকে আর আমি কেমন করে সে মর্যাদা দেবো, যে মর্যাদা তাঁকে আমি দিতাম আগে? তবু রানীদির খোঁচাটাই আমার কাছে তখন রীতিমত পীড়াদায়ক বলে মনে হল এবং তারই জের টেনে আমি বললাম,

'আমার এখানে আসাটা দেখে কি তোমার সেই কথাই মনে হয় ? চোখের সামনে তুমি দেখতে পেলে না জগদীশ না কি নাম—সেই লোকটা শঙ্করের মাকে ক্লোরোফর্ম করে তার পর আমাকে পাইপ-গান নিয়ে খুন করতে এসেছিল ?'

এতক্ষণে রানীদির খেয়াল হল যে ঘরে আরও লোক আছে। তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন ওস্তাদের দিকে। ওস্তাদ বললে, 'হ্যাঁ, জগদীশ এসেছিল।'

'হঠাৎ ?'

'জানি না।'

মদের খেয়ালে হয়ত কেউই ওরা খেয়াল করে নি ব্যাপারটা। তা না হলে শঙ্করের মা কেন এসেছিলেন সে কথা জিজ্ঞাসা করত। কিন্তু তা না করে সম্ভবত আমার এসে পড়াটায় যে আকস্মিকতা সৃষ্টি হয়েছিল, তার মধ্যেই ওরা ডুবে গিয়েছিল। তাই আমিই বললাম, 'জগদীশ আসার কারণ শঙ্করের মা এসেছিলেন বলে। আর শঙ্করের মা এসেছিলেন শঙ্কর জেল থেকে পালিয়ে এসেছে শুনে ছেলের সঙ্গে দেখা করতে—'

এবার ওস্তাদ যেন লাফ দিয়ে উঠল একেবারে। সে বলে উঠল, 'বল কি—শঙ্কর জেল থেকে পালিয়ে এসেছে ? আরে আমার ছোট ওস্তাদ—'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, সে পালিয়ে এসেছে বলেই তার মা আর আমার এখানে আসা।'

'কোথায়—কোথায় সে ' ওস্তাদ উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

বললাম, 'এদিকেই এসেছে শুনেছি।'

'এদিকে', ওস্তাদ বললে, 'তাহলে নিশ্চয়ই বসন্তর ওখানে গিয়ে উঠেছে।' কথাটা বলেই লোকটা রানীদির দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমি আসছি।' তারপর দ্রুতবেগে সে বেরিয়ে গেল। সে বেরিয়ে

যেতে হারমোনিমওয়ালা ও তবলচি বলল, 'আমরা আর কি করব দিদিমণি ?'

'তোমরা এখন আসতে পারো।'

'বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা' বলতে বলতে লোকগুলো চলে গেল।

ওরা চলে যেতে রানীদি আমাকে প্রায় হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলে সোফার ওপর। তারপর নিজে বসে পড়ল আমার দিকে মুখ করে আমারই পাশে। আমি তখন নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম। স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় বোধকরি আমার চোখে জলও এসে পড়েছিল। রানীদি আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে সহসা আমার ঘাড়ের দু'দিকে হাত দিয়ে আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, 'মনে বড্ড লেগেছে—না রে !'

আমি কোন কথা না বলে জোর করে ঘাড়টা তাঁর বুক থেকে সরিয়ে নিলাম।

রানীদি বললেন, 'এ কি—তুই তো আমায় ভালবাসতিস বিজন।'

যন্ত্রণাকাতরকণ্ঠে বলে উঠলাম, ভালবাসি ঠিক, কিন্তু তুমি মদ খাও। এ তো আমি জানতাম না।'

'মদ খেলে বুঝি খুব রাগ হয় তোর ! রানীদির কণ্ঠস্বরে কেমন যেন মমতা। আমি কোন কথা বললাম না। তিনি নিজেই বলে যেতে লাগলেন, 'মদ খাই কিন্তু কেন খাই—কই সে কথা তো তুই আমায় জিগ্যেস করলি না ?'

মমতাপূর্ণ কথার পরই হঠাৎ তাঁর এমন একটা উক্তিতে মনটা কেমন যেন আমার ছ্যাঁৎ করে উঠল। এ কথা তো মানুষের মুখ থেকে অমনি অমনি বেরোয় না—বরং গভীর ক্ষত-লাঞ্ছিত জীবনের চরম অভিজ্ঞতা থেকেই এ কথা উৎসারিত হয়ে আসে। তবে কি রানীদির এই মদ খাওয়ার পিছনেও কোন ঘটনা আছে ? থাকতেও পারে। কিন্তু কি জানি, তাঁকে আর আমি বিশ্বাস করতে পার-

ছিলাম না। রানীদি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন এ-কথাও যেমন ঠিক, তেমনিই হয়তো ঠিক তাঁর অধঃপতিত জীবনটাও। ইতিপূর্বে তাঁকে দেখেছি আমি বৈষ্ণবীর বেশে, দেখেছি বে-আইনী আফিমের কারবারীরূপে--এখানে দেখছি মাতাল নর্তকীর বেশে অপরের কামনার আগুনে ইন্ধন যোগাতে। রূপোপজীবিনীদের মতই এ পথ একটা ভ্রষ্টাচারের পথ, এ পথ মধুরাতে কত মুগ্ধ হৃদয়ের বহু চাটুকথা শোনারই পথ। তাই রানীদিকে আমার মনে হল তিনি ভ্রষ্টা। হয়তো একদিন ছিল, যখন রানীদি সংগ্রামই করে গিয়েছিলেন নিজের বিরূপ-ভাগ্যলিপির বিরুদ্ধে। কিন্তু তাঁর নিজের কথাতেই তিনি আমাকে বলেছিলেন. 'আমি পারলুম না—আমি হেরে গেলুম'। কে জানে, এ কি তবে রানীদির সেই পরাজিত জীবনের অপরিমেয় গ্লানি কিম্বা তার পঙ্কিল রূপ ?

এর পর রানীদি আমাকে প্রবলবেগে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠলেন, 'বল, তুই চুপ করে রইলি কেন ?'

বললাম, 'কি বলব তোমাকে ?'

'বলবার কি কিছুই নেই রে ?'

'কি রেখেছ তুমি আমার বলার ?'

এবার রানীদি কেমন যেন অনুযোগের সুরে বললেন, 'হ্যাঁ রে, আমি না হয় বলার কিছু রাখি নি কিন্তু তোরও কি চোখ নেই সবকিছু দেখার। তুই জ্ঞানী-গুণী, অনেক তোর লেখাপড়া, মানুষ চেনবার ক্ষমতাও তোর আছে কিন্তু তুই এ-সব কিছুই কি হিসেব করে দেখবি না ?'

রুষ্টভাবে বললাম, 'কি হিসেব করে দেখতে বলছ তুমি ?'

রানীদি হঠাৎ হেসে উঠলেন। তারপর ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, 'তুই আমাকে বেশি ভালবাসিস বলে কি বেশি শাস্তি দিবি বিজন ? অপরে আমাকে কোন শাস্তি দিলে তুই এতক্ষণ হয়তো তুলকালাম লাগিয়ে দিতিস—আর নিজে যখন শাস্তি দিচ্ছিস, তখন

কি তোর মনের মধ্যে আসল মানুষটা এতটুকু গর্জন করে উঠবে না ?'

এ কোন্ ছলনাময়ী নারীর রহস্যময় জীবনের ততোধিক রহস্যময় কথা। এই রাতে এই চরম সমাজবিরোধী এক চক্রে, একেবারে তার মর্মমূলে বসে আমি এ সব কি শুনছি, কি দেখছি! অবাক হয়ে গেলাম রানীদির এই পরিচয়ে। মনে পড়ে গেল শৈশবে এই নারীরই কোমল বুকে স্বর্গীয় সৌরভের ঘ্রাণে আমি মানুষ হয়েছি, স্বপ্ন দিয়ে তাঁর মূর্তিকে যত সুন্দর করে পেয়েছি, আমি মনে মনে গড়ে তুলেছি। অথচ এই বীভৎস অভিশপ্ত জগতের মধ্যে যখন তাঁকে দেখলাম, তখন কেমন যেন আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তবু তখনও আমার ধারণা পূর্ববৎই ছিল, তার কোন বিকৃতি ঘটে নি। যে মূর্তিকে আমি অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা, ভালবাসা, মর্যাদা দিয়ে গড়ে তুলেছি, তাকে আমি ভাঙতে দিই নি। কিন্তু এই মুহূর্তে রানীদির এই সব জ্ঞানমার্গের দর্শনশাস্ত্রীয় কথা শুনে আমি যেন জ্বলে উঠলাম মনে মনে। এই তো সেই জগৎ—যে জগতে ভানু অন্ধ সেজে, নয়তো মাতৃদায়-পিতৃদায় বলে উত্তরীয় গলায় ভিক্ষা করে, মেনকা পাঁচির মার খোকাকে ভাড়া নিয়ে ছেলে সাজিয়ে অর্থ উপার্জন করে, মাধু হীরে-মুক্তো-চুনী-পান্নাদের আফিম খাইয়ে তালিম দেয় আর কোহিনূরকে দিয়ে আসে জেলখানায়—চিঠি গাঁজা, চরস, কোকেন, আফিম, স্মাগল করার উদ্দেশ্যে। যে জগতে কৃষ্ণ-রাধিকার যুগল মূর্তির সামনে ধূপ, চন্দন আর ফুল সাজিয়ে রেখে বে-আইনী আফিমের কারবার চালানো হয় নাকে তিলক কেটে, যেখানে শঙ্কর জেল থেকে পালিয়ে এসে ওঠে আড্ডায়, যেখানে টুনটুনি জবাকুসুম নিয়ে আসে, জগদীশ ক্লোরোফর্ম করে, তার পর পাইপগান নিয়ে ছোটে মানুষ খুন করতে, যেখানে নাবালক শিশুদের চোখ উপড়ে নেয় ডাক্তার আর নার্স, তারপর তাদের অন্ধ করে দিয়ে বোধকরি পাঠায় অর্থ উপার্জনের ব্যবসায়, যেখানে গভীর নিশীথে উন্মত্ত

রজনীর উৎসব চলে সুরা আর নারী নিয়ে, যেখানে নর-নারীর সম্পর্ক দেহ বিকি-কিনির মধ্যে এসে পর্যবসিত হয়—সেখানে সেই চক্রের নায়িকার ভূমিকায় দাঁড়িয়ে রানীদির এ-সব কথা আমার কাছে যেন কেমন উপহাসের মত শোনালো। একেবারে অভিনেত্রী হয়ে গেছে রানীদি! রীতিমত ক্রুদ্ধস্বরে আমি এবার বললাম, 'অনেক কথা বলেছো তুমি—আর নয়। তুমি আমাকে যেতে দাও।

'সেই এক কথা', রানীদি উঠে পড়ে বললেন, 'যেতে দাও, যেতে দাও, যেতে দাও।

'হ্যাঁ আমার সেই এক কথা!'

হঠাৎ রানীদির কি হল কে জানে। এক হিংস্র ক্রূর দৃষ্টি প্রসারিত করে আমার দিকে তিনি এগিয়ে এলেন; আর সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে একখানা ছোরা বের করে আমার দিকে তুলে ধরে বললেন, 'যাবি—যা দিকি!'

অদ্ভুত এক বিস্ময়কর দৃশ্য!

ঘরের প্রজ্বলিত আলোয় ছোরাখানা ঝক্ ঝক্ করে উঠল। ঘাগরাপরা কোন জিপসি মেয়ের মত ওড়না উড়িয়ে রানীদি এ যেন কোন খুনীর ভূমিকায় অভিনয় করছে বলে মনে হল। আমি এতটুকু ভয় পাই নি। আমাকে ভয় দেখাবার জন্য রানীদি আরও কিছু কসরৎ করার চেষ্টা করলেন এবং বলতে লাগলেন, 'আমার এ ছোরা অব্যর্থ—আমার অসম্মানের একমাত্র পরিত্রাতা!' কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে পাকখানেক ঘুরে গিয়ে রানীদি কেমন যেন এক বীভৎস হাসি হেসে উঠলেন!

আমি বললাম, 'কিন্তু আমি কি তোমাকে অসম্মান করেছি বলে তুমি মনে করো?'

রীতিমত ক্ষুব্ধকণ্ঠে রানীদি বললেন, 'তুই আমাকে যেভাবে অসম্মান করছিস, এভাবে অসম্মান আমাকে কেউ কোনদিন করে নি। করতে পারবেও না।'

'এসব বাজে কথা তোমার রাখো', বলে উঠলাম, 'পথ ছাড়ো তুমি !'

'নাঃ', রানীদি চীৎকার করে উঠলেন।

এবার আমি রুখে উঠে বললাম, 'তুমি আমাকে ছোরা দেখাতে পারো আর আমি তোমাকে কিছু দেখাতে পারি না?' বলে আমি ঝুলি থেকে পুনরায় আমার রিভলবারটা বের করলাম।

রানীদি বললেন, 'হ্যাঁ, দেখছি তোর কাছে একটা পিস্তল আছে। কিন্তু তুই কি আমায় মারবি? মার দেখি'—বলে রানীদি আমার সামনে বুক পেতে দিলেন।

আমি তাঁকে বললাম, 'আমি তো তোমায় মারব বলি নি বরং তুমিই তোমার ছোরা যে একেবারে অব্যর্থ, সেই কথাই আমাকে বলেছো !'

'ঠিকই বলেছি তো !'

'তবে, আমি তোমায় মারব, তুমি এ কথা বলছ কেন?'

সহসা রানীদি ছোরাখানা ঘরের কার্পেটের ওপর ফেলে দিয়ে উচ্ছ্বসিতভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ওরে বিজন, তুই কি কিচ্ছু বুঝিস না? তুই-ই তো বলেছিলিস, তুই আমাকে কখনো ঘৃণা করবি না—কিন্তু কিন্তু'···ফুঁপিয়ে ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠলেন তিনি। আমি রীতিমত মুশকিলে পড়ে গেলাম। এ যেন এক অদ্ভুত জীবন-নাট্যের তুলনাহীন মুহূর্ত। মনের মণিকোঠায় যে পুঞ্জীভূত সহানুভূতি ও দরদ ছিল লুকিয়ে তা যেন দ্রবীভূত হয়ে এবার বাইরে আসবার চেষ্টা করতে লাগল। বললাম, 'রানীদি, ঘৃণা তোমায় আমি করি নি, তুমি আমার তৈরি করা প্রতিমাটাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিয়েছ বলেই আমার রাগ, আমার অভিমান।'

'রাখ, রাখ তোর রাগ অভিমান,' রানীদি আমাকে ছেড়ে দিয়ে ঘরের এককোণে চলে গেলেন। তারপর সেখানে একটা আলমারি

থেকে বার করলেন একটা মদের বোতল। আমি ছুটে গেলাম তাঁর দিকে। বলে উঠলাম, 'এ কি করছ রানীদি। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি?'

'দে দে বিজন, আমায় পাগল হতেই দে। এ জীবন আর আমি সহ্য করতে পারছি না।'

ব্যথাটা বা বেদনাটা রানীদির কোথায় তা আমি জানি। কিন্তু বর্তমানে তাঁর কি জ্বালা, কি দুঃখ তা আমার কোনক্রমেই বোধগম্য হল না। তবু আমি বুঝলাম নিশ্চয়ই আছে কোথাও কিছু একটা। আমি রানীদির হাতখানা ধরে ফেলেছিলাম ইতিমধ্যে। বলে উঠলাম, 'রানীদি, তোমার সব কথা আমি শুনব—শুধু তুমি একটি কথা আমাকে দাও—'

রানীদির চোখ থেকে তখন টস্ টস্ করে ঝরে পড়ছে জল। আমি পুনরায় বললাম, 'বলো রানীদি—তুমি আমায় কথা দেবে।'

অঝোর ধারায় কাঁদতে কাঁদতে কি এক যন্ত্রণায় ভেঙে পড়ে বললেন, 'বল্—কি কথা তুই বলবি, বল বিজন। আজ পৃথিবীতে আমার কাউকে কোন কিছু দেওয়ার নেই—যদি পারি তোকেই তা আমি দিয়ে যাবো!'

'আমাকে তোমায় কথা দিতে হবে—কথা দিতে হবে এই যে, বলো তুমি আর কখনো মদ খাবে না?'

'না না না বিজন, ও কথা আমার কাছ থেকে তুই আদায় করতে চাস্ নি!'

'কেন—কেন তুমি এই কথাটুকু আমায় দিতে পারবে না?'

জীবনের সব সম্পদ যেন খোয়া যাবে, এমনিভাবে রানীদি আমাকে বললেন, 'ওরে, এইটুকু আছে বলে আজও আমি ঠিকভাবে আমার পথে আছি। এ গেলে আমার সব যাবে।'

এ এক অদ্ভুত কথা। রানীদি ভদ্রঘরের শিক্ষিতা মেয়ে। বিবাহিতা তিনি—বেদনার মধ্যে স্বামী তাঁর চরিত্রহীন লম্পট। জীবনের কাব্যে

তিনি চির-উপেক্ষিতা। কিন্তু তাই বলে মদ না খেলে তাঁর চলবে না, তাঁর জীবনের সব কিছু চলে যাবে—এ কোন্ ধরনের কথা? আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। রানীদি যেন ভিখারিণীর মত আমার দিকে চোখ দুটো তুলে বললেন, 'বিজন, তুই আমায় এ অনুরোধ করিস নি ভাই!'

'কিন্তু কেন সে কথা তোমায় বলতে হবে আমাকে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সব বলব তোকে। তবে আজ আর নয়। আজ তুই আমাকে একটু একা থাকতে দে।'

এও আরেক আশ্চর্য। এতক্ষণ আমিই যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলাম এবং বার বার যেতেও চেয়েছিলাম এবং আমাকে এতক্ষণ যে লোক যেতে দেয় নি, সেই লোকই এখন বলছে, আমাকে একটু একা থাকতে দে। এমনিই হয়তো মানুষের হয়। অন্যের জিদকে পরাস্ত করে নিজের জিদকে অপরের ওপর খাটানোতে মানুষ বোধ-করি বরাবরই বেশি উৎসাহী। আমি মেনে নিলাম রানীদির কথা। এখানে আসা অবধি প্রতিটি মুহূর্ত আমার কেটেছে অসহ্য উত্তেজনার মধ্যে। মনোজগতের আঁকা-বাঁকা দুর্গম পথের যাত্রী হিসাবে চলতে চলতে আমি যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তবু এখনও আমার অনেক কর্তব্য বাকি। শঙ্করের মা ক্লোরোফর্মে অজ্ঞান হয়ে যান জগদীশের হাতে। ওস্তাদ তাঁকে পৌঁছে দিয়ে আসতে বলেছিল—তারপর তাঁর কি হয়েছে না হয়েছে, আমার আর কিছুই জানা নেই। মায়া রাতে বার বার এখানে আসতে নিষেধ করেছিল, পুত্রস্নেহে অন্ধ মা কিছুতেই মেয়ের কথা শোনেন নি। অথচ আসতেই তাঁর বিপদ ঘটে গেল। শুধু কি তাঁরই বিপদ? বিপদ তো আমারও ঘটেছিল। যদি পাইপ-গানের একটি গুলী এসে আমাকে লাগত, তা হলে চিরদিনের মত পৃথিবী থেকে আমাকে বিদায় নিতে হত। এই অভিশপ্ত জগতের গোলকধাঁধার রহস্য ভেদ করে সে খবরটুকুও বোধহয় কোনদিন

বাইরে কেউ জানতে পারত না। তা ছাড়া? তা ছাড়া রানীদিকেও নিয়ে যা ঘটল সেও যে কি, তা বোঝা যাক বা না যাক, কিন্তু তা যে হৃদয়বিদারক, সে কথা বোধকরি না বললেও চলবে। ইতিপূর্বে রাগ ও অভিমানের বশে আমি চলে আসতে চেয়েছিলাম, রানীদি আসতে দেন নি—এখন আমার রাগ বা অভিমান পড়ে এসেছে, সহজভাবেই যেন চলে আসব ভাবছিলাম। কিন্তু রানীদির হঠাৎ 'আমাকে একটু একা থাকতে দে' বলায় আমি যেন কেমন একটু সংকুচিত হয়ে পড়লাম। তবে দেখলাম তাঁর কথার মধ্যে রয়েছে ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি অর্থাৎ তিনি আমায় সব কিছু বলবেন, তাই তাকেই সম্বল করে বেরিয়ে পড়লাম।

আবার সেই সিঁড়ি দিয়ে নামা, আবার সেই বারান্দায় সারি সারি বিছানায় চোখবাঁধা শিশুর দল, সেই অপারেশন থিয়েটার, সেই এ্যাপ্রন আর মাস্কপরা ডাক্তার আর নার্স। আমি এ-সবকে ফেলে রেখে পথে এসে নামলাম। কিন্তু আবার সেই হেঁড়ে গলায় চিৎকার। 'টুনটুনি, জবাকুসুমটা নিয়ে আয় তো!'

আমি সচকিত হয়ে উঠলাম। লোকটা বোধহয় আমার পদশব্দে আন্দাজ করতে পেরেছে। টুনটুনি জবাকুসুম আনলেই আমায় ক্লোরোফর্ম করবে জগদীশ। তাই আমি বলে উঠলাম, 'জগদীশ আমি'—

জগদীশ তেড়ে বেরিয়ে এসে বললে, 'আমি—আমি কোন্ শালা?'

তারপর টর্চের আলোয় সে আমাকে চিনতে পেরে বললে, 'ও আপনি—আমি মনে করেছিলুম অন্য কেউ। যাক্ কিছু মনে করবেন না, আপনি যান।'

কিছুটা গিয়েছি কি না গিয়েছি—হঠাৎ ফিসফিস করে কাদের কণ্ঠস্বর শুনলাম যেন। আমি মাটির দিকে নিচু করে টর্চ ফেলতে ফেলতে এগিয়ে চলতে লাগলাম। খানিকটা আসতেই আমি আক্রান্ত হয়ে পড়লাম। আক্রান্ত অর্থে কেউ আমাকে কোন মারধোর করল

না—চক্ষের নিমেষে কয়েকজন লোক আমাকে ধরে চোখ বেঁধে ফেলল। তারপর আমাকে ধরে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

একজন বললে, 'ব্যাটা নিশ্চয়ই সি-আই-ডি।'

আরেকজন বললে, 'তা না হলে ঠিক এই সময়ে আসবে কেন?'

আর সব কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কেউ বললে, 'দে শালাকে কম্বল ধোলাই।' কেউ বললে, 'আগে শালাকে জেরা কর। তারপর যদি কিছু বেরোয়—তবে একেবারে দে লাস করে।'

প্রথম যে লোকটা বলেছিল, 'ব্যাটা নিশ্চয়ই সি-আই ডি', বোধহয় সে-ই বলে উঠল, 'নিয়ে চ-ত বসন্তর কাছে। তারপর যা করবার তা করা যাবে।'

আমি খানিকটা যেন আশ্বস্ত হলাম। প্রথমত সেখানে শঙ্কর আছে নিশ্চয়ই। অবশ্য শঙ্করের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, কিন্তু তা হলেও সব কথা খুলে বলার আমি সুযোগ পাবো। দ্বিতীয়তঃ কিছুক্ষণ আগে ওস্তাদ নিজে গেছে বসন্তর ওখানে। সে নিশ্চয়ই আমায় চিনতে পারবে—তা ছাড়া সে নিজেই দেখেছে আমি রানীদির প্রিয়পাত্র। সুতরাং ভয় আমার কিছু নেই। এমন কথা আমার মনে হল হয়তো লোকগুলোই উল্টে তিরস্কৃত হবে।

আমি বেশ নির্ভয়েই ওদের সঙ্গে চলতে লাগলাম। একটু পরেই একটা বাড়িতে এসে হাজির হলাম। সেখানে একটা ঘরে এনে আমার চোখ খুলে দেয়া হল। প্রশস্ত একখানা আলো-ঝলমল করা ঘর। দেখলাম মেঝেয় শুভ্র জাজিম পাতা। সেখানে বসে রয়েছে ওস্তাদ—ওস্তাদের পাশে প্রায় আমারই সমবয়সী এক যুবক। মায়ার সঙ্গে তার মুখের বেশ একটা মিল ছিল। ভানুও দেখলাম, বসে রয়েছে একদিকে। কাজেই এখানে আমার অপরিচয়ের দুর্ভোগ ভুগতে হবে না।

আমাকে যারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে থেকে যে

লোকটা বলেছিল ব্যাটা নিশ্চয়ই সি-আই-ডি, সেই লেকটা বলে উঠল, 'ছ্যাখো ওস্তাদ—'

ওস্তাদ বললে, 'এ কাকে ধরে এনিচিস,—'

'অন্ধকারে শালা আড়ি পেতে ঘুরছিলো।'

ওস্তাদ বললে, 'ভাগ শালা—'

ভানু বলে উঠল, 'এ যে আমার দাদামণি!'

ওস্তাদ বললে, 'তুই চিনিস্ ভানু?'

'চিনি বৈকি। তুমি চেন না ওস্তাদ?'

'হ্যাঁ।'

ভানু বললে, 'এ শালারা কাকে ধরে আনতে কাকে এনেছে। দে শালারা ছেড়ে দে—'

ইতিমধ্যে সেই লোকটা কপালে যার রামধনুর মত অর্ধ-বৃত্তাকার কাটা দাগ, চোখগুলো ভাঁটার মত গোল গোল আর জবাফুলের মত লাল—সেই লোকটা, সেই বসন্ত, এসে পড়ে বললে, 'কি হয়েছে—কি হয়েছে?'

কি হয়েছে আমাকে যারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল তারা তার বর্ণনা দিতে লাগল। আমি কিন্তু ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে চোখ বুলিয়ে নিয়ে যা দেখলাম তা এক অদ্ভুত ব্যাপার। মারোয়াড়ীর পাগড়ি, ফেজ আর গান্ধীটুপি—সকলেরই এক ধর্মনিরপেক্ষ সমাবেশ হয়েছে সেখানে। আর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকার তোড়া, সোনা আর হীরে জহরতের পুঁটলি জমা নেওয়া হচ্ছে আগন্তুকদের কাছ থেকে।

ভানু তাদের একজনকে বললে, 'কিবে শালা কালোয়ার—ক'টা ওয়াগন আজ ভাঙলি?'

'আজ আর সুবিধে হয় নি?'

'ভাঙা কড়াও পাস নি একটা?'

'না।'

বসন্ত এসে আমাকে কি বলবে না বলবে তার আগেই ওস্তাদ বললে, 'সাধুজীকে আগে ছেড়ে দাও।'

হ্যাঁ, সেই ছাড়া পেয়েই আমি আবার এসে পড়লাম মায়াদের বাড়িতে। মায়ের তখন সংজ্ঞা ফিরে এসেছে। এরপর তাঁর সঙ্গে কি কথা হয়েছিল তা আমি আগেই বলেছি। তবু সব কথা ছাপিয়ে সেদিন রানীদির কথাই বারে বারে আমার মনে পড়েছে আর বাকি রাতটুকুও আমি ঘুমোতে পারি নি—কেবলই হাতড়ে হাতড়ে মানুষের জীবনের আসল দুঃখ অথবা সুখ কোথায়, তা খুঁজতে চেষ্টা করেছি।

কিন্তু মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের উৎস খুঁজে পাওয়াটা বোধ করি খুব সহজ নয়। ভোরের অন্ধকারে আমার কম্বল শয্যায় শুয়ে আমি এই কথাটাই ভাবছিলাম। মায়া বুঝতে পেরেছিল, রাত-ভোর গোলমালের মধ্যে থেকে ফিরে এলেও, ক্লান্তিজনিত অবসাদের জন্য আমি ঘুমোতে পারি নি। তাই সে তার পুরনো কথাটার জের টেনে আমাকে বললে, 'কতবার আমি বারণ করেছিলুম বলুন তো! মা যদি শুনত তাহলে মায়েরও অমন বিপদ হত না, আর আপনিও অমন করে ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে পড়তেন না।'

গম্ভীরভাবে আমি তার কথায় সায় দিলাম, 'হুঁ।'

মা বললেন, 'আমি কি অতশত জানতুম!'

'জানতে না বলেই তো আমি তোমায় বলেছিলুম', মায়া বললে। মা বললেন, 'তোর কথাটা হয়ত শুনলেই তখন আমি ভাল করতুম। কিন্তু তুই আর কতটুকু ওখানকার ব্যাপার জানিস—সে কথা ভেবেই তোর কথাগুলো আমি গেরাহ্যি করি নি।'

'কিন্তু আমি যে সবই জানি!'

'কি করে জানলি তুই?'

বাস্তবিক আমারও মনে সেই প্রশ্ন—মায়া কি করে জানল ওখানকার কথা! আমার মনে যে প্রশ্নটা উঠতে পারে এটা আন্দাজ করে নিয়েই সে বললে, 'ভানুদার কাছ থেকে যে আমি প্রায়ই

এসব কথা শুনতুম। পাছে কোনদিন আমি রাতে ওদিকে গিয়ে পড়ি সেই ভয়ে ভানুদা আমাকে রোজই সাবধান করে দিত।'

এবার আর মা নয় আমিই জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভানু কি তোমাকে এই সব কথা বলে সাবধান করে দিত?'

'হ্যাঁ,' বলে মায়া যে সব বর্ণনা দিতে লাগল তা প্রায় মিলে গেল। সারারাত এই অভিশপ্ত জগতে ওস্তাদের গোয়েন্দারা ঘোরে টুনটুনি আর জগদীশ থাকে মোড় আগলিয়ে, তারপর যথাযথ ব্যবস্থা করতে তাদের কোন দেরি হয় না। মাকে যে ওরা ক্লোরোফর্ম করেছিল চিনতে না পেরে কিংবা দুষমন ভেবে তা নয়—ওটা ওখানকার নিয়ম। আগে নিরাপত্তার ব্যবস্থাকে হাসিল করে নাও, তারপর অন্য ব্যবস্থা। সম্ভবত, সম্ভবত কেন, নিশ্চয়ই আমাকেও ওরা এইভাবে ক্লোরোফর্ম করত। তারপর কি হত তা কল্পনা করতেও শিউরে উঠতে হয়। তখন আমার না বেরুত রানীদির সঙ্গে পরিচয় অথবা আমার ব্যাপার রানীদিরও থেকে যেত অজানা। কে জানে, হয়তো আমাকে পিটিয়ে লাসই করে দিতো ওরা।

এইসব সাত-পাঁচ কথা হতে হতে হঠাৎ এক সময়ে মেনকার গলা পাওয়া গেল। সে ডাকছিল পাঁচির মাকে। পাঁচির মা'র মেজাজটা বোধ করি ভালই ছিল। সে বললে, 'আয়—'

ছেলেটাও ডেকে উঠল, 'মাতি—'

মেনকা বললে, 'কই—আমার বাবা কই রে?'

'এই যে,' মশারির ভেতর থেকে বোধ করি খোকাটা বলে উঠল।

আজ আর কোন গোলমাল হল না ছেলেকে নিয়ে। মা বললেন, 'ওরে একেবারে সকাল হয়ে গেছে।'

মায়া বললে, 'উঠে পড়ো তবে।'

ওরা উঠে পড়ল। আমার যেন আর কম্বল ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করল না। আমি পড়ে রইলাম। মায়া বললে, 'দাদা, আপনি বরং

থাকুন—একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন। রাতে ধকল তো কম যায় নি।'

আমি কোন উত্তর দিলাম না। চুপ করে পড়ে রইলাম।

কিন্তু চুপ করে পড়ে থাকতে গিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল যখন একেবারে চারিদিকে কড়া রোদ ফুটে উঠেছে। দেখলাম গলার নিচে আমার ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। চোখ দুটো জ্বালা করছে অপরিমিত ঘুমে। ভাল করে চোখ চাইতে দেখলাম সেই গত রাতে যাকে ওস্তাদের পাশে বসে থাকতে দেখেছিলাম, সেই যাকে মায়ার মুখের মত আদল দেখে ধরে নিয়েছিলাম শঙ্কর বলে—সে-ই বসে রয়েছে ঘরের মধ্যে ঘাড় নিচু করে আর মাথায় হাত দিয়ে। পাশেই বসে মা। দেখে মনে হল যেন মাতৃস্নেহে অভিষিক্ত কোন এক অনুতপ্ত সন্তান তার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করার প্রতীক্ষায় বসে রয়েছে। অদ্ভুত হাড়ে-মাসে শক্তসামর্থ্য চেহারা শঙ্করের। চুলগুলো ওল্টানো। প্রশস্ত ললাট, টানা টানা চোখ। শক্ত চিবুক আর চওড়া বুক। এমন পৌরুষদৃপ্ত চেহারা যে মানুষের, সে মানুষ এমন স্বভাব-কয়েদী হল কি করে?

মা বলছিলেন, 'তোর কি একটুও মনে পড়ল নারে এই দুঃখিনী মায়ের কথা?'

শঙ্কর নিরুত্তর।

মা আবার বলতে লাগলেন, 'তোর জন্যে হন্যে হয়ে সেই রাতে ছুটলুম কিন্তু কি পেলুম বদলে—'

'আমি শুনেছি,' শঙ্কর বললে 'তবে তোমার ওখানে না যাওয়াই উচিত ছিল।'

'কিন্তু আমি কি করব বলতে পারিস', মা বললেন, 'তুই যদি আসতিস তাহলে তো আমাকে যেতে হত না। আর গিয়ে আমাকে এভাবে পেহারও ভোগ করতে হত না।'

শঙ্কর বলে উঠল, 'কিন্তু থাক ওসব কথা—তোমরা এখানে

আমাকে বেশি দেরি করিও না। শালারা টের পেলে এখুনি আমাকে আবার টেনে নিয়ে যাবে।'

'এখন তো সেই ভয়ই আমার সবচেয়ে বড় ভয় হয়,' মা বলতে লাগলেন, 'এতদিন জেলে ছিলিস সে ছিল এক জ্বালা। এখন বাইরে এসিছিস, কখন ধরা পড়বি, কখন কি হবে না হবে—সে আবার আমার আরেক জ্বালা।'

'যাক্, ওকথা ছাড় মা,' শঙ্কর বলতে লাগল. 'কি খেতে দেবে দাও—আমি আর থাকতে পারব না।'

মা ডাকলেন, 'মায়া!'

মায়া দাওয়ায় তোলা উনুনে খাবার তৈরি করছিল। সে বললে, 'আরেকটু মা।'

এবার শঙ্কর দাঁড়িয়ে উঠে বললে. 'তা সবি তো দেখছি বেশ তোমাদের বাড়িতে—কিন্তু সাধুটিকে আমদানী করলে কোত্থেকে?'

মা কিছু বলবার আগেই আমি বলে উঠলাম, 'আমাকে ভাই মা আমদানী করেন নি, আমি নিজেই আমদানী হয়েছি।'

'বাড়ি কোথায়?'

'সাধুর কি বাড়ি থাকে?'

'কিন্তু আপনাকে দেখে তো সাধু বলে মনে হয় না।'

'তবে আমি চোরও নই।'

'কিন্তু চোর নয় কোন্ শালা', এবার শঙ্কর নিজমূর্তি ধরে বললে, 'সব শালা চোর। দেশের রাজা থেকে চৌকিদার পর্যন্ত সব শালাকেই আমি দেখলুম।'

'কিন্তু ভাই শঙ্কর, যারা রাজাও নয় চৌকিদারও নয় তারা চোর হতে যাবে কেন?'

'হ্যাঁ তারা সুযোগ পায় নি তাই চোর হয় নি। তা নাহলে—'

'অবশ্য কথাটা তোমার ঠিকই। সুযোগ পেলে তারাও হয়ত

তাই হোতো। আমার সম্বন্ধে তুমি সেই রকম একটা কিছু নিশ্চয়ই মনে করতে পার।'

'আপনি আমাদের বাড়ি এলেন কি করে?'

ঘটনাটা আমি বললাম। শঙ্কর বললে, 'সেই থেকেই তাহলে এখানে আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'খাওয়া-দাওয়া করেন কোথায়?'

'এখানেই।'

'খরচ দেয় কে?'

'আমিই খরচ করি।'

'তা একরকম ভাল,' শঙ্কর বললে. 'কিন্তু টাকা পান কোত্থেকে?'

'আমার নিজের টাকা আছে।'

'নিজের টাকা?'

'হ্যাঁ নিজের রোজগার করা টাকা।'

'সাধু মানুষ আপনি রোজগার করেন কি করে?'

'রোজগার এখন করি না—আগে করতাম।'

'অর্থাৎ সাধু হবার আগে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে টাকা সঙ্গে নিয়ে ঘোরেন।'

'তা ছাড়া আর কি করব?'

'এখানে টাকা সঙ্গে নিয়ে বাস করতে ভয় করে না?'

'ভয় করবে কেন?'

'এরা যদি আপনাকে টাকার লোভে খুন করে?'

'এরা মানে কারা?'

'মানে আমাদের দলের লোকেরা।'

'তোমাদের দলের লোকেরা আমার এই সামান্য টাকায় লোভ করবে কেন ভাই,' আমি বললাম, 'তোমাদের লোকেরা বড় বড়

ব্যাপারে আছে, তারা এই ছোট ব্যাপারে মাথা ঘামাতে আসবে কেন ?'

আমার কথায় বোধ করি শঙ্কর কেমন যেন একটু ঠোক্কর খেলে বলে মনে হল। পরে আমি শুনেছিলাম তার এই ঠোক্কর খাবার কারণ। আমারই মত সামান্য একজন মানুষের কাছে ছিল যৎ-সামান্য কিছু টাকা, কিন্তু ভুল করে তার কাছে অনেক টাকা আছে ভেবে তাকে খুন করতে গিয়ে শঙ্কর পড়েছিল বিপদে এবং সেই অভিযোগেই তার কারাদণ্ড হয়েছিল দশ বছরের। আমার এই সামান্য টাকাতেও যে আমি খুন হওয়ার মত বিপদে পড়তে পারি, সে কথা তার চেয়ে আর বেশি কে জানবে—তাই বোধ হয় সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে আমাকে প্রশ্ন করে বসল। তার এই একটি কথায় আমি বুঝতে পারলাম, তার চোখে তার দল কিরকম আর তার সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলে টাকা নিয়ে বসবাস করার সময়ে আমিই বা কিরকম অসমসাহসী। অর্থাৎ আমি বুঝলাম, শঙ্করের মনে কোথাও আমার সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই কিছু স্বীকৃতি সৃষ্টি হয়েছে।

এরপর সে আমাকে প্রশ্ন করে বসল, 'আপনি কি এখন এখানেই থাকবেন ?'

'থাকতে আমি আসি নি ভাই,' বললাম, 'এমনিই পথে একটা লোকের সঙ্গে পরিচয় হল তারি সঙ্গে এসে পড়লাম। জানি না কতদিন থাকব, আর কবেই বা চলে যাব।'

'মায়াকে আপনি বোন বলেই মেনে নিয়েছেন ?'

'তোমার কি মনে হয় ?'

'মনে আর কি হবে', শঙ্কর বলল, 'আমি তো বিশেষ কিছুই জানি না আপনার সম্বন্ধে।'

এবার আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'আমি কিন্তু তোমার সম্বন্ধে সব কথাই জানি প্রায়।'

শঙ্কর রীতিমত ওয়াকিবহালের মত বললে, 'সে আর এমন

কথা কি—মা কিংবা মায়ার কাছে আপনি সবই জানতে পারবেন।'

বললাম, 'শুধু মা আর মায়া কেন—ভানুর কাছেও শুনিচি।'

'তাই নাকি—' ভানুর সঙ্গে তা হলে আপনার বেশ জানাজানি হয়েছে!'

'হ্যাঁ।'

'তবে তো সবই জানবেন আপনি।'

ইতিমধ্যে মায়া খাবার তৈরি করে এনে দাদার সামনে একটা ডিসে করে রাখল। তারপর আমাকে বললে, 'দাদা আপনি মুখহাত ধুয়ে আসুন না—আপনাকেও অমনি খেতে দিই কিছু।'

মায়াকে বললাম, 'যা করছ করো—আমার জন্যে এখন তোমাকে ভাবতে হবে না।' তারপর আমি উঠে পড়লাম।

মায়ের সেই চিরন্তন মূর্তি—সন্তানকে সস্নেহে খাওয়ানো। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে তিনি বললেন, কতদিন পরে আবার তুই আমার সামনে খেতে বসিছিস্ বাবা!' তারপর অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'এই ছিল আমার স্বপ্ন—কিন্তু কোথা দিয়ে যে আমার কি হয়ে গেল। সবই আমার ভাগ্যরে····· নে বাবা সবটুকু খা, খেয়ে নে।'

অপাংগে একবার মা ও ছেলের দিকে তাকিয়ে আমি বাইরে বেরিয়ে গেলাম।

বাইরে আসতেই দেখি মাধু আর তার বাহনেরা। মাধুকে রাতে একরকম দেখেছিলাম—কিন্তু এখন দেখলাম সম্পূর্ণ অন্য মূর্তিতে। সদ্যস্নাতা মাধু, চুলগুলো এলোকরা। সেই চুলেরই পাশ দিয়ে আঁচলের কাপড়টা উঠে গেছে মাথায়। কপালে তার সিঁদুরের টিপ—জ্বল্ জ্বল্ করছে যেন প্রভাতসূর্যের মত। আমি তার দিকে তাকাতেই স্মিতহাস্যে সে আমাকে যেন তার অন্তরের শ্রদ্ধা

নিবেদন করল। সত্যিই মাধুকে অদ্ভুত সুন্দর দেখিয়েছে। বিগত রজনীর ক্লান্তি নেই তার মুখে-চোখে, নেই কোন গ্লানি অথবা কোন ব্যথা ও বেদনার ছায়া। জীবনে যেন তার সব পাওয়ার পরিপূর্ণতা ভাদ্রের ভরা গঙ্গার মত কলকল-ছলছল গভীর প্রশান্তিতে ভরা। আমি কিছু বলার আগেই সে গলায় আঁচল জড়িয়ে আমাকে প্রণাম করতে এল।

'ওকি—ওকি মাধু,' আমি একটু পিছিয়ে আসতে গেলাম কিন্তু ততক্ষণে মাধু আমার পা-দুটো ছুঁয়ে ফেলেছে। তারপর আমার পা-ছোঁয়া হাতখানা মাথায় ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'আপনাকে কি শুভক্ষণে আমি দেখেছিলুম জানি না—তারপরই ও ফিরে এসেছে। আপনি আশীর্বাদ করুন ওর যেন কোন বিপদ-আপদ না হয়।'

গত রাত্রিতে মদের ঝোঁকে মাধু বলেছিল তিন বছর সে অপেক্ষা করে থেকেছে শঙ্করের জন্যে। সে কথায় তখন আমি তেমন গুরুত্ব আরোপ করিনি কিন্তু এখন দেখছি তার সে-কথা কতখানি সত্যি তার কোন তুলনা নেই। এরা এখানে এই অভিশপ্ত জগতের বাসিন্দা, এখানে সমাজ নেই সংসার নেই, এখানে নেই কোন নিয়ম-কানুন, নেই ভদ্র আচার-বিচার—উঞ্ছবৃত্তি আর অসামাজিক কার্য-কলাপের মধ্যে জীবনধারা এদের গণ্ডিবদ্ধ। তবু যখন তার মাঝে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত এইসব নরনারী যুবক-যুবতীর সন্ধান পাচ্ছি তখন চমকে উঠছি। সর্বপ্রথমে দেখেছি মায়াকে, দেখেছি ভানু আর মণ্টুকে তারপর দেখেছি মেনকাকে, এখন দেখছি মাধুকে। রানীদির কথা আমি নাই বা বললাম। রানীদি অনন্ত রহস্যময়ী, ছাইচাপা আগুন, দাহিকা শক্তিও যেমন আছে তাঁর, তেমনি মমতাময়ী প্রশান্তির পরিপূর্ণ প্রতীকও তিনি—তাই এ অভিশপ্ত জগতের কোথায় যেন একটা দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করছি আমি। সেই আকর্ষণে বিস্মিত আমি মাধুকে বললাম,

'আমার কথা যদি ফলে মাধু তা হলে আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি।'

মাধু ঘাড় নিচু করে শান্ত মেয়েটির মত দাঁড়িয়ে রইল।

আমি বললাম, 'যাও ভেতরে যাও। কথাটা বলেই কিন্তু মনটা আমার যেন খচ্ করে উঠল। গত রাত্রিতে মা তো তাকে ভাল-ভাবে গ্রহণ করেন নি, মাধুর দাবির সঙ্গে তাঁর দাবির প্রতিযোগিতা করতে চেয়েছিলেন তিনি। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে মাধুকে কেমন যেন তিরস্কার করেছিলেন। যদি তিনি সেইভাবেই তার সঙ্গে ব্যবহার করেন! মনে আমার যেন ভয় হল। একদিকে মাধুর প্রতি আমার সমবেদনা, অন্যদিকে মায়ের প্রতি আমার উঁচু ধারণা, দু'দিকটাতেই তা হলে গোলমাল হয়ে যাবে। তাই মাধু ঘরে ঢুকতেই আমি বাইরে দাওয়া থেকে সরে গেলাম না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। মা যেন তাকে বিরূপ অভ্যর্থনা না করেন।

আশ্চর্য! মা দেখলাম কোন বিরূপ অভ্যর্থনা করার বদলে 'আয়' বলে সস্নেহে তাকে অভ্যর্থনা করলেন। ওঃ! আমি যেন বাঁচলাম। সত্যিই স্নেহময়ী মা। এইভাবেই মায়েরা হয়তো ছেলেমেয়েদের ভালবাসার ধনকে স্বাগত জানান। দাওয়া থেকে নামতে যাচ্ছি হঠাৎ দেখি মন্টুর আবির্ভাব।

স্মিতহাস্যে মন্ট বললে, 'মামাবাবু, আপনি কি এখনও তৈরি হন নি?'

'তৈরি! তৈরি কিসের?'

'বাঃ রে এরি মধ্যে ভুলে গেছেন! মাসী যে আপনাকে—'

'ও হো হো', আমি বললাম, 'আজ খেতে বলেছেন তো—'

'হ্যাঁ।'

'তা এরি মধ্যে?'

'এরি মধ্যে কি, বেলা হয় নি?'

'কিন্তু আমি যে এখনও মুখ পর্যন্ত ধুই নি।'

'বলেন কি?'

'সারারাত না ঘুমিয়ে শেষদিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম,' কথাটা বলেই কেমন ভয় হল আমার। যদি মণ্টু জিজ্ঞাসা করে কেন সারারাত ঘুমোন নি আপনি, কি করেছিলেন কিংবা কোথায় গিয়েছিলেন—তা হলে তাকে আমি কি উত্তর দেবো। বিগত রজনীর স্মৃতি যে আমার কাছে কি ভয়ানক পীড়াদায়ক তা আমি ছাড়া আর কে বুঝবে? তবু সেই মর্মপীড়াকে চেপে রেখে আমাকে রানীদির 'খেতে বলা'র আমন্ত্রণ রক্ষা করতেই হবে। উঃ কি যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির মধ্যেই না আমি পড়েছি! মণ্টুকে বললাম, 'আচ্ছা মণ্টু দাঁড়াও একটু আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।'

তারপর দেখলাম, শঙ্কর ঘর থেকে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল। মাধুও দ্রুত তার পিছন পিছন প্রায় ছুটতে লাগল। ব্যাপারটা কি হল কিছুই বুঝতে পারলাম না।

মণ্টুকে বললাম বটে, দাঁড়াও, একটু তৈরি হয়ে নিচ্ছি, কিন্তু তৈরি হতে আমার বেশ রীতিমত সময় লাগল। বস্তির ভেতরে সেই ছোটখাটো শ্যাওলাপড়া মাঠ, মাঠের দক্ষিণে সেই টিউবওয়েল, যার চারিপাশটা কর্দমাক্ত, একপাশে ছাইয়ের গাদা, ছেঁড়া কলাপাতা আর ভাঙা ভাঁড়ের স্তূপীকৃত অস্তিত্ব, যেখানে বাসনমাজা থেকে মোষ নাওয়ানো পর্যন্ত সব কিছুই হয়, যেখানে দাঁতনের ছিবড়ে, গয়েরসিকনি কিছুরই অভাব নেই—সেইখানে বালতি হাতে এলাম চান করতে।

মায়া পিছন পিছন এল আমার যাতে না কষ্ট হয় সেজন্যে। হাতে তার একখানা পিঁড়ি। পিঁড়িখানা কলতলায় পেতে দিয়ে সে বললে, 'আমি হাতলটা টানছি, আপনি বসে বসে চান করুন ভাল করে।'

বললাম 'আমি নিজেই তো পারতাম মায়া পাম্প করে জল তুলতে।'

মায়া বললে, 'তাতে কি হয়েছে?'

চান করতে করতে রানীদির ওখানে যাবার কথাটা ভাবছিলাম। মণ্টু অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল রানীদি শুধু তো আমাকেই খেতে বলেন নি, মায়াকেও বলেছিলেন। আমি বললাম তাকে, রানীদির ওখানে যাবে না মায়া?'

'নেমন্তন্ন খেতে?'

'হ্যাঁ। রানীদি তো আমার সঙ্গে তোমাকেও যেতে বলেছিলেন?'

'তা বলেছিলেন!'

'তবে?'

'দেখি মাকে জিজ্ঞেস করে।'

রানীদির ওখানে মায়াকে নিয়ে যাবার জন্যে আমি যেন কেমন বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম। গতকাল রাতে যে পরিস্থিতির মধ্যে রানীদি ও আমার দেখা হয়েছিল, সেই পরিস্থিতির পর আজ যেন তাঁর সামনে আমার একলা যাবার কোন আগ্রহ নেই। যখনই রানীদির ওখানে যাব তখনই তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হবে। চোখোচোখিও হবে। মনে পড়ে যাবে বিগত রাত্রির সেই সুরাপায়ী নর্তকীরূপিনী রানীদির কথা, তাঁর অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার কথা, অদ্ভুত নাটকীয় সংলাপ আর ঘাত-প্রতিঘাতের কথা। তাঁর দিকে ভাল করে তাকাতেও বোধ হয় সংকোচ হবে আমার। আর রানীদি—রানীদিরও কি মনে পড়ে যাবে না সে সব কথা? তাঁরও মনে কি হবে না কোন সংকোচ, দ্বিধা কিংবা কোন লজ্জা? নিজেকে নিজে ধিক্কার দিয়ে উঠবে না কি তাঁর মনটা? সেই অবস্থায় তিনিই বা আমাকে সহ্য করবেন কি করে? তাই এই অস্বাভাবিক আর অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে তৃতীয় একজন কেউ থাকলে বোধ করি ব্যাপারটা কিছুটা সহজ হতে পারবে এবং সেই ভেবেই আমি মায়ার যাওয়াটা যে একান্ত অপরি-

হার্য, তা উপলব্ধি করেছিলাম। আর তারই জন্য তাকে রানীদির কথাটা মনে করিয়েও দিলাম। কিন্তু সে মাকে জিজ্ঞাসা করার কথা বলাতে আমি যেন বেশ খুশি হতে পারলাম না তার ওপরে।

তাই চান করে ফিরতেই আমি কথাটা পেড়ে বসলাম মায়ের কাছে। মা বললেন, যখন ওকে যেতে বলেছে তখন ও যাবে না কেন? যাক না—"

মায়া খুশি হয়ে বললে, 'আমি তো যাব না বলি নি।'

'তাহলে তৈরি হয়ে নাও' বলে আমিও আমার গেরুয়া পরে তৈরি হয়ে নিলাম। মন্টু এতক্ষণ ঘরের মেঝেয় বসেছিল, আমরা তৈরি হয়ে নিতেই সে আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

আবার সেই পথ। পথে কয়েক পা আসতেই যে দৃশ্য দেখলাম, তাতে যার পর-নাই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মাধু তার দরজার সামনে রণ-রঙ্গিণী মূর্তি ত একখানা ঝাঁটা হাতে চিৎকার করে বলছে, 'মুখপোড়ারা তোমরা এখানে আসামী খুঁজতে এসেছো—না মেয়েমানুষ খুঁজতে এসেছো। ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দোব না আমি—'

সামনে দু'-তিনজন লোক। দু'জন ইউনিফর্ম পরা। একজন স্যুট পরিহিত। শেষোক্ত লোকটি বললেন, 'তুমি চেঁচালে কি হবে? আমি জেলের বড় সাহেব, যাকে বলে সুপার—সেই সুপার আমি। বহু কয়েদীকে আমি জেল থেকে পালিয়ে যেতে দেখেছি—পালিয়ে এসে তারা তাদের মেয়েমানুষের ঘরে এসেই ওঠে। তুমি ভালয় ভালয় ঘরটা আমাদের দেখতে দাও—আমরা শুধু একবার দেখেই চলে যাবো।'

মাধু ঝাঁঝিয়ে উঠে বললে, 'যাকে খুঁজতে এসেছো—আমি কি তার মেয়েমানুষ?'

ইউনিফর্ম পরা লোক দু'জনের একজন বললে, 'তোমাকে তো মোলাকাৎ করতে যেতে দেখেছি শঙ্করের সঙ্গে।'

'তা দেখবে না কেন?'

'তবে?'

'তাহলেই কি আমি তার মেয়েমানুষ—মেয়েমানুষ কাকে বলে রে মুখপোড়ারা?'

ইউনিফর্ম পরিহিত অপর লোকটি বললে, 'তুমি তার মেয়েমানুষ নও?'

মাধু দৃঢ়তার সঙ্গে বললে, না'।

'তবে তুমি জেলখানায় তার সঙ্গে দেখা করতে যেতে কি জন্যে?'

মাধু আরও দৃঢ় কণ্ঠে বললে, 'আমি তার স্ত্রী বলে!'

জেল সুপার দেখলেন, মেয়েছেলে যদি কারো স্ত্রী হয়, তবে বাজারের ভাষা তার ওপর প্রয়োগ করলে সে চটবেই, কারণ সেখানে নারীর মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত। তাই তিনি কথার ধারা পরিবর্তন করে বললেন, 'আমাদের ভুল হয়ে গেছে মা—তুমি কিছু মনে কোরো না। শঙ্কর জেল থেকে পালিয়ে আসাতে আমরা খুব মুশকিলে পড়েছি। আমাদের চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে। সে যদি ফিরে যায় তাহলে আমরা বাঁচব, সেও বাঁচবে। আমি এজন্য তাকে বা তোমাকে কিছু পুরস্কারও দিতে রাজি আছি। তা' ছাড়া আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি মা, স্পেশাল রেমিশন দিয়ে আমি তাকে তাড়াতাড়ি খালাস করে দেবো। তুমি একটু দয়া করো মা!'

'জেলসুপার', 'স্পেশাল রেমিশন'—এসব কথা জেলে ইন্টারভিউ করতে গিয়ে মাধুর সম্ভবত জানা হয়ে গেছে। কারণ, দেখলাম কথাগুলো সে বেশ রীতিমত উপলব্ধি করল বলে মনে হল। এবং এও দেখলাম জেল সুপারের ব্যবহারে মাধু কেমন যেন খানিকটা শান্তও হয়ে এল। সে বললে, 'জেল থেকে যে সে পালিয়েছে, তা আমি কেমন করে জানব বলুন তো—কথাটা তো আমি এইমাত্র আপনাদের কাছ থেকেই শুনছি!'

সুপারসাহেব বললেন, 'ঠিক বলছ মা ?'

'আপনাকে আমি বেঠিক কথা বলতে যাব কেন, যখন ব্যাপারটাই আমি জানি না ?'

আমি আশ্চর্য হয়ে দেখতে লাগলাম মাধুকে। ভাবলাম ঠিক এই জন্যেই বোধ হয় শঙ্কর আর মাধু কিছু আগে মায়ের কাছ থেকে ছুটতে ছুটতে পালিয়ে এসেছিল। কেমন করে যে ওরা টের পেয়েছিল তা ওরাই জানে—আমরা অতোগুলো লোক কিন্তু এর বিন্দুবিসর্গও জানতে পারি নি। মায়ার দিকে আমার চোখ পড়ল। দেখলাম মুখখানা তার বর্ণহীন পাণ্ডুর হয়ে গেছে। দাদাকে ধরতে এসেছে, কি জানি তার ভাগ্যে কি ঘটবে, তাই ভয়ে সে যেন একেবারে কাঠ হয়ে গেছে। ভাগ্যিস্ এরা পুলিশ নয়, জেলের অফিসার, তাই রক্ষা—নইলে তার মুখ দেখে পুলিশ অনায়াসেই বুঝতে পারতো এ মেয়েটা নিশ্চয়ই সব জানে। কিন্তু সে যাই হোক আমার মনে এই কাথাটাই প্রসঙ্গক্রমে উঠে পড়ল. জেল-পলাতক আসামীকে ধরবার জন্য পুলিশ না এসে জেলের অফিসাররা এলেন কেন ? কথাটা জিজ্ঞাসা করব করব ভাবছিলাম. কিন্তু হঠাৎ এবার জেলসুপার বলে উঠলেন, 'তাহলে চলো অম্বিক শঙ্করের বাড়ির দিকে একবার যাই।'

'বাড়ির দিকে গিয়ে কি হবে স্যার ?'

'পাব না বলছ ?'

'আমার তো সেইরকমই মনে হয়।'

তাহলে পুলিশকে ইনফর্ম করা ছাড়া আমাদের আর উপায় নেই।'

'কিন্তু পুলিশকে তো জানেন স্যার !'

'তা জানি।'

এ কথার অর্থ কি ? মনে আমার জিজ্ঞাসার তরঙ্গ উঠল। কিন্তু সে জিজ্ঞাসার জবাবও পেয়ে গেলাম সুপার-সাহেবের কথায়। তিনি

বললেন, 'যতবার এস্কেপের খবর জানিয়েছি পুলিশকে ততবারই ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু যেই নিজেদের সূত্রে খোঁজ করেছি সেই আসামী ধরা পড়েছে।'

'স্যার ক্রিমিন্যাল গ্যাং-এর সঙ্গে ওদের সমঝোতা, লেনদেন—কাজেই কেন ওরা আপনার আমার কথা ভাববে?'

'হ্যাঁ আজকালকার যুগই হয়েছে এই রকম।'

সবই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। গত রাত্রে কি না দেখেছি আমি! রানীদির ডেরা থেকে বেরিয়ে পথে আসতেই ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমাকে। তারপর সেই বসন্তর আড্ডা। সেখানে মারোয়াড়ীর পাগড়ি, ফেজ আর গান্ধীটুপি, সবরকমের সমাবেশই দেখেছি আমি। আর দেখেছি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকার স্তূপ, সোনা হীরে জহরৎ প্রভৃতির লেনদেন, ওয়াগন ভাঙা কালোয়ারদের ভিড়। এসব দেখলে দেশে কোন শাসন আছে না পুলিশ আছে বলে মনে হয়? অথচ সবই আছে—দেশে শাসনও আছে, পুলিশও আছে। পুলিশ কি জানে না--অবাধে এই সব কারবার চলেছে? ইংরেজ আমলে দেখেছি কোথায় কোন্ বাড়িতে গোপন অস্ত্রশস্ত্র বা রাজনৈতিক পুস্তকাদি আছে তারা তার সন্ধান করতে পারতো, কংগ্রেস আমলেও দেখছি—কোথায় কোন্ কমিউনিস্ট নেতা আত্মগোপন করে আছে, তাকে ধরে আনছে—অথচ নাকের ওপর দিয়ে সভ্যজগতের আড়ালে আরেকটি অভিশপ্ত জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, সেখানকার কোন খবরই তারা রাখতে পারছে না, এ কথা কি বিশ্বাস করতে হবে? জেলসুপার আর তাঁর বিভাগীয় লোকদের এই কথাবার্তার মধ্য দিয়ে আরেকবার আমার সেই কথাই মনে পড়ে গেল।

জেলসুপার আর তাঁর দলবল এবার সম্ভবত মায়াদের বাড়ির দিকেই যাবেন বলে মনে হল। তা ছাড়া জেলসুপার বলেও ফেললেন, 'চলো অম্বিক—এসেছি যখন একবার দেখে যাই ওদের বাড়িটা।'

'কিন্তু বাড়ি কি চিনতে পারব আমরা?'

'মেয়েটাকেই জিজ্ঞেস্ করো না।'

অতঃপর অম্বিক মাধুকে জিজ্ঞাসা করতে গেল। সে বললে, 'বাছা তুমি যখন শঙ্করের স্ত্রী, তখন তার বাড়িটা নিশ্চয় তুমি চেন।

'এইটেই তো তার বাড়ি,' মাধু বললে।

অম্বিক বললে, 'কিন্তু তার মা-বোন সবাই কি এখানে থাকে?'

'তারা কোথায় থাকে তা আমি কি করে জানব?'

'সে কি কথা—তুমি তাদের বাড়ির বউ, আর তারা কোথায় থাকে তা তুমি খবর রাখ না?'

'এই হুনিয়ার কে কার খবর রাখে মশাই—বলে আপনি বাঁচলে বাবার নাম।'

আমি অবাক হয়ে গেলাম মাধুর অভিনয়ে। আশ্চর্য! এরা কিরকম দক্ষ অভিনেত্রী তা বোধ করি চোখে না দেখলে আমি কখনও বিশ্বাস করতে পারতাম না। লোকগুলো বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেল। মায়া বলে উঠল, 'উঃ বাঁচা গেল।

মাধু বললে, 'বাঁচা গেল বলে বাঁচা গেল!'

মায়া মাধুকে তারিফ করে বলে উঠল, 'তোর কি সাহস মাধুদি!'

'সাহস না দেখালে উপায় আছে' মাধু কেমন যেন বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে বলতে লাগল, ওরা আমার ঘরের মানুষকে দিনের পর দিন আটকে রেখে দেবে জেলখানায়, তাকে একটিবার আসতে দেবে না আমার কাছে, এ কি আমার কম যন্ত্রণা! ও না হয় অপরাধ করেছে, ওকে না হয় শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু আমি কি করেছিলুম যে আমাকেও তার সঙ্গে শাস্তি দেবে, দিনরাত, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে আমাকে তুঁষের আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেবে ওরা বলতে পারিস মায়া?'

অদ্ভুত কথা মাধুর।

আইনে অপরাধীদের শাস্তি বা সাজা দেবার অনেক ব্যবস্থাই আছে জানি. কিন্তু মাধুর মত নিরপরাধিনী মেয়েদের যে জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাওয়া তাকে প্রশমিত করার জন্য আইনে বিধান কই? আইনের কি অধিকার আছে এদের শাস্তি দেওয়ার? আইনের মধ্যে কি মানবিকতার কোন স্পর্শ থাকবে না? আইন কি শুধু নিষ্করুণ কতকগুলো অক্ষরের আঁকিবুঁকি আর তাকে কার্যকরী করার জন্য কিছু হৃদয়হীন মানুষের জাগ্রত কর্তব্যবোধ—তার বেশি আর কিছু নয়? কেন, যদি অপরাধী কোন ব্যক্তিকে আটক করে রাখা হয় তবে তার জন্য গার্হস্থ্য জীবনযাপনের নির্দিষ্ট ব্যবস্থা করতে বাধাটা কোথায়? পুলিশ রাষ্ট্রপতিকে পাহারা দিতে পারে. রাজ্যপাল, মন্ত্রী প্রমুখকে পাহারা দিতে পারে, জাতীয় সম্পত্তি অথবা দেশের সীমান্ত রক্ষা করতে পারে। কিন্তু মানুষের মমতাবোধ, স্নেহ, দয়ামায়া, মানবিক ধর্মকে পাহারা দেবার কোন ব্যবস্থা করতে পারে না কেন—একথা ভাবতেও কেমন যেন বিস্মিত হতে হয়। বিস্মিত হতে হয় এই ভেবে যে, এগুলি জাতীয় সম্পত্তি, দেশের সীমান্ত রক্ষার চেয়ে কি কম মূল্যবান জিনিস বলেই মনে করেন দেশের শাসকশ্রেণী? বার বার গোটা পৃথিবীর অসংখ্য কবি, সাহিত্যিক. দার্শনিক. সমাজসেবী, রাজনৈতিক নেতা অনেকেই একথা বলেছেন। কিন্তু তবু আজ পর্যন্ত এ ব্যবস্থাগুলি হয় নি। কিন্তু কেন? শুনেছি সমাজতান্ত্রিক দেশে এরকম কিছু কিছু ব্যবস্থা কার্যকরী করা হয়েছে। যদি সে-সব দেশে এরকম ব্যবস্থা হতে পারে, তবে আমাদের দেশেই বা হতে পারবে না কেন? এখানেও বোধ করি সেই পুরনো কথা—শাসনযন্ত্রের মধ্যে চাই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে দেশে শোষণ, পীড়ন. দমন-নীতি হচ্ছে প্রশাসনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য সে দেশে এই নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গী আসবে কি করে? যে দেশে ধনতন্ত্রবাদ কোটি কোটি মানুষের রক্ত. অশ্রু আর কঙ্কালের ওপর আপন সভ্যতার অভ্রভেদী সৌধ

নির্মাণ করে, সে দেশে এই অমানবিক প্রবাহধারা প্রচলিত থাকাই স্বাভাবিক। যদি কোনদিন এর জড় উপড়ে ফেলতে পারে এদেশের মানুষ, তবে এই মানবিকতার আবির্ভাব সেইদিনই ঘটবে, তার আগে নয়। মাধুর কথাগুলো আমার কানে তখনও যেন বাজছিল ঃ 'ওকে না হয় শাস্তি দিতে হবে, কিন্তু আমি কি করেছিলুম যে আমাকেও তার সঙ্গে শাস্তি দিতে হবে? দিনরাত, মাসের পর মাস বছরের পর বছর ধরে আমাকে তুঁষের আগুনে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে দেবে, ওরা বলতে পারিস মায়া?'

মায়া স্বভাবতই কোন উত্তর দিতে পারে নি।

এতক্ষণ যেন মাধুর খেয়ালই ছিল না সকলের সঙ্গে আমিও রয়েছি। কিছুক্ষণ আগে সে তার অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আমাকে নিবেদন করে এসেছে মায়াদের বাড়িতে যেহেতু আমার দর্শনের পরই সে ফিরে পেয়েছে তার আপন মানুষটিকে। এবারেও তার বিপদের মেঘ কেটে যেতে ঠিক তেমনিভাবেই সে উচ্ছ্বসিত হয়ে এসে আমার পদধূলি গ্রহণ করে বললে 'এ বিপদ আমার কাটল শুধু আপনারই আশীর্বাদে।'

মানুষের আন্তরিক বিশ্বাসকে কখনো উপহাস করতে নেই, আর তা আমি শিখিও নি কোনদিন। কিন্তু তবু সেইখানে দাঁড়িয়ে আমার মনে হল, এটা মাধুর একটা ভিত্তিহীন অহেতুক বিশ্বাস আমার ওপর। হয়তো মাধু বিশ্বাস করে গেরুয়ার অলৌকিকতায়, আর তার সঙ্গে সেই গেরুয়া আমার অঙ্গে আছে বলে আমাকেও। কিন্তু আমি তো জানি কতদূর মিথ্যে একথা। মাধুর কাণ্ড দেখে আমার সেই পুরোনো প্রবচন মনে পড়ে গেল, 'ঝড়ে কাক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে।'

মণ্টু এতক্ষণ চুপচাপই ছিল। সে বলে উঠল, 'মাধুমাসি সাবাস্ তুমি। তোমাদের ওস্তাদ শুনলে তোমায় তারিফ করবে। কিন্তু শঙ্কর মেসো পালালো কোথা দিয়ে বলদিকি?'

মাধু হাসতে হাসতে বললে, 'সে এখন ওস্তাদের সাগরেদ বসন্তর আড্ডায়। সেখান থেকে আর তাকে ধরে নিয়ে যেতে হচ্ছে না। ডি-সি সেন্ট্রালের সেখানে প্রতিপত্তি।'

আবার চমকে উঠলাম এবং সুপারসাহেবের মুখে যা শুনেছিলাম তাই ইংরেজীতে যাকে বলে 'করোবোরেটেড' হওয়া তাই হল।

অতঃপর আমরা মণ্টুর সঙ্গে রানীদির বাড়ির দিকে চলতে লাগলাম।

রানীদির সেই ঘর। সেই বেশ। সেই নাকে তিলক-কাটা বৈষ্ণবী তিনি। আমাদের দেখেই তিনি বলে উঠলেন, 'আচ্ছা দেরি করতে পারিস তোরা! সেই কখন থেকে খাবার-দাবার সাজিয়ে নিয়ে বসে আছি।'

এ যেন সে মানুষই নয়—গত রাতে যে মানুষটিকে আমি দেখেছি। অত্যন্ত সহজ সুন্দর—মা যেমন ছেলে-মেয়েদের খাবার-দাবার সাজিয়ে নিয়ে বসে থাকে, যেমন তাদের দেরিতে অনুযোগ করে ওঠে, ঠিক তেমনিভাবেই তিনি আমার সঙ্গে ব্যবহার করলেন, কোথাও কোন সংকোচ নেই, দ্বিধা নেই। বলা বাহুল্য, তিনি যতখানি সহজ হলেন আমার কাছে আমি ঠিক ততখানি সহজ হতে পারলাম না তাঁর কাছে। আমি সেই মুহূর্তে কোন কথাই বলতে পারলাম না তাঁর সামনে।

মণ্টু অবশ্য বলে উঠল, 'দেরি হবে না কেন—মামাবাবু চান করতে গেলেন চান করে কাপড় ছেড়ে তৈরি হয়ে আসতে ওঁর দেরি তো হলই, তা ছাড়া পথে আবার গোলমাল—'

রানীদি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মণ্টুর দিকে তাকালেন। মণ্টু বললে, 'জিজ্ঞেস করো না মায়াকে!'

মায়া যথাযথ বিবরণ দিলে। শঙ্করের জেল থেকে পালিয়ে আসার ব্যাপারটাও যেমন কিছু নয়, তেমনি তাকে জেলসুপারের ধরতে আসার ব্যাপারটাও কিছু নয়—এমনি সহজভাবেই আর

পাঁচটা ব্যাপারের মত রানীদি শ্রোতা যেমন শুনে যায় তেমনি-ভাবেই শুনে গেলেন শুধু। তারপর ঘরের মেঝেয় দু'খানা আসন পেতে সেই জায়গাগুলোয় মণ্টু আর মায়াকে বসতে বললেন। তারপর আমার জন্য একদিকে একটা আসন পেতে বললেন, 'বিজন তুই এখানটায় বোস্।'

হয়তো এই আসনটাই আমার বৈশিষ্ট্য। আমার জন্য এই বৈশিষ্ট্যটুকু লক্ষ্য করে মায়া বলে উঠল, 'মাসি নিজের ভাইকে যত্ন করে খাওয়াবে বলে আলাদা আসন দিচ্ছে।'

রানীদি বললেন, 'তা তো বলবি রে পোড়ারমুখী।'

মায়া খিল খিল করে হেসে উঠল।

অনেক কিছু রেঁধেছিলেন সেদিন রানীদি। অনেক অনুরোধ উপরোধ করে তিনি আমাকে সেদিন খাইয়েছিলেনও। ঠিক আগেকার দিনে যেমনভাবে খাওয়াতেন—এমন কি ইতিপূর্বে গত-কালও তিনি যেমনভাবে খাইয়েছিলেন নিজে হাতে তেমনিভাবেই খাইয়েছিলেন। কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে যে কথাটা ফুটে উঠেছিল—এইদিনকার আয়োজনটার পরিকল্পনা যখন তিনি করেছিলেন, তখন ওস্তাদের আড্ডায় দৈবক্রমে রানীদিকে আমি দেখে ফেলব এটা তিনি ভাবেন নি। সেই ঘটনাটাই যেন খাওয়া-নোর আনন্দের মধ্যে খোঁচার মত খচ্ খচ্ করে বিঁধছিল—বিঁধছিল রানীদিকে আর বিঁধছিল আমাকে। মণ্টু বা মায়া কারোরই এসব কথা জানার নয়। কিন্তু তবুও তারা মাঝে মাঝে আনন্দস্রোতের মাঝখানে আড়ষ্টতা উপলব্ধি করে, কখনও রানীদির মুখের দিকে, কখনো বা আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। তাকিয়ে তাকিয়ে তারা কি বুঝছিল তা জানি না—তবে আমার কাছে খুবই কষ্টদায়ক বলে মনে হচ্ছিল ব্যাপারটা।

খেয়েদেয়েই চলে আসা যায় না। আমি আসতে চাইলেও

রানীদি যে আসতে দেবেন না তা আমি জানতাম এবং ঠিক সেই কারণেই আমি বিছানার ওপর একটু বসলাম। মায়া আমাকে বসতে দেখে বলে উঠল, 'দাদার এবার বিশ্রামের পালা শুরু হবে বোধ হয়—'

আমি বললাম, 'ঠিক বিশ্রাম নয়—খেয়েদেয়েই চলে যাব, তাই একটু বসে যাচ্ছি!'

মণ্টু বললে 'মামাবাবুকে এবার আমরা এখানে ধরে রাখব—তোদের ওখানে যেতে দেবো না।'

'বললেই অমনি হল', মায়া বললে. 'তোদের এখানে থাকলে দাদার সঙ্গে আমি আর জীবনে কথাই বলব না।'

'তুই কথা না বললে তো মামাবাবুর বড় বয়েই যাবে!'

'বয়ে যাবে কিনা জানি না—তবে দাদার দিক থেকে অধর্ম্মো হবে।'

আমি এবার হেসে ফেললাম। বললাম, 'ওটা কিন্তু মায়া তোমার আর মণ্টুর ঝগড়া। আমি ওর মধ্যে নেই।'

'নেই তা আমি জানি,' মায়া বললে, 'মণ্টু আমাকে অমন করে বলবে কেন?'

রানীদি বোধকরি পাশের রান্নাঘরে খাওয়া-দাওয়া সারছিলেন। খানিক পরে এসে বললেন, 'তোরা সব এতক্ষণ একটু শুয়ে নিতে পারিস নি মণ্টু?'

'শোব কি মাসি' মণ্টু বললে, 'আমাকে এখুনি তো বেরুতে হবে—'

'কদ্দূর যাবি?'

'জানো না?'

'ও!' যেন মনে পড়ে গেল একটা ভুলে যাওয়া কথা। তারপর রানীদি তাঁর রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির সামনে কয়েকটা ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিয়ে বললেন, 'তারপর বিজন, দিদির কাছে খেয়ে তৃপ্তি হল তো?'

সহসা এরকম কথার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। খেয়ে তৃপ্তি হয়েছে কি না একথা কেন রানীদির মুখে? খেলে পেটই ভরে মানুষের। আগে পেট ভরার কথাটাই জিজ্ঞাসা করে মানুষ। কিন্তু তৃপ্তির কথাটা কেন? তৃপ্তি তো উদরের বিষয়বস্তু নয়, তৃপ্তি হল মনের জিনিস। তাহলে কি রানীদি আমাকে এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে তৃপ্তির প্রসঙ্গ তুলে আমার কাছ থেকে গত রাতের কথাটা পর্যন্ত জেনে দিতে চাইছেন? গত রাতে যদি তাঁর কাণ্ড দেখে আমি তাঁকে ঘৃণা করে থাকি মনে মনে, তাহলে নিশ্চয়ই আমার খেয়ে তৃপ্তি হবে না, আর তৃপ্তি না হলে আমি যে তাঁকে গত রাতে ঘৃণাই করেছি সেই কথাটাই আমার কাছ থেকে তিনি বের করে নেবেন। আমি বুঝলাম তাঁর উদ্দেশ্যটা। আমি তাঁকে বললাম, 'মণ্টুকে আর মায়াকে জিজ্ঞাসা করো না।'

মায়া বললে, 'বাঃ রে আমাকে কেন?'

'তাহলে তোমার খেয়ে তৃপ্তি হয় নি মায়া', আমি জিজ্ঞাসা করলাম। মণ্টু বললে, 'প্রশ্নটা তো মাসি আপনাকে করেছিলেন মামাবাবু। আপনি আমাদের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন কেন?'

বললাম, 'তোমাদের ঘাড়ে আমি চাপাতে চাই নি। তোমাদের দিয়েই আমি উত্তরটা তোমার মাসিকে দিতে চেয়েছিলাম'—আমার কথাটা শোনামাত্রই সহজ সরল মায়া বলে উঠল, 'সত্যিই খুব তৃপ্তির সঙ্গে আমি খেয়েছি। মাসির রান্নাটাও এত সুন্দর।' মণ্টু বললে, 'আমার কিন্তু এত খাওয়া একসঙ্গে ভাল লাগে না'

আমি এবার রানীদির দিকে তাকালাম। রানীদি একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেলেন বলে মনে হল। তবু তিনি বললেন, 'বিজনকে আজ খেতে বলেছিলুম, কিন্তু শুধু খাবার জন্যেই খেতে বলি নি। ওকে খাওয়ানোর মধ্যে ওর সঙ্গে অনেক গল্প করব মনে করেছিলুম। আমার যে কত ভাল লাগে সেই সব পুরনো গল্প—কিন্তু কি করব,

ও এল যেন আজ একেবারে গম্ভীর সন্ন্যাসী-ঠাকুরটি। মানুষের মনের কথা ও বুঝতেও পারলে না।'

চাবুকের আঘাত পিঠে পড়লে যেমন মানুষ সহসা যন্ত্রণায় চমকে ওঠে, আমি প্রায় সেইরকম ভাবেই চমকে উঠলাম। বিশেষ করে মন্টু ও মায়ার সামনে এ আঘাতটা যেন কেমন আমায় বেসামাল করে দিলে। মন্টুর কোথায় যাবার কথা ছিল সে বেরিয়ে গেল। তার দেখাদেখি মায়াও বলে উঠল, 'তোমরা ভাই-বোনে গল্প করো মাসি—তারপর এক সময় আবার আসব।'

ওরা চলে যেতে আমি শুধু বলে উঠলাম, 'এমন করে ওদের সামনে আমাকে চাবুক মারার কি দরকার ছিল রানীদি ?'

রানীদি এবার সেই আগেকার চাপা দীর্ঘশ্বাসটা বাইরে ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'বুঝি রে বিজন, বুঝি—পুরুষমানুষ তুই। মেয়েদের সম্বন্ধে তোরা একটা কথাই শিখে রেখেছিস, আর সে কথাটা তার অসম্মানের কথা, তার নিচে নামার কথা। মেয়েরা যে পাঁকেও পদ্মফুলের মত ফুটে ওঠে—সে কথা তোরা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারিস না।'

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তিনি বলে যেতে লাগলেন, 'অথচ এমন দিন আসে বা আসতে পারে, যখন হয়তো··· · না না, থাক্ সে সব কথা আজ আর তুলে তোকে ব্যথা দেবো না। কাল যা জেনেছিস তাই সত্যি হোক আমার জীবনে, আর তোর জীবনে !'

প্রথমে আমি আশ্চর্য হই নি। বরং বুঝেছিলাম রানীদি আজ সুযোগ পেলেই গত রাত্রির কথা তুলবেন। কিন্তু আশ্চর্য হলাম পরে, গত রাত্রির কথা তিনি এইভাবে নিয়ে আসলেন দেখে। সেদিন আরও অনেক কথাই হয়েছিল। সে কথা যদি কখনও সুযোগ

আসে বলব, কিন্তু শুনতে শুনতে আমি সহ্য করতে পারি নি—উঠে পালিয়ে এসেছিলাম রানীদির কাছ থেকে। রানীদি চাপা গলায় ডেকেছিলেন অনেকবার কিন্তু আমি আর ফিরে চাই নি।

কঠিন যন্ত্রণায় মানুষ যেমন কথা বলতে পারে না, তখন আমারও ঠিক সেই অবস্থা।

সেই যে সেদিন রানীদির ওখান থেকে পালিয়ে এলাম, বহুদিন আমি আর সেমুখো হলাম না। রানীদিও কেন কি জানি, আমাকে তেমনভাবে আর খুঁজলেন না। এমন কি মণ্টু পর্যন্ত আর আসে না আমার কাছে। যা হোক, ইতিমধ্যে কেমন যেন এক দায়িত্বপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে আমাকে জড়িয়ে পড়তে হল। এতদিন মায়া আর তার মা ছিলেন আমার জগতের দুটি মানুষ—যাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আমি সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু এরপর যেন আমার ওপর আরও কিছু ভার এসে পড়ল। সে ভার আমি নিজে নিয়েছিলাম কিনা জানি না, তবে এসে পড়েছিল—এসে পড়েছিল মায়ের অশ্রুজলের উদ্দাম স্রোতে। শঙ্করের ওপর পুলিশের পরোয়ানা, তার আশঙ্কা মায়ের পক্ষে যেন অসহনীয়। দিন-রাত তাঁর সেই একই ভাবনা। জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় তিনি কেমন করে যেন জেনে নিয়েছেন—এক দল পুলিশ যদি বা শঙ্করের প্রতি মমতাসম্পন্ন কিন্তু অন্য পুলিশ দল তা নয়। পুলিশের মধ্যে সবাই যদি প্রথমোক্ত দলের মত হত, তাহলে শঙ্করের জন্য হয়তো তাঁর অতো ভাবনা হত না। কিন্তু উপায় কি?

আমি যখন এখানে এসেছিলাম, তখন ছিল গ্রীষ্মের শেষ। তারপর বর্ষা গেছে, শরৎ গেছে, গেছে হেমন্ত, এখন এসেছে শীত। দেখি শঙ্কর মাঝে মাঝে আসে। বাড়িতে টাকা দিয়ে যায়, খেয়ে যায়। আবার কোথায় সে উধাও হয়ে যায়, বেশ কিছুদিন আর তার দেখা মেলে না। অনেকদিন পর যখন সে আসে, তখন মা

তাকে চেপে ধরেন আর বলেন, 'কোথায় হঠাৎ-হঠাৎ চলে যাস্—আমি যে কোন কূলকিনারা পাই না রে।'

'অতো ভাবো কেন তুমি?' শঙ্কর বলে, 'আমরা বয়ে যাওয়া ছেলে—আমরা কখনো মরব না।'

'না না ওকথা বলিস নি—ওকথা ভাবলেও আমি শিউরে উঠি', মা বলেন, 'কিন্তু এইভাবেই তোকে চিরকাল দেখব বলে কি আমি আশা করেছিলুম শঙ্কর?'

'কেন,' শঙ্কর বলে, 'আর কি আশা করো তুমি? টাকা পাচ্ছ, পয়সা পাচ্ছ, দু'বেলা খেতে পাচ্ছ, মাথা গোঁজারও কোন অভাব নেই। এরপর মানুষের আর কি দরকার?'

'এরপর আর কি দরকার' মা'র চোখ ফেটে যেন জল আসে। তিনি বলে ওঠেন, 'এই কি তোর কাছে আমার সব আশা রে?'

'তাহলে কি আশা করো তুমি?'

মায়ের আশা যদি শঙ্কর বুঝতে পারত, তবে সে ওভাবে প্রশ্ন করত না। সন্তানের কাছে মা কি আশা করেন? মা আশা করেন সন্তান তাঁর দশজনের একজন হবে, সৎ, সামাজিক জীবনযাপন করবে, সংসার-ধর্ম পালন করবে—এই তো মায়ের সবচেয়ে বড় আশা। তাই মা আহত-ভাবে বলেন, 'তুই তো আমার কথা কোন-দিন শুনলি না বাবা!'

'কি বলছ মা', শঙ্কর বলে, 'আমি তোমার কথা শুনি নি? তোমাদের জন্যে ওস্তাদের কাছে বলে-কয়ে তোমাদের পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দিয়েছি—তা কি তুমি জানো? জানলে বুঝতে পারতে আমি তোমার কথা শুনছি কি না-শুনছি!'

'আমি ওকথা বলি নি শঙ্কর,' হঠাৎ যেন যন্ত্রণায় ভেঙে পড়ে মা বলে ওঠেন, 'আমার মনের কথা তুই বুঝবি না রে, বুঝবি না!'

শঙ্কর বলে, 'কেন?'

'কেন কি,' মা দৃঢ়ভাবে বলেন, 'বুঝিস্ না তুই—যদি বুঝতিস,

তাহলে ওপথ থেকে তুই সরে আসতিস্। পারবি সে কথা বুঝতে? তাহলে চল্ এখান থেকে অন্য কোথাও। আমি চাই না এই পাপের অন্ন, এর জন্যে কোন পাকাপাকি ব্যবস্থা কিম্বা মাথাগোঁজার এতটুকু ঠাঁই! এই পাপের জগৎ থেকে দূরে, অনেক দূরে পালিয়ে যেতে পারলে আমি বাঁচি। এখানে আমার দম যেন বন্ধ হয়ে আসে!'

এরপর শঙ্কর আর বাদানুবাদ করে না। খেয়েদেয়ে ধীরে ধীরে চলে যায়।

কিন্তু মায়ের যন্ত্রণার তো শেষ নেই। ছেলের জন্য কোথায় তাঁর মর্মবেদনা—শঙ্কর তা না বুঝুক, আমি বুঝেছিলাম। আর বুঝেছিলাম বলেই আমার হয়েছিল মুশকিল। ভেতরটা মায়ের যেন জ্বলেপুড়ে যেত শঙ্করের কথা ভেবে ভেবে। তাই প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে তাঁকে খুঁজতে হত কি করে সেই নিরন্তর অগ্নিদাহ থেকে তিনি অব্যাহতি পান,- কি করে তাঁর মনের ক্ষতকে তিনি উপশম করেন! এক-একদিন আমাকে বলতেন, 'বাবা বিজন, আমি আর পারছি না—এবার আমি পাগল হয়ে যাব শঙ্করের জন্যে। আমার এক ছেলে ও—ও আমার বংশের শিবরাত্রির সল্‌তে। নিভে গেলে আমার সব যাবে বাবা, সব যাবে। তুমি ওকে একটু বোঝাও বাবা!'

শঙ্করকে আমি বোঝাবো—এ আমার সাধ্যের অতীত। যে ছেলেকে খাবারের মধ্যে আফিম গিলিয়ে গিলিয়ে ওস্তাদ তাকে নেশায় বশীভূত করেছে, খেলাচ্ছলে যাকে শিখিয়েছে কেমন করে লোকের পকেট থেকে টাকা-পয়সা তুলে নিতে হবে, কেমন করে হাত থেকে ঘড়ি খুলে নিতে হবে, আর কেমন করে ট্রেন-যাত্রীদের বাক্সপ্যাঁটরা সরাতে হবে, যে ছেলেকে শিখিয়েছে চুরি-ডাকাতি, খুন-জখম করতে যাকে ছোট ওস্তাদ বলে সম্মান আর মর্যাদা দিয়েছে ওস্তাদ, তাকে বুঝিয়ে ঠিক পথে আনতে পারব আমি, এ বিশ্বাস মায়ের থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু আমার নেই। তবু মায়ের আগ্রহ দেখে বললাম, 'দেখব চেষ্টা করে, কতদূর কি করতে পারি।'

মা বললেন, 'তুমি সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ, তোমার কথা শুনলেও শুনতে পারে।'

আমি হাসলাম মায়ের কথায়। কিন্তু তাহলেও সত্যি-সত্যিই একদিন ধরলাম শঙ্করকে দুপুরবেলায়। শীতের দুপুর। অল্প অল্প বাতাসও বইছিল। ঠাণ্ডার প্রকোপ একটু বেশীই। মায়ের কাছে খেয়েদেয়ে সে চলে যাচ্ছিল, আমি বললাম, 'শঙ্কর, দাঁড়াও একটু—আমি যাব তোমার সঙ্গে।'

'আমার সঙ্গে!'—বিস্মিতভাবে শঙ্কর ঘুরে দাঁড়ালো।

বললাম, 'হ্যাঁ'। তারপর চাদরখানা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম তার সঙ্গে। মাধুর ঘরের কাছাকাছি এসে দাঁড়ালাম দু'জনে। তাকে বললাম, 'একটা কথা বলব আমি তোমায়!'

'কি কথা, তাড়াতাড়ি বলুন।'

'ভয় নেই তোমার। এ তো আমরা দাড়িয়ে আছি দুর্গে।'

'তা ঠিক, কিন্তু আমার কাজ আছে।'

'কি এত কাজ?'

'আমাদের কাজ জানেন তো!'

'তবু?'

'আপনাকে বলতে কোন দোষ নেই। রেলের বড় কর্তারা খবর দিয়েছে, খুব একটা দামী মেটাল আসছে পার্শেল এক্সপ্রেসে। কেবিনের সঙ্গে কথা কয়ে রাখতে হবে, যাতে সিগনাল ডাউন না করে। তারপর আজ রাতের মধ্যেই কাজ সাফ করতে হবে। এ সমস্ত অপারেশনটার দায়িত্ব আমার ওপর।'

'কেন, তোমাদের আর কেউ নেই?'

'থাকবে না কেন? কিন্তু তাদেরও তো কাজ আছে।'

'তারা কেউ থাকবে না তোমার সঙ্গে?'

'কেউ কেউ থাকবে—যেমন মন্টু, ভানু, জগদীশ—'

'মণ্টু!' আমি চমকে উঠলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা মণ্টুকে আজকাল আর দেখি না কেন বলো ত'?'

'ও তো এ্যাদ্দিন জেলে ছিল। আজই এসেছে মাত্র।'

'আজ?'

'হ্যাঁ। নেপালে আফিম আনতে গিয়ে ধরা পড়েছিল।'

তাই মণ্টু আমার কাছে আসে নি। ব্যাপারটা এখন বুঝতে পারলাম। যাই হোক, আমি আর কথা না বাড়িয়ে বললাম, 'একটা কথা শঙ্কর—ঐ দামী মেটাল ওয়াগন থেকে লুঠ করে তোমরা করবে কি?'

শঙ্কর বললে, 'আপনি কি মনে করেন ওসব জিনিস বিক্রি করার আমাদের কোন সোর্স নেই?'

'আমি তো তাই মনে করি—'

শঙ্কর একটু হাসল। হেসে বললে, 'না না, ওসব ভাবনা নেই। অনেক শেঠ আছে, যাদের ভাই-ভাতিজা দিল্লীতে মন্ত্রী, নয়তো বড় বড় অফিসার। ঐ মালই ঘুরিয়ে আবার চালান দেবে তারা, মাঝখান থেকে শুধু লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার হয়ে যাবে, এই হচ্ছে মজা।'

আশ্চর্য হয়ে গেলাম শঙ্করের কথায়। ইতিপূর্বে শুনেছি বড় পুলিশ অফিসার আছে তাদের সঙ্গে, এখন জানলাম রেলের বড় কর্তারা এবং মন্ত্রী-আমলা আর তাদের আত্মীয়স্বজনও আছে। কে জানে, গোটা ভারতবর্ষকে আজ ওরাই হয়তো এমনিভাবে চক্র রচনা করে লুঠ করছে। মাঝখান থেকে আমরা দেখি শুধু গোটাকতক সমাজ-বিরোধী মানুষই বুঝি এজন্য দায়ী। আমাকে চিন্তান্বিত দেখে শঙ্কর বললে, 'এসব কথা ভাবতে যাবেন না আপনি। ভেবে কূলকিনারা করতে পারবেন না। তার চেয়ে বলুন আপনি কি বলবেন বলছিলেন—সত্যিই আমার সময় নেই।'

আমি শঙ্করকে যা বলতে চেয়েছিলাম, এই সব কথা উঠে পড়ায় তা কি ভাল করে তাকে বলা সম্ভব হবে? না সে শুনবে মন দিয়ে?

তবু আমাকে বলতেই হবে, কারণ মায়ের আকুল মিনতি। তাই চট্ করে এই সব কথার সূত্র ধরেই আমি অকপটে তাকে বলে ফেললাম 'ছ্যাখো শঙ্কর, তোমাকে আমি যে কথাটা জিজ্ঞাসা করতে চাইছিলাম, সেটা একটু বেসুরো শোনাবে হয়তো, কিন্তু তোমাকে না বললেই বা আমি বলব কাকে? তাই'—

'বলুন।'

'আচ্ছা এই সব কাজে সত্যিই কি তুমি কোন আনন্দ পাও?'

'আনন্দ—আনন্দ আপনি কাকে বলেন?'

'ধরো এই সব কাজের মধ্যে যখন সফল হও, তখন তোমার কি মনে হয়?'

'খুব ভাল লাগে।'

তারপর?'

'তারপর আবার কি—'

'ধরো টাকাকড়ির লেনদেন হল, নেশা-ফুর্তি চলল, কিন্তু অবসাদ আসে তো?'

'হ্যাঁ তা আসে।'

'তখন কি মনে হয় বলো তো?'

'তখন—তখন আর কি মনে হবে? মনটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যায়। কিছুই ভাল লাগে না।'

'অন্য কোন কথা মনে পড়ে না?'

'কি রকম?'

'এই ধরো মায়ের কথা, মায়ার কথা, আর তা ছাড়া আমি তো জানি মাধুকে তুমি ভালবাসো, সেও তোমায় ভালবাসে—এদের কথা তোমার মনে পড়ে না?'

'খুব পড়ে।'

'এদের নিয়ে তোমার একটা কিছু ঘর বা সামাজিক জীবন গড়ে তুলতে ইচ্ছা করে না?'

‘একেবারে যে ইচ্ছা করে না তা নয়, কিন্তু পথ কোথায় ?’

‘কেন ?’

‘কেন কি ? ওসব করলে তো এখান থেকে চলে যেতে হয়। আর চলে গিয়েই বা থাকব কোথায় ? পুলিশ বা দলের নজর এড়িয়ে তো থাকতে পারব না। ওরা ঠিক আমাকে টেনে নিয়ে আসবে এখানে।’

মনে পড়ে গেল—আরও একবার ওরা পালিয়ে গিয়েছিল এখান থেকে, কিন্তু দলের নজর এড়িয়ে থাকতে পারে নি। পুলিশ আর দল একত্র ওদের ধরে এনেছিল। কাজেই মা বললেও শঙ্করের সামনে পথ কই ? উপলব্ধি করলাম ব্যাপারটা। শঙ্কর আর দেরি করল না। সে শুধু বললে, ‘আমি জানি মা মনে মনে আমার ওপর খুবই রাগ করেন। কিন্তু আমি করবটা কি ? আমার কোন উপায় নেই। যা হোক আমি চললুম, কিছু মনে করবেন না।’

সেইদিনই ফিরে এসে দেখলাম মা আকুল আগ্রহে মাধুকে দাওয়ায় দাঁড় করিয়ে কিসব বলছিলেন। কাছে যেতেই শুনতে পেলাম, মা বলছেন, ‘এমন এক পাপের গহ্বরে এসে বাসা বেঁধেছি মা, আমার সব আশা, সব স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল। তা না হলে তুই আমার কে তা জেনেও আমি তোকে বরণ করে ঘরে তুলতে পারলুম নারে। এ কি আমার কম দুঃখু। কিন্তু মা, তোকে আমার একটি কথা—’

মাধু নিরুত্তরভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

মা বলতে লাগলেন, ‘তোর কি ভাল লাগে মা এই জীবন ? তোর কি একটু ঘর বাঁধবার ইচ্ছা হয় না ? বলতো মা আমায় খুলে।’

দেখলাম মাধুর চোখ ছলছল করে উঠল। আমি আর দাওয়ায় দাঁড়ালাম না। আস্তে আস্তে ঘরের ভেতর চলে এলাম। কারণ আমি তৃতীয় ব্যক্তি। তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি সব সময়েই মানুষের আবেগকে অবরুদ্ধ করে দেয়। তা ছাড়া মায়ের কথাগুলো আমার

খুব ভাল লাগছিল—মনে হচ্ছিল, সেগুলো আরও দুর্বার হয়ে বেরিয়ে আসুক তাঁর অন্তরের অন্তস্থল থেকে আর আমি সেই কথাগুলি গভীর মনোযোগ সহকারে শুনে যাই।

ঘরে পা দিতেই দেখি মায়া মাদুরে বসে বসে আমার খবরের কাগজখানা ওল্টাচ্ছে।

বললাম, 'কি খবর মায়া?'

মায়া খবরের কাগজের পাতায় একখানা ছবি দেখিয়ে বললে, 'এই লোকটিকে চিন্‌তে পারেন?'

মাদুরে বসে পড়ে আমি ছবিখানা দেখে চমকে উঠলাম। এ কি ব্যাপার! বললাম, 'এ তো তোমাদের ওস্তাদের ছবি।'

'হ্যাঁ, তাহলে ঠিক ধরেছেন দেখছি।'

'ধরতে পারব না কেন.' কথাটা আমি মায়াকে বললাম বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার মন চলে গেল উধাও হয়ে যন্ত্রণাকর এক বিস্ময়ের রাজ্যে। একটা শেকল-ছেঁড়া দু-দশকেরও বেশী স্বাধীন দেশে এ ঘটনা ঘটতে পারে, এ যেন আমার কল্পনার অতীত। আমাদের জাতীয় নেতাদের এবং তার সঙ্গে দেশের কোটি কোটি মানুষের ত্যাগ ও দুঃখবরণের মধ্য দিয়ে যে মানসিক সম্পদ আমরা লাভ করেছি, ওস্তাদের ছবি যাদের সাথে একত্র ছাপা হয়েছে. তাতে কি সেই সম্পদ অটুট থাকে? কংগ্রেসমন্ত্রীরা নির্বাচন অভিযানে বেরিয়েছেন— ছবিখানা তারই। কিন্তু সঙ্গে তাঁদের ওস্তাদ কেন? তবে কি মন্ত্রীরা জাতির দর্শন, আদর্শ, ঐতিহ্য সব কিছুকে জলাঞ্জলি দিয়ে, এমন কি রাজনীতিকে পর্যন্ত বর্জন করে শুধুমাত্র ক্ষমতায় আসীন হবার জন্য ওস্তাদের মত লোককে নিয়ে এই জঘন্য নোংরা রাজনীতিতে নেমেছেন? না ওস্তাদই জাতে ওঠবার জন্য এই সব নেতাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? কোন্‌টা সত্য? কিম্বা ঘটনাটা এমনই কিনা যে, জাতীয় নেতাদের মহাযাত্রা আর ওস্তাদের জীবনযাত্রা গঙ্গা-যমুনার মত একই ধারায় এসে মিশে গেছে বর্তমানে? ছবিখানা

দেখামাত্র আমাকে অবাক হয়ে যেতে দেখে মায়াও বিস্মিত কম হল না। সে বললে, 'ওস্তাদের ছবি এই সব লোকদের সঙ্গে কেন?'

'আমি ছবিখানার ওপর আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম, 'এই সব লোক কারা তুমি জানো?'

'না তো।'

'এঁরা সব বড় বড় মন্ত্রী—ভোটের ব্যাপারে বেরিয়েছেন।'

'তা ওস্তাদ কেন ওঁদের সঙ্গে?'

'সেই কথাটা তো আমিও ভাবছি।'

মায়া বললে, 'বোধহয় ওস্তাদকে সঙ্গে নিলে ওঁরা ভোট বেশী যোগাড় করতে পারবেন, না দাদা?'

'বোধহয় ঠিক কথাই বলেছ মায়া। নেতারা নিজেদের আদর্শের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন আর তাই এবার নেমেছেন নোংরা কাজে।'

'কিন্তু এতে মন্ত্রীদের কি সুবিধা হবে বলুন তো? এরপর ওস্তাদ যখন চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই করাবে, কিম্বা মালগাড়ি ভাঙবে, তখন মন্ত্রীদের সঙ্গে ওস্তাদের আলাপ-পরিচয় দহরম-মহরম আছে বলে পুলিশ তো লোকটাকে কিছুই বলবে না।'

'তাই তো।'

'তাহলে যে রক্ষক সেই হবে ভক্ষক?'

হতে পারে মায়া একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। কিন্তু আসলে সে তো বস্তিতেই বাস করে এবং এখানকার আবহাওয়াতেই সে মানুষ। কিন্তু তার চিন্তাধারায় যে কথা ফুটে উঠছে সেই সহজ কথাটা কি নেতাদের মাথায় আসে নি, কিম্বা আসে নি কি তাঁদের কর্মীদের মাথায়? নিশ্চয়ই এসেছে, কিন্তু এসবের পর তাঁরা করছেন কি? তাঁদের মনে, বিবেকে বা যে মহান ব্রতে তাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছেন বলে দিন-রাত্রি তারস্বরে চিৎকার করেন, সেখানে কি এর ভয়ঙ্কর রূপটা একটিবারও ভেসে ওঠে না? মায়ার মত সাধারণ

বালিকাও বুঝতে পেরেছে এরপর পুলিশ ওস্তাদকে ধরতে গেলে, মন্ত্রীদের সঙ্গে পরিচয় আছে বলে সে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে এবং নিষ্কৃতি সমর্থনের প্রকৃত পাওয়ার অর্থই হচ্ছে তার পিছনে শক্তিমানদের সমর্থন, আর সে যে চেহারা হবে, তা হবে রক্ষকের ভক্ষকরূপেই আবির্ভাব।

কে জানে দেশকে এই নেতারা কোন্-দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। এখানে আসা অবধি অনেক খবরই জেনেছি। সমাজবিরোধী মানুষগুলোকে দিয়ে একদল ওপরতলার লোক, কোর্ট, পুলিশ অফিসার, রেলের কর্তাব্যক্তিরা, কংগ্রেস নেতা সবাই যে-যার কাজ গুছিয়ে নিচ্ছেন। আদর্শ, নীতি-কথা, মহাত্মা গান্ধীর বাণী প্রচার এদের জীবনদর্শনের পথে শুধু একটা সুকৌশলী ক্যামোফ্লেজ। আসলে এরা হিপোক্রিট, ভণ্ড, বিড়াল-তপস্বী। কোন নীতির এরা ধার ধারে না। কিন্তু দুঃখ আমার এখানে নয়—জাহান্নমে যাক কংগ্রেস। কিছু এসে যায় না তাতে আমার। কিন্তু গোটা দেশটাতে এসব যদি ছড়িয়ে পড়ে, তবে আমার দেশ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? তা থেকে উঠে দাঁড়াতে যে দীর্ঘ একটা শতাব্দী লেগে যাবে।

আমি ভেতরে ভেতরে কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। মা তখনও মাধুর সঙ্গে পাগলের মত ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলছিলেন। তাঁকে চিৎকার করে আমার বলতে ইচ্ছা হল, 'লাভ কি হতভাগিনী—তোমার ছেলে তো ছেলে, সারা দেশটাকে ওরা তোমার ছেলের মত করে দেবে! এই দ্যাখো, চেয়ে দ্যাখো, সমাজবিরোধী, খুনী, ডাকাত, চোর-বাটপাড়দের নিয়ে তোমার দেশের নেতারা দেশশাসন করছে। হতভাগিনী মা, তোমার কতটুকু শক্তি আছে যুগের এই মাতৃজঠরের মূর্তিমান যূথবদ্ধ লজ্জার বিরুদ্ধে তুমি সংগ্রাম করবে? তুমি খান খান টুকরো টুকরো হয়ে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে এই সর্বনাশা শাসনতন্ত্রের হৃদয়হীন অতিকায় জন্তুদের চাপে।

পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করলাম। কেন না,

একটা সাধারণ মা তার ছেলেকে ফিরিয়ে আনার জন্য যদি দিনের পর দিন অশ্রুজলের মাধ্যমে সাধনা করে যেতে পারে, তবে সে-ও তো কম নয়। মা তো আমাকেও তাঁর এ কাজে সাহায্য করতে বলেছেন। যে কোন প্রকারে দেশের এই দূষিত আবহাওয়াকে দূর করার চেষ্টায় আমারও তো কিছু করার আছে। সত্যিই কথাটা মনে হতে কেমন যেন একটা জোর পেলাম আমি মনে।

মায়া বললে, 'দাদা কি ভাবছেন বলুন তো?'

বললাম, 'মায়া, নেহাৎই দৈবক্রমে আমি এতদিন এখানে এসে আছি—কাজের মত কাজ কিছু করতে পারি নি। এবার হয়তো আমার সেই কাজ করার সময় এল।'

'কি সে কাজ দাদা?'

'সময় এলে বলব।'

মায়া বললে, 'না—আমি বুঝেছি দাদা। নেতাদের সঙ্গে ওস্তাদের এই ছবি বেরুনোতে আপনি যেন খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। আর এতে করে দেশে ঐ যে একটু আগে বললুম, রক্ষকই ভক্ষক হবে, সে সবই বেড়ে যাবে। তাই আপনি চাইছেন এর একটা বিহিত করতে।'

আশ্চর্য হয়ে গেলাম মায়ার কথায়। মেয়েটা আমার মনের কথা এমন সুন্দরভাবে কি করে বললে। সত্যিই মেয়েটা আমাকে আপন করে নিয়েছে। মানুষ মানুষকে আপন করে না নিলে তো এমন করে মনের কথা টেনে বলতে পারে না। আমি অভিভূতের মত তাকে বললাম, 'মায়া সত্যিই তুই আমার বোন। এমনিভাবে তুই আমার মনের কথা বলে ফেললি?'

মায়া বললে, 'এ আর এমন কি কথা—এই অভিশপ্ত বস্তিতে আমার একটুও ভাল লাগে না। আমি দেখেছি, মা বা আপনারও ভাল লাগে না। কিন্তু তাই বলে মানুষগুলোকে তো আমরা কেউই পর মনে করি না। বরং ভালই বাসি। কাজেই এদের ফিরিয়ে

আনার কথা ছাড়া আমার আপনার বা মায়ের—আর কি কাজ হতে পারে? তাই সেই ভেবেই আমি বলেছি কথাটা।'

'কিন্তু তোর কথাটা যে কত সত্যি রে বোন, সে আজ আমি বুঝলাম'। তারপর বললাম, 'দেখা যাক কদ্দুর কি করতে পারি!'

কথাটা শেষ করতে না করতেই মাধু এসে ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকেই সে বললে, 'দাদা—।'

'কেন রে?'

'একটা প্রণাম করে যাই।'

'প্রণাম করে কি হয় বল তো?'

'তবু একটা সান্ত্বনা।'

'যা সান্ত্বনা আমি তোকে দিচ্ছি, আর অতো প্রণাম করতে হবে না।'

মাধু অনুযোগের ভঙ্গিতে বললে, 'কেন বলুন তো?'

'কেন কি—আমি কি এখানে কারো গুরুঠাকুর হয়ে এসেছি!'

'গুরুঠাকুর না হয়ে আসতে পারেন', মাধু বললে, 'কিন্তু এসে যে গুরুঠাকুর হয়েছেন সে বিষয়ে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কি রে মায়া, তুই কি বলিস?'

মায়া বললে, 'ঐ জন্যেই তো আমি বলি দাদাকে এখান থেকে যেতে দোবো না!'

'তবে', মাধু বললে, 'দিন দাদা পায়ের ধূলো দিন—ঘর ফেলে এসেছি!'

'তোর হীরে-মুক্তো-চুনী-পান্নারা কোথায়?'

'তাদের হু'খানা ঝুড়ি চাপা দিয়ে ইট চাপিয়ে এসেছি।'

বললাম 'আহা-আ বেচারাদের তাহলে তো কষ্ট হচ্ছে খুব!'

তারপর একরকম জোর করেই পায়ের ধুলো নিয়ে মাধু চলে গেল। তার চলে যাওয়ার দিকে হঠাৎ কেন কি জানি আমার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস আছাড় খেয়ে পড়ল। এরকম তো আমার

বড় একটা হয় না—আমি কেমন যেন হাতড়াতে লাগলাম, সত্যিই আমি কিছু হারালাম কিনা। সহসা আমার মনে পড়ে গেল মাধুকে বলা মায়ের কথাটা, "তা না হলে তুই আমার কে তা জেনেও আমি তোকে বরণ করে ঘরে তুলতে পারলাম না রে। এ কি আমার কম দুঃখু"—হয়তো সেই কথাটার মধ্যেই মাধুর অনুভূতি অনুরণিত হয়ে উঠেছিল। আর সেই জন্যেই হয়তো আমার দীর্ঘশ্বাস।

সেদিন সারাদিনটা আমার কেমন যেন এক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কাটল। আমার নিজের একটা জীবনদর্শন আছে। বলা বাহুল্য, সে জীবনদর্শন আমার গেরুয়া নয়। গেরুয়াও যেন আমার কাছে এক যন্ত্রণার সামিল হয়ে উঠেছে। পরিচয় গোপন, আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে আমি গেরুয়া পরেছিলাম, কিন্তু কি আর পরিচয় গোপন করলাম আমি এখানে এসে? রানীদি জেনে গেল আমাকে। মায়া, মণ্টু, মা—এমন কি ওস্তাদও জেনে গেল আমি রানীদির কে। আর তা ছাড়া এদের সকলের কাছে নতুন পরিচয়ও যা আমার হয়ে গেল, সেও তো এক অনাবৃত সাধারণ মানব-চরিত্র। কাজেই গোপনটা আর নিজেকে করতে পারলাম কই? সত্যি সত্যি আমি এবার স্থির করলাম আর গেরুয়া নয়—গেরুয়ার খোলস আমার 'বাসাংসি জীর্ণানি' হয়ে থাক্—এবার আমি আমার ঝুলিতে রক্ষিত সাদা জামাকাপড় আর কেডস জুতোই পরব। তা না হলে হয়তো আমিও একদিন মিথ্যে গেরুয়া দিয়ে সত্যিকারের হিপোক্রিট হয়ে উঠব। আর লোকে বলবে 'মন না রাঙায়ে কি ভুল করিলে, বসন রাঙালে যোগী।'

তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। মা হঠাৎ আমার কাছে এসে বসলেন। তাঁর বসার ভঙ্গিটা এমনই ছিল যে, তাতে আমি ধরে নিয়েছিলাম তিনি কোন গোপন কথাই আমাকে বলবেন। মা কণ্ঠস্বর বেশ নিচু করেই আমাকে বললেন, 'বাবা, বলছিলুম কি জানো—'

'কি ?'

'তোমার সঙ্গে তো মণ্টুর মাসির বেশ জানাশোনা।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

'ও আসলে এখানে কিভাবে থাকে জানো তো ?'

'ঠিক জানি না তো।'

'ও হল ওস্তাদের রক্ষিতা—'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি জানেন ঠিক ?'

'আমি আর জানি না ?'

'তারপর ?'

'বড় বড় সায়েবসুবো, অফিসার, নেতা—সব ওস্তাদের বাড়িতে আসে। মণ্টুর মাসিকে ওস্তাদ এগিয়ে দেয়, মণ্টুর মাসি নেশা করে, ফুর্তি করে নেচে গেয়ে তাদের আপ্যায়িত করে—তাতে সব লোক ওর বশীভূত হয়ে থাকে'—

ওঃ, যেন আর শুনতে পারছিলাম না রানীদির এই পরিচয়। আমি নিজে চোখে রানীদির এ মূর্তি দেখেছি, কিন্তু সে তো শুধু ওস্তাদের ঘরেই। রানীদি কি মায়ের কথামত একেবারেই বারবধূ হয়ে গেছে! সারা শরীরে কেমন যেন একটা তীব্র শিহরণ বয়ে গেল আমার। চিৎকার করে আমার বলতে ইচ্ছা হল, 'রানীদি, ঘৃণা করি—ঘৃণ্য করি আমি তোমাকে!' কিন্তু আপাতত মা যেন কি বলতে চাইছেন!' তাঁর কথাটা আমার শোনা দরকার, অন্তরের অপরিমেয় জ্বালাকে চেপে রেখে।

মা বললেন, 'তুমি যদি মণ্টুর মাসিকে একটু বলো বাবা ওস্তাদকে বোঝাবার জন্যে তাহলে হয়তো শঙ্করকে আমার ছেড়ে দিলেও দিতে পারে।'

'মণ্টুর মাসিকে বললে ওস্তাদকে কি বলবেন উনি ?'

'তুমি বললে নিশ্চয়ই বলবে।'

আমার কিন্তু তা মনে হল না। মণ্টুকে রানীদি সত্যিই খুব

ভালোবাসেন আমি দেখেছি। তার মত ছেলেকে এই অভিশপ্ত জগৎ থেকে বাইরে রাখার জন্যে কি রানীদি কখনও চেষ্টা করেন নি? নিশ্চয়ই করেছেন বলে আমার বিশ্বাস। তবু মণ্টু এখানে রয়েছে কি করে! নিশ্চয়ই ওস্তাদ রানীদির কথা রাখে নি। তাই এ অবস্থায় শঙ্করের কথা রানীদি বললে কি ওস্তাদ শুনবে? আমার তো তা মনে হয় না। তবু আমি মায়ের আগ্রহ দেখে তাঁকে বললাম, 'আচ্ছা আমি সুযোগ পেলে মণ্টুর মাসিকে বলে দেখব।'

'সুযোগ পেলে নয় বাবা—সুযোগ একটু করে নিতে হবে তোমায়!'

'আচ্ছা তাই দেখব।'

মা এবার আরও কাছে ঘেঁসে এসে বললেন, 'শঙ্করকেও যেমন আমি বাঁচাতে চাইছি, তেমনি বাঁচাতে চাইছি আমার এই ফুলের মত মেয়েটাকে। ওকে আর এখানে রাখা যাবে না। বসন্তর নজর পড়েছে ওর দিকে।'

'সে কি কথা!' আমি চমকে উঠলাম।

'ভানু এসেছিল। চুপি চুপি সে আমায় খবর দিয়ে গেছে।'

আশ্চর্য হয়ে গেলাম একথা শুনে। মনের মধ্যে রানীদিকে আমার না বলার জন্য যে একটা জড়তা ছিল, সেটা যেন মায়ের এই শেষ খবরটায় কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল। এই যদি ঘটনা হয়, তাহলে তা তো আমাকে বলতেই হবে রানীদিকে। তা না হলে মেয়েটাকে তো আমি বাঁচাতে পারবো না!

বাস্তবিক অদ্ভুত এক জগতে আমি এসে পড়েছি। এরা সমাজের নিম্নস্তরে নেমে গেছে। খুনজখম সবই এরা করে, আবার নারীকেও ভালবাসে, মর্যাদা দেয়। এরাও আর পাঁচজনের মত বাঁচতে চায়, বাঁচাতেও পারে। এই প্রথম আমি সেদিন সন্ধ্যায় গেরুয়া ছাড়লাম। মালকোঁচা মেরে পরলাম সাদা ধুতি আর পাঞ্জাবী, আস্তিন দুটো গুটিয়ে কেডস জুতোর ফিতে বেঁধে সঙ্গে

নিলাম একটি জিনিস, যার কথা আমি আগেই বলেছি। তারপর টর্চ হাতে বেরিয়ে পড়লাম বস্তির সেই গোলকধাঁধার পথে। এখন আমার সব চেনা হয়ে গেছে।

মায়া দাওয়ায় দাঁড়িয়ে বললে, 'ভারি সুন্দর মানিয়েছে কিন্তু আপনাকে।'

'হ্যাঁ, তা মানিয়েছে।' কিন্তু যাব কোথায়? রানীদির বাড়িতে, না ওস্তাদের আড্ডায়?

অন্ধকার পথে ঘুরে-ঘুরে সর্বপ্রথম আমি এলাম রানীদির আস্তানার সন্ধানে। ফাঁকা দাওয়া। দাওয়ার ওপরে ঘরের দরজা—সেখানে উঠে এসে দেখলাম প্রকাণ্ড একটা তালা লাগানো। বেশ বুঝতে পারলাম রানীদি নেই। তবু এদিক-ওদিক টর্চ ফেলে ফেলে দেখতে লাগলাম। মনের মধ্যে রানীদিকে পাবারই আমার আশা। তাই এভাবে দেখতে দেখতেও যদি মিলে যান তিনি। কিন্তু যে মানুষ এখানে নেই এবং ঘরে যাঁর তালা ঝুলছে, সে মানুষকে যে পাওয়া যাবে না, সে কথা আমার আদৌ অজানা নয়। তবু আশার পিছনে মন হয়তো এমনি করেই ছুটেছিল আমার। মন্টুও নেই যে তাকে ডাকব, পাশেও কারোকে দেখছি না যে, একবার খোঁজ নেবো।

দাওয়া থেকে তাই নেমে পড়লাম। এর পর আমার আর বুঝতে বাকি রইল না যে, রানীদি কোথায়। আমি পা ফেলতে লাগলাম সেদিকেই। পথে যেতে যেতে একসঙ্গে অনেক কথা আমার মনে ভিড় করে এলো। নিজে চোখে রানীদিকে আমি দেখেছি যে মূর্তিতে, সেই মূর্তি সমর্থিত হয়েছে শঙ্করের মার কথায়। একদিকে রানীদির প্রতি আমার অকুণ্ঠ বিশ্বাস, আরেকদিকে প্রচণ্ড ঘৃণা, কিন্তু তার পরেও রয়েছে কেমন যেন একটা দুর্নিবার আকর্ষণ তাঁর প্রতি। এ এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব আমার মনে। আমি এই দ্বন্দ্বেরই দোলায় ধাক্কা খেতে খেতে পথ চলতে লাগলাম।

একদিকে আশা আর ভয়, আরেক-দিকে ঘৃণা আর জ্বালা,—যন্ত্রণাদায়ক এই পরিস্থিতির মধ্যে মনে হতে লাগল, কে জানে রানীদিকে আজ আবার আমি কোন্ মূর্তিতে দেখব! এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল শঙ্করের কথাগুলো। তারা আজ দামী মেটালের ওয়াগন লুঠ করবে—সেই লুঠের পর কোন-না-কোন ধরনের মহফিল তাদের চলবেই এবং সেই মহফিলে থাকতে পারে অনেকেই—পুলিশের কর্তাব্যক্তি, রেলের কোন বড়কর্তা, পাগড়ি থেকে গান্ধী-টুপি সবরকমই। আর রানীদি? রানীদি সেখানে মক্ষীরানীর মত সকলের কামনার বহ্নিশিখায় যোগাবেন ইন্ধন। উঃ, ভাবতেও যেন কেমন লাগে।

এগিয়ে চললাম পথে। আজ রানীদিকে আমায় পেতে হবে—পেতে হবে এইজন্য নয় যে, তাঁর প্রতি আমার মনের দুর্বলতা দিয়ে তাঁকে সম্মান দেখাতে হবে বলে, বরং আজ তাঁকে আমি পেতে চাই একটি মাতৃহৃদয়ের আকুল প্রচেষ্টায় সাহায্যার্থিনী রূপে। তাঁর ছেলে গেছে। মেয়েও যাবার পথে। আমার আজ তারই জন্য এই অন্ধকার পথে এগিয়ে যাওয়া। জানি না, আমার এই মিশন সার্থক হবে কি না তবে আমার মনের কাছে এই সান্ত্বনা থাকবে আমি তো শঙ্করের মায়ের জন্য, শঙ্কর আর তার বোন মায়ার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করি নি।

কিছুক্ষণ পরে এসে দাঁড়ালাম ওস্তাদের সেই আড্ডার সামনে। আজ জগদীশ নেই। সে হেঁড়ে গলায় টুনটুনিকে ডেকে বলবে না—'জবাকুসুমটা নিয়ে আয় তো।' এ যেন আমার একটা মস্তবড় স্বস্তি। উঃ কি বীভৎস না এই ব্যাপারটা। বলা নেই, কওয়া নেই চট্ করে একটা লোককে ক্লোরোফর্ম করে অজ্ঞান করে দেবে, তারপর তার ভাগ্যে যে কি ঘটবে তা সে জানতেও পারবে না। জানি, নিজেদের অবস্থানটাকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যেই ওস্তাদ ও তার সাগরেদ বসন্ত প্রভৃতি এই ব্যবস্থাটা চালু করে রেখেছে কিন্তু ওদের

নিজেদের নিরাপত্তার জন্য এই নির্দয় ব্যবস্থা কি কোন রকমেও সমর্থন করা যায় ? তাই ব্যাপারটার প্রতি আমার মনে ভয়ানক একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। বিশেষ করে শঙ্করের মাকে সেই শঙ্করের জেল থেকে পালিয়ে আসার দিনটাতে যেভাবে ক্লোরোফর্ম করা হয়েছিল এবং আমার জীবনকেও যেভাবে প্রায় বিপন্ন করে তোলা হয়েছিল, সেদিনকার সেই ঘটনাগুলো আমি কোনরকমেই ভুলতে পারি নি। আড্ডার সামনে দাঁড়িয়ে আমি একবার এদিক-ওদিক দেখলাম। টর্চ জ্বালব, কি জ্বালব না এই সবও ভাবলাম। হঠাৎ দেখলাম, খচাং করে সুইচ টেপার শব্দ হল। মুহূর্তে জানালার ধারে দেখতে পেলাম একজোড়া সন্ধানী চোখ।

ঐ সন্ধানী চোখ দু'টোকে আমি চিনি। কিন্তু আপাতত আমার এর কাছে কোন প্রয়োজন নেই। আমি দরজাটা ঠেলে ঢুকে পড়লাম ভিতরে। দু'দিকের বারান্দায় সেই হাসপাতালের দৃশ্য। আলো জ্বলছে, তীব্র আলো। তিন-চারটে বেডে তিন-চারজন পেসেন্ট। বাকি বেডগুলো শূন্য। একদিকে সেই ডাক্তার আর নার্স সাধারণ পোশাকে দু'খানা চেয়ারে বসে বসে গল্প করছে। আমাকে ঢুকতে দেখেই ওরা সচকিত হয়ে উঠল।

ডাক্তার বলে উঠল, 'কে—এ ?'

নার্সের মুখেও সেই একই ভাব। সেই যেদিন আমি প্রথম এখানে এসেছিলাম, সেদিন ডাক্তার ছিল এ্যাপ্রন আর মাস্কে আচ্ছাদিত, তাকে আমি সম্পূর্ণ চিনতে পারি নি, কেবল মনে হয়েছিল লোকটাকে যেন কোথায় দেখেছি-দেখেছি। আজ তাকে সাধারণ পোশাকে দেখে আমার আর চিনতে বাকি রইল না।

সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, 'ডাক্তার মুখার্জী ?'

ডাক্তার মুখার্জী চমকে উঠলেন। নার্সটি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ডাক্তার মুখার্জীর দিকে তাকালো। মুখার্জী আমার দিকে ভীত-সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'আপনি আমায় চেনেন ?'

'চিনি বৈকি।'

ডাক্তার ভ্রূ কুঞ্চিত করে আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'কি করে বলুন তো!'

বললাম, 'আপনি তো আমাদের সাব-ডিভিশনাল হসপিটাল থেকে সদর হাসপাতালে গেলেন—তারপর সেখান থেকে এলেন রাইটার্সে—'

ডাক্তার চিন্তিতভাবে নিজের অতীতকে হাতড়াতে লাগলেন বোধকরি। আমি তাঁর সংকটাপন্ন ভাবখানা দেখে বলে উঠলাম, 'আপনি ঘাবড়াবেন না। আপনার অনেক কথাই আমি জানি।'

ডাক্তার চাপাগলায় বলে উঠলেন, 'আপনি কি গোয়েন্দা বিভাগের লোক?'

'না।'

'তবে?'

'ও সব কথা রাখুন', আমি বললাম, 'আমার একটা কথার আপনি জবাব দেবেন কি?'

ডাক্তার বিরক্তিভরে বললেন, 'কি কথা?'

'আচ্ছা এই মেয়েটির নাম কি বনানী?'

'সে খোঁজে আপনার দরকার কি?'

'দরকার কিছুতেই নেই, তবে আমি জানি না বলেই জিজ্ঞাসা করছি আপনাকে।'

কোন গভীর রহস্যে অভিভূত হয়ে গেলে মানুষ যেমন অস্ফুট স্বরে সত্যি কথাটা বলে ফেলে, ঠিক তেমনি করে ডাক্তার কিছু বলার আগে মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'হ্যাঁ'।

সবকিছু আমার হিসাবে মিলে গেল। ডাক্তার বললেন, বনানীকেও তাহলে আপনি চেনেন?'

বললাম, 'সে কথার আগে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আপনার সম্বন্ধে আমার কিছুই অজানা নেই।'

'কি বলতে চান আপনি ?'

'আমি যা বলতে চাই তা আপনি জানেন।'

এবার ডাক্তার আমাকে ভয় দেখাতে শুরু করলেন। বললেন, 'জানেন আপনি কোথায় এসেছেন ?'

'জানি।'

রীতিমত উত্তেজিতভাবে ডাক্তার বললেন, 'জানেন ?'

'হ্যাঁ, জানি।'

'ঠাট্টা করছেন ?'

'ঠাট্টা কাকে বলছেন ? আপনি মনে করছেন ডক্টর যে, আমি এখানে কোনোদিন আসি নি ?'

'এসেছেন ?'

'হ্যাঁ—মনে করে দেখুন না!'

'মনে করে দেখব, ডাক্তার চটে উঠে বললেন, 'গুল্ মারবার জায়গা পান নি ?'

আমি একটু হাসলাম। ডাক্তার আরও চটে গেলেন। চটে গিযে বললেন, 'আপনি সত্যি করে বলুন আপনি কে—আপনি গোয়েন্দা, না অন্য কিছু ? জানতে পারলে কোথায় এসেছেন তা আপনাকে একবার বুঝিয়ে দিই।'

কি করে বোঝাবেন ?'

'আপনাকে আমি গুলী করব', ডাক্তার ছুটে একটা টেবিলের কাছে গেলেন। আমিও আমার ছ'-ঘরা রিভলভারটা বের করে বললাম, 'তার আগে আমার ট্রিগার শুধু একটিবার ক্লিক্ করে উঠবে, ক্যামেরার একটা ক্লোজ-শটের মত।'

ডাক্তার ঘুরে আমার দিকে ভয়চকিত দৃষ্টিতে তাকালেন। ভয়ে বনানীরও চোখ দু'টো একেবারে স্থির অচঞ্চল। তারপর আমি বললাম, 'ডক্টর উত্তেজিত হবেন না। এর আগে আমি এখানে এসেছি। সেদিন আমি এসেছিলাম গেরুয়া পরে। তাই হয়তো

আমায় চিনতে পারেন নি। এখানকার নাড়ী-নক্ষত্র সবই আমার জানা - আর আপনি হয়তো জানেন না, এখানে যিনি কুইন অফ দি ডেন তিনি আমার কে?'

'কে তিনি?'

'তিনি আমার অত্যন্ত আপনজন।'

আবার ডাক্তার ও বনানী মুখ চাওয়া-চায়ি করলেন। তারপর যেন হাঁফ ছেড়ে ডাক্তার বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, এখন আমার মনে পড়ছে আপনি একদিন এসেছিলেন বটে, সেদিন ছিল আপনার সাধুর বেশ—পিস্তলও হাতে ছিল আপনার। যাক্, এখন আপনি বাঁচালেন—এখন আপনাকে আমরা মনে করতে পারি you are one of us—

'ঠিক যত সহজে আপনি আমাকে ওয়ান অফ আস্ বললেন', বললাম, 'ঠিক তত সহজে মেনে নেবেন না, তাতে বিপদ হতে পারে?'

ডাক্তার বললেন, 'হঠাৎ এখানে কি মনে করে এলেন?'

'কাজ আছে।'

'বসবেন এখানে?'

'ঘুরে আসি তারপর।'

অতঃপর আমি উঠোনমত জায়গাটুকু পার হয়ে সোজা সামনের সিঁড়ি ধরলাম। ওপরে উঠতেই নানারকম কণ্ঠস্বর শুনতে লাগলাম। মাতালের হুল্লোড়। দরজা খুলতে আমার সাহস হল না। যদি রানীদিকে সেইরকম বেহেড অবস্থায় দেখি—যদি দেখি সেই নর্তকীর বেশে সকলের মন যুগিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। কিন্তু পরক্ষণেই চেতনার মধ্য দিয়ে বুঝলাম কোন বাদ্যযন্ত্র বা ঘুঙুরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না এবং তা যখন হচ্ছে না, তখন নিশ্চয়ই নাচ-গানে রানীদি মত্ত নেই, তাহলে, তাহলে—আমার বুকখানা কেমন যেন কেঁপে উঠল! তবে কি নারীমাংস-লোভী সমাজের বড়কর্তারা সব মদের

পিপের মত রানীদিকে নিয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে? ছিঃ, ছিঃ, এসব কথাও আমাকে এই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবতে হবে? এই অভিশপ্ত জগতে এসে পড়ে আমারও মানসিক স্তর কি এই বিকৃত রুচির মধ্যে হাবুডুবু খাবে? এর থেকে উর্ধ্বে উঠে আমি কি অন্য কিছু ভাবতে পারব না? সেই মানসিক স্বাস্থ্য কি আমি এমনি করে চিরদিনের মত হারিয়ে ফেলেছি?

মাতালের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'বাব্বা, ফেয়ারলি প্লেস হলেও তো দু-একটা কাঁধকাটা ব্লাউজের সঙ্গে ইণ্টারভিউ হত। এ-যে একেবারে সা-হা-রা...'

আরও কণ্ঠস্বর, 'সা-হা-রা কি বাব্বাঃ, এ যে স-র্ব-হা-রা!'

দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, পদস্থ পুলিশ-অফিসারের পোশাকে একটা লোক। পাশে তার বুশসার্ট পরিহিত আরেকটা লোক। বুশসার্ট বলছে, 'খামোকাই লাহিড়ী তুমি ডি-সি—'

'খামোকাই তুমি শালা জি-এমের পি-এ।'

'ক্যা—নো?'

'তুমি শা-লা স্টেনো রাখো না?'

'গ্যাংগলির পাখী উড়ে যাবে, তা কি জানতাম? তা হলে শালা না হয় অন্য ব্যবস্থা করতাম...'

দরজা আরেকটু ফাঁক করে দেখলাম, ওস্তাদ সেই সেদিনকার সোফাটায় বসে রয়েছে। সামনের ছোট্ট টেবিলটায় মদের বোতল আর গ্লাস। সেখান থেকে সে বলে উঠ্‌ল, 'এই শালা শাট আপ!'

জি-এমের পি-এ বলে উঠল, 'ফেয়ারলি প্লেস হলে শালা শাট আপ কাকে বলে দেখিয়ে দিতাম। সিকিউরিটির দুই রদ্দায় গর্দান তোমার একেবারে চিচিং ফাঁক হয়ে যেত।'

লাহিড়ী বললে, 'আর লালবাজার হলে—'

মেঝেয় শায়িত গান্ধীটুপি পরিহিত একটি লোক মত্ত অবস্থায় উঠে বসে বললে, 'তোমরা রুলের গুঁতো দি-তে বা-ওয়া। তিরিশ

সালের সি-ডি'র সময়ে—খাওয়া মনে আছে। বোল্ শালা গ্যাণ্ডি বোল্ বলে পাছায় সার্জেণ্টের রুলের গোঁত্তা…'

পদস্থ পুলিশ অফিসার বল্‌লে, 'তাই তো স্যার, আজ রাইটার্সে বস্‌তে পেরেছেন—না, স্যার ?'

'তা বটে, কিন্তু এ যে সব ডা-রা-ই মেরে যাচ্ছে। এর কি করবে তোমরা ? শালার নাচ নেই, গান নেই, গাঙ্‌ুলীর সে মেয়ে-মানুষ নেই—'

অবাক হয়ে শুনছিলাম ওদের কথা। আমি এই নরককুণ্ড দেখতে আসি নি। দেশের প্রকৃত এই চেহারায় একদিকে যেমন নিদারুণ আঘাত পেলাম মনে মনে, তেমনি খুশিও হলাম অপরিমেয় আনন্দে। রানীদি নেই—আমার স্বপ্ন দিয়ে গড়া রানীদি, আমার শৈশব জীবনের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্য দিয়ে স্পর্শে, ঘ্রাণে, স্নেহে, মমতায় যে রানীদিকে আমি পেয়েছি, সেই রানীদি নেই এই নরককুণ্ডে। এ যে আমার কাছে কত বড় একটা স্বস্তির ব্যাপার তা আমি ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। মনে মনে বলে উঠলাম, রানীদি ! তুমি আমায় বাঁচালে আজ। সেদিন তোমাকে যে মূর্তিতে দেখে গিয়েছি আজ তারপর কত ভয়ে ভয়ে তোমার ওপর সব ভরসা ছেড়ে দিয়ে আমি এখানে এসেছিলাম। তোমাকে চিরদিনের মত হারিয়েছি—এ জন্যেই তোমাকে আরও একবার হারাতে এসেছিলাম। কিন্তু তুমি নেই এখানে—এই না-থাকাই তোমার জীবনে যেন সত্যি হয়।

ওস্তাদের ঘরের দরজা খুলে আমার ভিতরে যাবার কোন প্রয়োজন নেই। ফিরে দাঁড়ালাম আমি। সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠোনে এসে পড়তেই ডাক্তার এগিয়ে এসে বললেন, 'বসবেন নাকি একটু ?'

বললাম, 'না ডক্টর, আমাকে যেতে হবে।'

'কিন্তু একটা কথা ছিল।'

'কি বলুন?'

'আপনি কি আমার সব ঘটনা জানেন, সেই যখন আমি সাব-ডিভিশনাল হসপিটালে ছিলাম?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি মনে করেন সে সব সত্যি?'

'কি বলছেন ডক্টর,' রীতিমত উত্তেজিতভাবে আমি বললাম, 'সে ঘটনা কি ভোলা যায়?'

বস্তুতঃ ডাক্তার মুখার্জীর সে কাহিনী শুধু আমি কেন, অনেকেই ভুলে যান নি। ভুলতে কেউ কোনদিন পারবেও না। লোকটা কতবড় ক্রিমিন্যাল তা তাঁকে এখানে দেখলে তো যে কেউই বুঝতে পারবে—তা ছাড়াও সে কতখানি ভয়াবহ ক্রিমিন্যাল, তা তাঁর অতীত যে জানে, সেই বলতে পারবে। সাব-ডিভিশনাল হসপিটালের চার্জ নিয়ে যেদিন লোকটি এলেন সেই দিনই তিনি অপাংগে একবার শুধু দেখে নিয়েছিলেন শান্তাকে। শান্তা দরিদ্র-ঘরের স্বামীহারা মেয়ে, সঙ্গে তার বছর পাঁচেকের একটি কন্যা সন্তান ছাড়া আর কেউ ছিল না। ডাক্তার মুখার্জীর আগে যিনি এই হাসপাতালের চার্জে ছিলেন, সেই ডাক্তার ধর ছিলেন অত্যন্ত হৃদয়বান মানুষ। শান্তাকে দয়াপরবশ হয়ে তিনি নার্সিং শেখান। একটু-আধটু লেখাপড়া জানতো শান্তা—তাতেই তিনি তাকে ধরে ধরে ওষুধপত্র, প্রেসক্রিপশন প্রভৃতি পড়িয়ে-সড়িয়ে তৈরি করে নিয়েছিলেন এবং হাসপাতালে তাকে তিনি একটা চাকরিও দিয়েছিলেন। তিনি চলে যাবার পর ডাক্তার মুখার্জীর হাতে পড়ল শান্তা।

হাসপাতালেরই একটা কোয়ার্টারে পাঁচ বছরের শিশুকন্যাটিকে নিয়ে থাকত শান্তা। ডাক্তার মুখার্জী ক্রমশঃ ক্রমশঃ শান্তাকে ফাঁদে ফেলতে লাগলেন। শেষকালে এমন হল যে, শান্তার আর কোন পথ রইল না মুক্তির। শান্তা সাব-ডিভিশনাল টাউনেরই মেয়ে।

পরিচিত সবারই কাছে। শিশুকন্যার পরবর্তী ধাপে তার জীবনে নেমে আসবে বোধকরি আবার কোন সন্তান। চারদিকে কানাকানি, চাপা গুঞ্জন! শান্তার মনে হল পৃথিবীর সবাই বুঝি তার দিকে আঙুল দেখিয়ে কি সব বলছে। প্রথম দিকে ছিল ভয়, তারপর তার নিজের ওপর এল ধিক্কার।

ডাক্তার মুখার্জীকে শান্তা বললে, 'অন্ততঃ তুমি বিয়ে করে আমাকে এ লজ্জার হাত থেকে মুক্তি দাও।'

ডাক্তার নিজে বিবাহিত। তখনও দেশে একাধিক বিবাহ প্রচলিত ছিল। কিন্তু ডাক্তারের সাহসে কুলোল না। তিনি হচ্ছে-হবে করে স্তোক দিতে লাগলেন শান্তাকে। কিন্তু শান্তা অস্থির হয়ে পড়ল। সবচেয়ে তার জীবনে তখন বাধা হয়ে দাঁড়ালো তার শিশুকন্যা। মেয়েটা যদি না থাকত তা হলে সে জীবনটাকে নিস্তব্ধ করে দিতো ঘরের কড়িতে ঝুলে কিংবা আফিম বা কোন ডাক্তারী ওষুধ খেয়ে। কিন্তু মেয়েটা হয়েছিল তার পায়ের বেড়ি। তার জন্যে তার মরার পথও রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল একেবারে।

অবশেষে মাস পাঁচেক যেতে-না-যেতে একদিন দেখা গেল তার কোয়ার্টারে সে মরে পড়ে আছে। ডাক্তার মুখার্জী যথারীতি পুলিশে রিপোর্ট করলেন। পোস্ট মর্টেম হল তাঁর হাতেই। পাকস্থলী থেকে পাওয়া গেল পটাসিয়াম সাইনাইড।

কি সাঙ্ঘাতিক ঘটনা! যে তার শিশুকন্যার জন্য মরতে পারে না, সে পটাসিয়াম সাইনাইড খেয়ে মরতে যাবে কেন? তা ছাড়া ঐ মারাত্মক দ্রব্যটি সে পাবেই বা কোথায়? সে তো থাকে ডাক্তারের নিজস্ব জিম্মায়। তা হলে তা হলে আর কি—যে লোক নিজের আত্মজ ভ্রূণকে নিজের হাতে পোস্ট মর্টেম করতে পারেন, যে লোক সেই রিপোর্ট পুলিশকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে নির্দোষ সাজতে পারেন, সে লোক কোন ওষুধের সঙ্গে যে সাইনাইড খাওয়াতে পারেন না শান্তাকে, এ কথা কেমন করে লোকে মেনে নেবে? তাই গুঞ্জন

উঠেছিল শহরময়, চাঞ্চল্যও দেখা দিয়েছিল কিছু কিছু কিন্তু ডিপার্ট-মেণ্টাল বস্ তাঁকে রক্ষা করেছিলেন সে যাত্রা।

তবে বলতে হবে ডাক্তার মুখার্জী নিমকহারাম নন। শান্তার সেই শিশুকন্যাকে আজ বছর বাইশ-তেইশ ধরে তিনিই তাঁর কাছে রেখে দিয়েছেন। এখন সে মেয়ে দৃপ্ত যৌবনের অধিকারিণী। সেই মেয়েকে দয়াদাক্ষিণ্য, স্নেহ-মমতা দেখানোয় এবং তার দায়িত্বভার বহন করায় বহির্জগতের যে স্বীকৃতি, তাতে ডাক্তার মুখার্জী যে একজন মহৎ ব্যক্তি, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

হয়তো এই মহত্ত্বের জন্যই তিনি সাব-ডিভিশনাল হাসপাতাল থেকে সদর হাসপাতাল, তারপর সেখান থেকে রাইটার্সে উন্নীত হয়েছেন কিন্তু আমি তো জানি কি রকম মহৎ এবং এখানে এই ওস্তাদের আড্ডায় কি মহৎ কাজই না তিনি করেন। রাইটার্সে আমি অনেক মহৎ ডাক্তারকে দেখেছি, প্রাণভরে তাঁদের আমি প্রণাম জানাই কিন্তু পাশাপাশি সেখানে ডাক্তার মুখার্জীর মত একজন ক্রিমিন্যালকেও দেখি এবং তাতেই মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে— ভগবান, এদিকে কি কেউ নজর দেবে না ?

আমাকে খানিকটা ক্রুদ্ধ ও চিন্তান্বিত দেখে ডাক্তার মুখার্জী বললেন, 'তা হলে বনানীর সম্বন্ধেও আপনি অনেক কিছু ধারণা করেন, বলুন ?'

'হ্যাঁ, করি,' বলে আমি বেরিয়ে পড়লাম।

কি আশ্চর্য! হঠাৎ দেখি তার ঘরের একফালি আলোতে পথে দাঁড়িয়ে রয়েছে টুনটুনি—সেই অপরূপ সুন্দরী মেয়ে টুনটুনি। সে বললে, 'শুনুন—'

বললাম, 'কি ব্যাপার, জবাকুসুম দেবে নাকি ?'

'না না,' টুনটুনি বললে, 'ওটা আমার কাজ নয়। আমি নেহাৎ দায়ে পড়েই দাঁড়িয়ে আছি—'

'বলো কি বল্‌বে ?'

'আপনি তো সেই সন্ন্যাসী ?'

'কই, না তো !'

'হ্যাঁ, আজ আপনি সাদা কাপড়-জামা পরলেও সেদিন আপনি সন্ন্যাসী সেজেই এসেছিলেন।'

'তোমার মনে আছে দেখছি—যাক্, এখন কি বলবে বলো !'

'আমার একটা উপকার করতে হবে।'

'কি উপকার ?'

'আমার ভাই গুলীতে জখম হয়ে এখানেই কোথাও আছে। আপনাকে একটু খোঁজ করে দেখতে হবে।'

'তোমার ভাই ? কে তোমার ভাই—নাম কি ভায়ের ?'

'মণ্টু—'

'মণ্টু তোমার ভাই ?' আমি বিস্মিত হয়ে বললাম।

'মাসিও নেই এখানে।'

'কে তোমার মাসি ?'

'ঐ যে ভাই যেখানে থাকত—বৈষ্ণবীমাসি। তিনিই আমার মাসি।'

আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, এখানে কোথা দিয়ে কার সঙ্গে কি সম্পর্ক বেরিয়ে পড়ছে। আগেই এ-কথা জানি যে মণ্টু আজ শঙ্করদের সঙ্গে যাবে ওয়াগন লুঠ করতে। তবে কি সেখানেই সে গুলীবিদ্ধ হয়েছে ? হবেও বা। নইলে টুনটুনি এ-কথা বলবে কেন ?

কিন্তু এত সকাল সকাল অর্থাৎ প্রথম রাতের দিকেই যে পার্শেল এক্সপ্রেস থেকে দামী মেটালের ওয়াগন লুঠ হবে, এরকম তো কোন স্থির ছিল না। শঙ্কর আমাকে বলে গিয়েছিল আজ রাতের মধ্যেই কাজ সাফ করতে হবে। এ সমস্ত অপারেশনের দায়িত্ব নাকি তারই ওপর বিশেষ করে ছিল। তাই যদি হয় তাহলে এখন

বড়জোর রাত ন'টা হবে, এরই মধ্যে কি করে সেই অপারেশনের কাজ শুরু হতে পারে ?

যাই হোক. টুনটুনি যখন খবর জেনেছে যে, তার ভাই মণ্টু আহত হয়েছে তখন নিশ্চয়ই সেই অপারেশন হয়েছে এবং সেখানে গোলাগুলী কিছু চলেছে—যার ফলে মণ্টু আহত হয়েছে।

আমি টুনটুনিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু মণ্টু যে গুলীতে আহত হয়েছে—এ খবর তুমি পেলে কার কাছ থেকে ?'

'বসন্তকাকার কাছ থেকে।'

'বসন্তকে তোমরা কাকা বলো ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন বলো তো ?'

'কেন তা বলতে পারব না, তবে ছেলেবেলা থেকেই বলে আসছি।'

'তোমাকে সোজাসুজি সে খবরটা দিলে ?'

'হ্যাঁ এদিক দিয়ে যেতে যেতে আমাকে রাস্তা থেকে হেঁকে বলে গেল।'

'কিন্তু মণ্টু কোথায় আছে তা ঠিক করে বলে গেল না ?'

'না ! বললে শুধু—ভ্যাখ গিয়ে মণ্টু ওখানে গুলী খেয়ে ছটফট করছে।'

'ওখানে বলতে বসন্ত কোন্ জায়গাটাকে বোঝাতে চাইল আর তোমারই বা জায়গা সম্বন্ধে কি ধারণা হল ?'

'আমার মনে হল বসন্তকাকার ওখানেই হবে।'

'তাহলে ওখানটা দেখে আসি আগে', বললাম, 'কি বলো ?'

'আমি আপনার সঙ্গে যাব।'

বললাম. 'ওখানে গিয়ে আমি আগে দেখেই আসি না—তারপর তুমি যাবে ? এখন ধরো যদি মণ্টু ওখানে না থাকে তাহলে তো ফিরে আসতে হবে ?'

'কিন্তু আমার মন বলছে যে ওখানেই তাকে পাবো', বলে টুনটুনি আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকালো। ভাইয়ের জন্য উদ্বেগে এই করুণ দৃষ্টির আবেদন আমাকে মানতেই হল। বললাম, 'তোমার মন যখন বলছে তখন আমি আর তোমাকে বাধা দেবো না, তুমি চল তাহলে—'

খানিকটা গিয়েছি কি না গিয়েছি হঠাৎ দেখলাম শঙ্কর আর ভানু দু'জনে একটা স্ট্রেচারে করে কাকে যেন এদিকেই নিয়ে আসছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাকে নিয়ে যাচ্ছো তোমরা?'

শঙ্কর বলে উঠল, 'ও আপনি?' সম্ভবতঃ সে আমার সাদা পোশাক দেখে বিস্মিত হয়েছিল। ঠিক সেইরকম বিস্মিত হয়ে ভানুও বললে, 'দাদামণি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু কে ভাই স্ট্রেচারে?'

'মন্টু!'

টুনটুনি চীৎকার করে উঠল, 'মন্টু!'

মন্টু স্ট্রেচার থেকে গোঙাতে গোঙাতে বলে উঠল, 'দি—দি, দি—দি।'

শঙ্কর বললে, 'চুপ কর মন্টু। আমাদের আস্তানার হাসপাতালে আমরা এসে পড়েছি। অপারেশন করে বুলেটটা বের করে ফেললেই বেঁচে যাবি।'

টুনটুনি বলে উঠল, 'বেঁচে যাবে মন্টু, বেঁচে যাবে শঙ্করদা?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ বাঁচবে, নিশ্চয়ই বাঁচবে।'

ভানু বললে, 'শালারা যে অমন সন্ধ্যে থেকে ওৎ পেতে বসে থাকবে তা তো ভাবি নি—তা না হলে একটু সাবধান হয়েই যেতুম আমরা।'

শঙ্কর বললে, 'শালা জগদীশের জন্যেই আমাদের এই বিপদটা ঘটল।'

পরক্ষণেই ওস্তাদের আস্তানার মধ্যে ডাক্তার মুখার্জীর

হেপাজতে মণ্টুকে নিয়ে আসা হল। আমি ও টুনটুনি দু'জনে সেখানে এলাম। স্ট্রেচার নামাতেই দেখলাম মণ্টুর ডান পায়ের উরুর কাছ থেকে চাপ চাপ রক্ত বেরিয়ে আসছে। টুনটুনি মণ্টুর ওপরে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলে উঠল, 'মণ্টু—ওরে মণ্টু, তোর একি হল রে?'

মণ্টু বলে উঠল, দিদি—আমি আর বাঁচব না রে!'

ডাক্তার মুখার্জী বললেন, 'কেন বাঁচবে না? নিশ্চয়ই বাঁচবে। বনানী—'

বনানী ডাক্তারের কথায় বুঝতে পারল এর পর কি করতে হবে। সে অস্ত্রোপচারের জন্যে ব্যবস্থা করতে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মণ্টুকে ধরাধরি করে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হল। সেই ক্লোরোফর্ম—টুনটুনি এতদিন ধরে যে ক্লোরোফর্ম জগদীশকে এনে দিয়েছে আর যা দিয়ে জগদীশ শত শত মানুষকে সংজ্ঞাহীন করে তার করণীয় কাজগুলি সম্পন্ন করেছে—সেই ক্লোরোফর্ম দিয়ে অভিজ্ঞ এ্যানাস্থিস্টের মত বনানী মণ্টুকে সংজ্ঞাহীন করে ফেলল। ডাক্তার মুখার্জী মণ্টুর ক্ষতস্থানে অস্ত্রোপচার করতে লাগলেন।

টুনটুনি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে সেখানে বসে রইল। সেখান থেকে বেরুলেই পাশে তার ঘর। ইচ্ছে করলেই সে ঘরে বসে সব কিছু জানতে পারত. কিন্তু তার মনে কেমন যেন একটা বিশ্বাস। এখানে থাকলেই সে মণ্টুর সম্পর্কে সবকিছু ভালভাবে জানতে পারবে। তাছাড়া তার আরও কেমন যেন বিশ্বাস—সে এখানে থাকলে তবেই হয়তো মণ্টু বেঁচে উঠবে। কাজেই সে গেল না।

শঙ্করকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'সেই তুমি আমায় বলে গেলে—তারপর কি করে এরকম ঘটনা ঘটল?'

শঙ্কর কেমন যেন চিন্তিত হয়ে বললে, 'যদ্দুর মনে হচ্ছে জগদীশের জন্যেই এরকমটা ঘটেছে।'

'মানে ?'

'মানে আর কি', শঙ্কর বলতে লাগল. সম্ভবতঃ শালা একরার করেছে পুলিশের কাছে।'

'সে কোথায় ?'

'শালা পালিয়েছে।'

'ওস্তাদের সাগরেদ সেখানে ছিল না।'

'ছিল, কিন্তু তাকে তো পালিয়ে আসতে হবে। সময় পায় নি সে—তা না হলে জগদীশ সেইখানেই শেষ হয়ে যেত।'

টুনটুনি দু'চোখ বিস্ফারিত করে জগদীশের কথা শুনছিল। সেই জগদীশ—যে জগদীশের হেপাজতে টুনটুনি ছেলেবেলা থেকে কাটিয়েছে—সেই জগদীশ মণ্টুর গুলী লাগার কারণ। ভাবতেও যেন সে কেমন শিউরে উঠল। জগদীশ এমনিতেই লোক মন্দ নয়। অজস্র রূপ আর দুরন্ত আশা নিয়ে টুনটুনি এই নরককুণ্ডে জগদীশের কাছে বাস করেছে—জগদীশ কিন্তু ভুলেও কোনদিন কোনরকম লালসার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায় নি বরং বলা যেতে পারে ছোটবোনকে মানুষ যেমন সস্নেহে লালন-পালন করে ঠিক তেমনি করেই সে তাকে লালন-পালন করেছে। সেজন্য জগদীশের ওপর তার মনে কেমন একটা বিশ্বাসও আছে। কিন্তু যখন সে শুনল যে, সেই জগদীশ একরার করেছে পুলিশের কাছে তখন মনটা তার এক রকম ঘৃণা ও বিরক্তিতে ভরে উঠল। সেই ঘৃণা ও বিরক্তি আরও তীব্র হয়ে উঠল তার মনে—যখন নাকি তারই জন্যে মণ্টুর এই অবস্থা হয়েছে একথা সে বুঝতে পারল।

কিছুক্ষণ পরেই ডাক্তার মুখার্জী বেরিয়ে এলেন অপারেশন থিয়েটার থেকে। হাতে তাঁর একটা একজস্টেড বুলেট। তিনি এসে সবাইকে দেখালেন।

শঙ্কর বললে, 'শালারা যদি আরেকটু ওপরে তাক করত মণ্টুর তাহলে—'

ডাক্তার মুখার্জী বললেন, 'একেবারে স্পটডেথ হত ছেলেটার!'

টুনটুনি শিউরে উঠে চোখ বুজে ফেললে। শঙ্কর বললে, "শালারা অন্ধকারে বোধহয় ঠাওর করতে পারে নি।"

ভানু বললে, 'কিন্তু ওৎটা পেতেছিল সাংঘাতিক জায়গায়।'

'হ্যাঁ রেলওয়ে ব্রীজের ঠিক পাশেই। আমরা সবাই যদি ব্রীজ পার হয়ে যেতুম তাহলে আর ফেরার রাস্তা থাকত না। ছুটতে গেলে হয় আমরা ব্রীজের তলার রাস্তায় পড়ে মরতুম, নয়তো ঝাঁক ঝাঁক গুলীর মুখে একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতুম।'

ডাক্তার মুখার্জী এবার বললেন, 'মণ্টু বুঝি এগিয়ে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ', শঙ্কর বললে, 'সেইজন্যেই তো ওর ওপর দিয়েই ঝড়টা গেল—'

এবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু তোমাদের ইনফরমেশনের সোর্স যা বলেছিল তাতে তো ওপর থেকে এরকমভাবে ফোর্স পাঠানোর কথা নয় শঙ্কর।'

'দাদা', শঙ্কর বললে, সোর্স তো ঠিকই ছিল কিন্তু ভেতর থেকে যদি একরার করে কেউ তাহলে আর কি হবে। তাছাড়া সব পুলিশ বা রেলের সব কর্তারাই তো আর আমাদের বন্ধু নয়—অন্য লোকও তো আছে। তারা এতবড় একটা সুযোগ ছেড়ে দেবে কেন?'

আমি বললাম, 'ওস্তাদের ঘরে তো দেখলাম সব কর্তারাই রয়েছে। তাদের গিয়ে বলো এসব ঘটনা ঘটল কেন?'

শঙ্কর বললে, 'শালারা এখন হয়তো বেহেড মাতাল—কোন কথাই বুঝতে পারবে না, খামোক হাল্লা করবে।'

বাস্তবিক এই ওদের চরিত্র। ওদের কাছে দেশ নেই, জাতি নেই, জাতীয় স্বার্থ নেই—ওরা দেশের মন্ত্রী, বড় পুলিশ অফিসার, রেলের বড়কর্তা—লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করা, মদ আর মেয়েমানুষে ডুবে থাকাই ওদের কাছে স্বদেশপ্রেম হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশাসনযন্ত্রকে ওরা স্ব-স্ব চক্রের স্বার্থে ব্যবহার করে গোটা দেশকে

রসাতলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সংবাদপত্রে ওদেরই ছবি ছাপা হয়, ওদেরই কর্মদক্ষতার বিবরণ প্রকাশ করা হয়—কত মহৎ ব্যক্তি ওরা নানারকম ভাষার কারসাজিতে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা হয়। অথচ আইন-আদালতে কমিশনে, তদন্তে অনেক সময়েই প্রকাশিত হয়েছে—ওরা কোন্ ধরনের মানুষ। তাছাড়া ওস্তাদের ঘরে তো ওদের স্বরূপ দেখতে আমার বাকি নেই।

টুনটুনি বলে উঠল, 'ডাক্তারবাবু মণ্টুকে এখন কেমন দেখলেন —বাঁচবে তো মণ্টু আমার ?'

'মণ্টুর তো আর কোন ভয় নেই, সে বাঁচবে না কেন', ডাক্তার মুখার্জী আরও যেন কি বলতে গিয়ে বলে উঠলেন, 'তবে—'

ভয়চকিত কণ্ঠস্বরে টুনটুনি বলে উঠল 'তবে কি ডাক্তারবাবু ?'

'তবে', ডাক্তার মুখার্জী বললেন, 'কিছু রক্ত দিতে হবে পেসেণ্টকে—কেন না, অনেকক্ষণ ধরে অনেক রক্ত ওর শরীর থেকে বেরিয়ে গেছে।'

শঙ্কর বললে, 'সে বোতল দুই রক্ত কিনে আনলেই চলবে।'

'তাহলে যাও না শঙ্করদা', টুনটুনি বলে উঠল।

ডাক্তার মুখার্জী বললেন, 'এমনি গেলে তো হবে না। মেডিকেল কলেজে আমার এক ডাক্তার বন্ধু আছে, তাকে আমি চিঠি লিখে দেবো, তবে পাবে।'

শঙ্কর বললে, 'তাহলে লিখে দিন—'

'দেবো', ডাক্তার চিন্তিতভাবে বললেন, 'কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হবে না। কেন না, তাতে দেরি হবে কিছু। অথচ রক্তটা আমার এখনই দরকার।'

শঙ্কর বললে, 'এখনই দরকার ?'

'হ্যাঁ, ডাক্তার মুখার্জী কি যেন ভেবে নিয়ে বললেন, 'বেস্ট হয় কি জানো—রক্তটা আনতেও যাও আর ইতিমধ্যে তোমরা যদি কেউ পারো খানিকটা রক্ত দাও। এখনকার মত কাজ চলুক।'

শঙ্কর বললে, 'আমি দিতে পারি খানিকটা রক্ত—'

'কিন্তু তুমি রক্ত দিতে গেলে মেডিকেল কলেজে যাবে কে?'

'যদি ভানু যায়।'

'ভানু কি পারবে?'

ভানু বললে 'না আমি পারব না—মেডিকেল কলেজে কোথায় কিভাবে যেতে হয় তাই আমি জানি না। আর ও শালা ডাক্তার আর নার্সদের সবই প্রায় একরকম দেখতে। তখন কাকে বলতে কাকে বলে ফেলব—ব্যস শালা অমনি জেরা শুরু করে দেবে। তারপর যদি কিছু ঘটে যায় তাহলে শালা একেবারে হিতে বিপরীত।'

শঙ্কর বললে, 'তাহলে?'

আমি তখন সব সমস্যার সমাধান করে দিলাম। ওস্তাদের আড্ডা থেকে বাইরে এসে যখন আমি টুনটুনির কাছে প্রথম মণ্টুর কথা শুনি তখনই মনটা আমার হু হু করে উঠেছিল। প্রথমত: এই অভিশপ্ত জগতে এসে মণ্টুকে দেখেই আমার কেমন যেন মায়া পড়ে গিয়েছিল তার ওপর। অমন ভদ্র, সহবৎ শেখা ছেলে এখানে সত্যিই দুর্লভ। তার ওপর তারই জন্যে রানীদিকে আমি খুঁজে পাই। সেই সূত্রে সে আমাকে মামাও বলে। সেই মণ্টু যখন আবার টুনটুনির ভাই তখন কেমন যেন একটা রহস্যময় মমতায় মনটা আমার ভরে ওঠে। মনে আমার আরও একটা প্রশ্ন ফেনিয়ে উঠেছিল, টুনটুনি আর মণ্টু যদি ভাই-বোন, তবে তারা দু'জনে দু'জায়গায় থাকে কেন? মণ্টু থাকে রানীদির ওখানে আর টুনটুনি থাকে জগদীশের কাছে। কিন্তু কেন? এদের জীবনধারায় কে জানে কোন্ রহস্য লুকিয়ে আছে—যা এখনও আমার কাছে অজ্ঞাত। মণ্টুর সঙ্গে সহসাই আমার পরিচয়, টুনটুনির সঙ্গে পরিচয় এক ভয়াল রাত্রির মধ্যে। কিন্তু দু'জনেই আমাকে আকর্ষণ করেছে তীব্রভাবে। ভাই-বোন দু'জনেরই স্বভাবের মধ্যে কেমন

যেন একটা অপূর্ব মিল রয়েছে। গুলীবিদ্ধ মণ্টুর শরীর থেকে অস্ত্রোপচার করে বুলেট বেরিয়েছে। ডাক্তার মুখার্জী বলেছেন, ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু রক্ত ক্ষরণ হয়েছে প্রচুর এবং তা বহুক্ষণ ধরেই হয়েছে। বিপদ আসতে পারে এইদিক থেকেই। তাই এখনই যখন রক্তের প্রয়োজন তখন সে রক্ত তাকে তো দিতেই হবে। কিন্তু দেবে কে? শঙ্কর রাজী রক্ত দিতে কিন্তু সে থাকলে আরও রক্তের যেখানে প্রয়োজন হবে তা আনতে যাবে কে? আনতে যাবার সমস্যা দেখা দিতেই আমি বলে উঠলাম, 'শঙ্কর, তুমি যাও রক্তের বোতল আনতে—এখন যে রক্তের প্রয়োজন তা আমি দিচ্ছি।'

আমি এ কথা বলাতে টুনটুনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলে উঠল, 'আপনি দেবেন রক্ত?'

'হ্যাঁ,' বললাম, 'মণ্টু যে আমাকে মামা বলে—'

'মণ্টু আপনাকে মামা বলে!' টুনটুনি আরও বিস্মিতভাবে বলতে গেল, 'তাহলে—'

বাকিটুকু আমি বলে দিলাম, 'তাহলে আমিও তোমার মামা হবো।'

'আশ্চর্য!' বলে টুনটুনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সেদিন আমি রক্ত দিতে কৃতজ্ঞতায় টুনটুনির চোখ দু'টো ছলছল করে উঠল। শুধু তাই নয়, মণ্টুর সম্বন্ধে অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়ে সে আমাকে তার ঘরে এনে বলে উঠল, 'মামাবাবু, আপনি যা করলেন তা আমরা আমাদের মা-বাবার কাছ থেকেও কোনদিন পাই নি।'

'তোমাদের মা-বাবা আছেন?'

'না।'

'কেউ নেই?'

'নেই কি—কোনদিন ছিলও না।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সে কি, মা-বাবা কোনদিনই ছিল না ?'

'হ্যাঁ মামাবাবু।'

'বলো কি—এ কখনো হয় নাকি ?' কথাটা বলেই সহসা মনে হল কে জানে এতখানি প্রশ্ন করা আমার বোধহয় উচিত হয় নি। হয়তো ওদের ভাইবোনের জন্মরহস্যে এমন কিছু আছে যা ওরা লোকসমাজে বলতে পারে না আর তার জন্য আছে ওদের মনে লজ্জা, জ্বালা কিম্বা গভীর বেদনা। ঠিক সেই কারণেই টুনটুনি বলে ফেলল, 'নেই কি—কোনদিন ছিলও না।' কিন্তু এ কি সম্ভব ? তাই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বল তো টুনটুনি, তুমি এ কথা বললে কেন ?'

'সত্যিই আমাদের মা-বাবা ছিল না কোনদিন মামাবাবু!'

বললাম, 'বার বার এই একটা কথা তুমি বলছ টুনটুনি, কিন্তু ব্যাপারটা আসলে কি বলো তো ?'

'মামাবাবু, হয়তো এ কথা আর কাউকে কোনদিন বলতাম না কিন্তু আপনাকে দেখে আর আপনার মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসা এই অল্প সময়ের মধ্যে এমন করে পেয়ে, আজ সব কথা খুলে বলতে ইচ্ছে কবছে।'

'যদি ইচ্ছে করে তবে বলো।'

'আমাদের মাও নেই, বাবাও নেই। অথচ আমরা ভাই-বোনে জন্মগ্রহণ করেছি—এ কথা বললে লোকে তাজ্জব হয়ে যাবে। শুনেছি মান্ধাতার নাকি মা-বাবা ছিল না, আমাদের অবস্থাও ঠিক তেমনিই। শুনুন মামাবাবু—কিন্তু শোনার পর ঘৃণায় শিউরে উঠবেন না। কেন না, আমরা ঠিক আমাদের জন্মের জন্য দায়ী নই।'

'বলো তুমি। তুমি যা বলবে তাই আমি শুনব। তা ছাড়া ইতিমধ্যে আমার পরিচয় নিশ্চয় পেয়েছ। মানুষকে আমি ঘৃণা কোনদিন করি নি আর করতেও পারব না।'

টুনটুনি বলতে লাগল, 'মামাবাবু, আমরা যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছি তিনি আমাদের মা নন। আর মা আমাদের যিনি হতে পারতেন তাঁর গর্ভে আমরা হই নি। অন্যদিকে যিনি বাবা, যাঁর গর্ভে হয়েছি তিনি তাঁর স্ত্রী নন। তাই আমাদের মা-ও নেই, বাবাও নেই।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি? এইভাবে আমাদের জীবনধারা চলে আসছে।'

'কিন্তু ঠিক সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করি নি।'

'আপনি যা জিজ্ঞাসা করছেন মামাবাবু, তাও আমি বলব। কিন্তু বলুন তো আমাদের জন্মবৃত্তান্ত কত ভয়ংকর! শালীকে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন ভগ্নীপতি—আমরা তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছি।'

'বলো কি!' আমি যেন চমকে উঠলাম। অনেকদিনের অর্থাৎ আমার সেই শৈশবের হারানো সূত্র যেন আজ খুঁজে পাবার পথে এগিয়ে চলেছি। আরও একটা ঘটনা—ঠিক এমনি করেই তো রানীদির বর রানীদির বোন বাণীদিকে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। এর জন্য আমি কতদিন কত চিঠি লিখে দিয়েছি রানীদির কথামত। কে জানে টুনটুনি আর মন্টুর জন্মরহস্য কি সেই হারানো সূত্রকে কেন্দ্র করে এখনই আমার সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়বে? আমি কেমন যেন উতলা হয়ে উঠলাম। প্রচণ্ড একটা ভাবনার স্রোত আমার ভেতরটাকে যেন নড়িয়ে কাঁপিয়ে ঘুলিয়ে একেবারে একাকার করে দিল। ঘন ঘন নিঃশ্বাসে আমার সর্ব শরীর যেন থরথর করে উঠ্‌তে লাগল। আমি এবার আবেগে অভিভূতের মত বলে উঠলাম, 'তোমার গর্ভধারিণী যিনি, তুমি তাঁর নাম জানো কি মা?'

'একবার শুনেছিলুম। সত্যি-মিথ্যে ঠিক জানি না।'

'কি বল তো?'

'বা—ণী।'

ও। আমি আর সেখানে যেন দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। বজ্রাহত মানুষের মত আমি যেন মুহূর্তে নিষ্প্রাণ, নিস্পন্দ হয়ে গেলাম। আমি এসেছিলাম শঙ্করের মায়ের তাগিদে, শঙ্করকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আবেদন জানাতে, মায়াকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু এই রাতে আজ আমি যে উদ্‌ঘাটিত রহস্যের ততোধিক রহস্যময় পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেলাম, সেখান থেকে আমি বেরিয়ে যাব কি করে? এ যে অদ্ভুত জটিল জট। এ জট খুলতে পারা আমার পক্ষে অসম্ভব।

টুনটুনি বললে, 'মামাবাবু!'

বললাম, 'মা—'

'আপনি অমন চমকে উঠলেন কেন?'

'এর উত্তর আমি আরেকদিন দেবো মা,' তারপর আমি আর সেখানে দাঁড়াতে পারি নি। নেমে পড়েছিলাম অন্ধকারময় কৃষ্ণ-কালো সর্পিল পথে।

হায়, এও ঘটে মানুষের জীবনে!

মনে তখন আমার ঝড় বয়ে চলল। কলকাতার বস্তিতে শীতের তেমন প্রকোপ হয় না, তবু তখন রাত হয়েছিল অনেক বলে শীতটা একটু লাগছিল। কিন্তু মনের ঝড়ে সে শীতও যেন শীত বলে মনে হচ্ছিল না। আমি এসেছিলাম শঙ্করের মায়ের ও মায়ার অনুরোধে, এসেছিলাম রানীদিকে সন্ধান করতে। কিন্তু এসে সন্ধান করে বসলাম যেন রানীদির জীবনের হারিয়ে যাওয়া উৎস। রানীদির বোনের হদিশ আজ আমি যেমন করে পেলাম, হয়তো একদিন এমনি করেই তিনিও পেয়েছিলেন। এরই জন্য রানীদি হয়তো আমার ঘরছাড়া, কুলত্যাগী কুলটা মেয়ে। কোনরকম একটা খেই ধরে বেরিয়ে পড়েছিলেন পথে। তারপর উঠেছিলেন এইখানে এসে। স্বামীর খোঁজে এসে তাঁকে না পেয়ে হয়তো বোনের ছেলেমেয়েকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও পারেন নি।

তাই বারে বারে হতভাগিনী রানীদি আমায় বলেছেন, 'ওরে বিজন, আমি হেরে গেছি রে, হেরে গেছি।' হয়তো সংসার পাতার বদলে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন এখানকার অভিশপ্ত সমাজের পূতিগন্ধময় আবেষ্টনীর মধ্যে। তারপর নারকীয় পরিস্থিতির স্রোতে ভাসতে ভাসতে চলে গেছেন দূর হতে দূরে, একেবারে সভ্যজগতের বিশাল সীমানার বাইরে।

পথ চলতে চলতে পরক্ষণেই আমার মনে হল—রানীদির জীবনে সে কথাই যদি সত্যি হয়, তবে সেখানে আরও একটি মানুষ তো ছিল, যে ভদ্রলোক নাকি তাঁর স্বামী? এত কাছে যখন রানীদি এসে পড়েছিলেন তখন কি আর তাঁর সন্ধান তিনি না করেছিলেন? নিশ্চয়ই তা করেছিলেন এবং তা যদি সত্যি হয়, তবে যে উদ্দেশ্য নিয়ে রানীদি স্বামীর কাছে আসতে চেয়েছিলেন তা এমনভাবে তাঁর জীবনে ব্যর্থ হয়ে গেল কেন? তিনি স্বামীর সঙ্গে জীবন না কাটিয়ে এই অভিশপ্ত জগতের মধ্যে ততোধিক অভিশপ্তময় এই রাজ্যে সর্বপ্রকার নোংরা কাজের যে নাকি মূর্তিমান নায়ক, তার আড্ডায় গণিকাবৃত্তি আর নর্তকীবৃত্তিকে পেশা করে দিন কাটায় কেন? আমি নিজে চোখে দেখেছি নর্তকীবৃত্তির অভিসারিকা বেশ, নিজে কানে শুনেছি আড্ডায় অভ্যাগতদের মনোরঞ্জন করার ইতিহাস। তা ছাড়া এসব তো সমর্থিতও হয়েছে অন্যত্র।

কে জানে হয়তো মানুষ এমনি ভাবেই পথভ্রষ্ট হয়। এমনি করেই হারিয়ে ফেলে নিজের অস্তিত্ব। অসামান্যা সুন্দরী মেয়ে রানীদি, যৌবনের জৌলুস ছিল তাঁর মনেও—তা ছাড়া সর্বোপরি ছিল তাঁর মাতৃত্বের দুর্বার কামনা। কে জানে, পথ খুঁজে পেলে যে মেয়ে আদর্শ নারীর শীর্ষস্থানে আপনার আসন করে নিতে পারত সেই মেয়েই হয়তো পথ না পেয়ে কামনার দুরন্ত আবেগে ছিটকে পড়েছে সর্বনাশের পঙ্কিল গহ্বরে।

মণ্টুকে আমি এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই দেখেছি, কিন্তু আজ

দেখলাম টুনটুনিকে। আমি অবাক হয়েছি টুনটুনির সারল্য আর সত্য ভাষণের চারিত্রিক শুভ্রতা দেখে। কি সরল উক্তি নিজেদের জন্ম-রহস্য সম্বন্ধে—'আমরা যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছি তিনি আমাদের মা-নন্। আর মা আমাদের যিনি হতে পারতেন, তাঁর গর্ভে আমরা হই নি। অন্যদিকে যিনি বাবা—যাঁর গর্ভে আমরা হয়েছি তিনি তাঁর স্বামী নন। তাই আমাদের মা-ও নেই, বাবাও নেই।'

মেয়েটার এই সরল উক্তির পর একটা প্রশ্ন তাকে আমার করা উচিত ছিল। সেটা আমি কথায় কথায় ভুলে গেছি অথবা ঘটনার আকস্মিকতায় মনেই ওঠে নি। পথ চলতে চলতে তাই হঠাৎ আমার মনে হল, একবার ফিরে যাব কি? হ্যাঁ, ফিরেই যাই। জিজ্ঞাসা করে আসি তাকে তাদের গর্ভধারিণী বেঁচে আছেন কিনা, আর যিনি বাবা, তিনিই বা কোথায়? আর তাদের মাসীকেই বা দেখা যাচ্ছে না কেন?

কিন্তু রাত হয়েছিল অনেকখানি দেখে আর ফিরে গেলাম না। ওদিকে মায়ার মা হয়তো অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে আছেন, আমার কাছ থেকে তাঁর ঈপ্সিত খবরটি শুনবেন বলে। না, বরং পরে এক সময় এসে জিজ্ঞাসা করে যাব টুনটুনিকে, এখন চলেই যাই।

সেদিন সেই রাতে অন্ধকার আকাশের নিচে, ততোধিক অন্ধকারময় গোলকধাঁধারূপী পথে দাঁড়িয়ে যদি আমি টুনটুনির কাছে ফিরে যেতাম তাহলেই বোধ করি ভাল করতাম এবং সেইদিনই এই অভিশপ্ত জগতের নির্দয়-নিষ্ঠুর পরিস্থিতির গভীর রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে যেত আমার সামনে। কিন্তু সেদিন সিদ্ধান্ত নিতে আমার ভুল হয়েছিল, তাই তার জের চলল আরও দীর্ঘকাল অবধি।

সেদিন ফিরে এলাম যখন মায়াদের ঘরে তখন সে এক দৃশ্য! একদিকে স্তিমিত কেরোসিন শিখার ভুসো-পড়া লণ্ঠন। পাশে ভূলুণ্ঠিতা মা ফুলে ফুলে কাঁদছেন আর মায়া পাশে বসে তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হয়েছে মায়া?'

মায়ার চোখের কোণে জল। নিরুত্তরভাবে সে ঘাড় হেঁট করল।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কি ?'

মায়া এবার ডুকরে কেঁদে উঠে বললে, 'দাদা! এখানের পালা আমাদের শেষ করতেই হবে—নইলে আর কিছুই বাকি থাকবে না।'

'কি বাকি থাকবে না ?'

মায়া যেন একটু বিরক্ত হল আমার কথা শুনে। তারপর মুহূর্তের মধ্যে দৃঢ় হয়ে নিয়ে বললে, 'আপনি কি কিছুই বুঝতে পারেন না ?'

কথাটায় মায়ার খোঁচা অনুভব করলাম। আমিও মুহূর্তে দৃঢ় হয়ে নিয়ে বললাম, 'বুঝি আমি সবই বোন, কিন্তু এখানকার অলিতে-গলিতে, বাতাসে-নিঃশ্বাসে, আলোতে-অন্ধকারে যে হিংস্রতা লুকিয়ে আছে, তাকে আমি অতিক্রম করব কি করে ?'

দেখলাম মায়া আমার কথাগুলো যেন গিলছিল একেবারে। তাই আবার বলে উঠলাম, 'তোমাদের এখানকার পালা শেষ হওয়াই ভালো। কারণ আমি বাড়ি থেকে যাবার পর এখানে যা ঘটেছে তা আমার পক্ষে অনুমান করা আদৌ শক্ত নয়। মায়ের আর তোমার চোখের জলে সে ঘটনা আমি টের পেয়েছি—'

'আপনি টের পেয়েছেন ?'

'হ্যাঁ পেয়েছি।'

কি করে টের পেয়েছি সে কথা অবিশ্যি বললাম না মায়াকে। মণ্টু আহত হয়েছিল—তার আহত হওয়ার সংবাদ টুনটুনিকে দিয়ে যা বুঝেছিলাম বসন্ত এইদিকেই এসেছিল এবং তার আসার অনেক আগে যে উপলক্ষে আমার ওদিকে যাওয়া, সেও তো এই বসন্তের সম্পর্কেই। শঙ্করকে তারা টেনেছে নানা উপায়ে। কিন্তু ঘটনার

সেইখানেই তো শেষ হয় নি। মায়া বড় হয়েছে। মায়ার দিকে দৃষ্টি পড়েছে বসন্তর, একথা মা আমাকে বলেছিলেন। তাই তাকে বাঁচাবার জন্যও তো আমার ওখানে যাওয়া। কাজেই ব্যাপারটা না বোঝার আমার কিছুই ছিল না।

আমি টের পাওয়ার ব্যাপারটা শুনে মায়া বলে উঠল, 'যদি আপনি টের পেয়েই থাকেন, তাহলে এখন আপনি বলুন, আপনার করণীয় কি আছে?'

আমি বললাম, 'আমার করণীয় কি আছে তা আমি জানি না —তবে এ কথা বলতে পারি, তোমাদের করণীয় কি আছে তা আমাকে খুলে বলো। আমি সেই মতো তোমাদের জন্য যা কিছু করতে হবে তাই করব।

এবার মা বললেন, 'তাই করো বাবা—তাই করো।'

'কিন্তু করবটা কি মা,' বললাম, 'তা তো আপনাকে বলতে হবে?'

মা বললেন, 'আমি মায়াকে নিয়ে অনেক, অ-নে-ক দূ-রে পালিয়ে যেতে চাই বাবা।'

'তা যদি হয় তাহলে আমি তারই জন্যে চেষ্টা করব।'

'কি আজই—রাত না পোয়াতে', বলে মা উঠে বসলেন। তারপর বললেন, 'এমনভাবে যেতে হবে, যেন ও বুঝতে না পারে।'

সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সে কি সম্ভব মা?'

'কেন—যদি ভোরের অন্ধকারেই আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি—'

'তা হলেও বসন্ত জানতে পারবে। এই গোটা চত্বরটা জুড়ে বসন্তর লোক থৈ-থৈ করছে। তারা ঠিক খবর দিয়ে দেবে।'

'তাহলে উপায়?'

'উপায় আমি সেরকম কিছু দেখছি না, তবে—'

'তবে—?'

'তবে একটা উপায় হতে পারে', আমি মাকে বললাম, 'মায়ার সম্পর্কে বসন্তের নজরের খবর তো আপনাকে দিয়েছিল ভানু ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে উপায় ভানুকেই করতে হবে।'

'সে উপায় করবে কি করে ?"

'সে তো মায়াকে বোনের মত ভালবাসে ?'

'তা বাসে।'

'তাহলে বোনের প্রতি কর্তব্যটা সে কি করবে না বলে মনে করেন ?'

'তা করবে। কিন্তু কিভাবে করবে ?'

মায়ের এই প্রশ্নের উত্তরে বলে উঠলাম, 'আবার সে মায়াকে ট্রেনে ট্রেনে অন্ধ সেজে গান গাইবার জন্য নিয়ে যাবে। বসন্তও দেখবে সে অন্ধসাজা ভানুকেই নিয়ে যায়। তারপর ওরই মধ্যে একদিন টুক্ করে সরে পড়বে এবং এভাবে সরে পড়লে বসন্ত টেরও পাবে না। অথচ কাজ হাসিল হয়ে যাবে।'

মায়া বললে, 'এ আপনি মন্দ বলেন নি দাদা !'

মাকে বললাম, 'আপনি কি বলেন ?'

মা বলে উঠলেন, 'যুক্তিটা মন্দ নয়। কিন্তু তার সময় পাবো কি ?'

আমি বললাম, 'কেন ? আপনার কি মনে হয় বসন্ত এরই মধ্যে ভালমন্দ কিছু করে বসবে ?'

'বিশ্বাস নেই বাবা ওকে' মা বলে উঠলেন. 'আজ বসন্ত নিজে এসেছিল। যে কথা সে বলে গেল, তাতে আমার ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে গুটিয়ে যাচ্ছে বাবা।' কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গেই মা যেন কেমন শিউরে উঠলেন, তারপর বলতে লাগলেন, 'ওদের ওস্তাদের আড্ডায় নাকি একজন মেয়েছেলে দরকার। সেখানে মায়া গেলে মায়ার দাম বেড়ে যাবে অনেক—'

'বলেন কি', আমি শিউরে উঠলাম। এমনিভাবেই হয়তো রানীদিরও দাম বেড়েছিল এখানে। তারপর কি যে হয়েছে তা জানি না। তবে এ কথায় বেশ বুঝতে পারলাম রানীদি সত্যিই এখান থেকে সরে গেছেন। আর সরে যে গেছেন তা আড্ডার ভেতরে উঁকি দিয়ে আর তাদের কথাবার্তা শুনে প্রায় নিশ্চিতই হয়ে এসেছি। এখন দেখলাম ঘটনাটা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। তাই মায়াকে নিয়ে রানীদির শূন্য স্থানে বসাবার বসন্তর এত চেষ্টা। আমি ব্যাপারটা উপলব্ধি করে বললাম, 'কিছু ভাবতে হবে না— দেখছি আমি ব্যাপারটা, কতদূর কি করা যায়!'

মা বললেন, 'বুঝতে পারছ বাবা, ভয়টা আমার কোনখানে?'

'বুঝতে পারছি, বললাম, 'আর বুঝতে পারছি বলেই আমি আপাতত ভয়ের কিছু দেখছি না।'

মায়া ফোঁস করে বলে উঠল, 'আপনি ভয়ের কিছু দেখছেন না—সে কি?'

'হ্যাঁ,' আমি বললাম, 'দ্যাখো মায়া, বসন্ত যদি তার ব্যক্তিগত কামনা চরিতার্থ করার জন্য তোমাকে টানবার চেষ্টা করত তা হলে সত্যিই ভয়ের ব্যাপার ছিল। কিন্তু আমি দেখছি সে চাইছে তোমাকে আড্ডার মধ্যে সম্ভবত কারো অভাব পূরণ করার জন্যে। এ অবস্থায় কিছুটা সময় হাতে আমরা পাবই—'

'কিন্তু আমার মন বলছে,' এবার মায়া বলে উঠল, 'সময় হয়তো আমরা পাব না।'

'দেখা যাক কি হয়,' বলে আমি কথাটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করলাম।

সেদিন সেই রাত্রির পর প্রভাত হতে না-হতেই আমি গিয়েছিলাম টুনটুনিকে নিয়ে মণ্টুকে দেখতে। মণ্টুকে দেখলাম বেশ ভালই আছে সে। রাতেই রক্ত সংগ্রহ করে এনেছিল

শঙ্কর। ভয়ের সীমানা পার হয়ে গেছে সে। মণ্টুকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার মাসীর খবর কিছু জানো কি?'

মণ্টু বললে, 'না মামাবাবু। আমি এতদিন জেলে ছিলুম। ফিরে এসে আর মাসীকে দেখি নি।'

টুনটুনিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি জানো কিছু?'

টুনটুনিও বললে, 'না।'

গত রাতে মায়ের কাছে কথাটা শোনা অবধি শঙ্কর আর ভানুকে বলবার জন্য মনটা আমার ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল প্রায়। শঙ্করের বোন মায়া—সে মায়াকে টেনে জাহান্নমে নিয়ে যাবে বসন্ত, এ কি ভাই হয়ে শঙ্কর সহ্য করবে? নিশ্চয়ই মন তার বিদ্রোহ করে উঠবে। আর ভানু, যে ভানু বলেছিল শঙ্করকে সে আপন ভাইয়ের মত মনে করে এবং মায়াকে মনে করে বোনের মত, যে বলেছিল এমন দিন আসবে যখন বসন্তর হাত থেকে মায়াকে রক্ষা করতে হলে তাকেই দরকার হবে সবচেয়ে আগে—আজ তার সাহায্য তো একান্তভাবে প্রয়োজন। কাজেই সেই ভেবে আমি ব্যবস্থা করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম।

মণ্টুকে দেখে বেরিয়ে পড়লাম শঙ্কর আর ভানুর উদ্দেশ্যে।

গিয়ে উঠলাম বসন্তর ডেরায়—সেই যেখানে আমাকে চোখ বেঁধে ধরে এনেছিল এক সময়ে। সেখানে আসতে সকলেরই দেখা মিলে গেল। দেখলাম বসন্ত বসে বসে মদ খাচ্ছে আর শঙ্কর, ভানু আর সেই আগেকার দেখা কালোয়ার আর একজন মাড়োয়ারী তাস খেলছে। এ তাস খেলা মানে যে জুয়া, সে কথা আমার বুঝতে বাকি রইল না। আমাকে দেখে শঙ্কর বলে উঠল, 'কি ব্যাপার, আপনি যে হঠাৎ?'

বললাম, 'খুব দরকারেই এসেছি ভাই।'

ভানু বললে, 'দাদামণি কাল রক্তটা দিয়ে মণ্টুর কি উপকারই না করেছেন।'

'যাক্, ছেলেটা যে বেঁচেছে এইটাই যথেষ্ট' বলে আমি বললাম, 'অসময়ে তোমাদের বিরক্ত করতে এসেছি—আমার কথা তোমাদের একটু শুনতে হবে। এসো, একটু বাইরে এসো—'

শঙ্কর বললে, 'যাচ্ছি—'

বসন্ত বললে, 'কি কথা হবে বাওয়া—সামনে বলতে নি-ষে-ধ আছে?'

'আমাদের ঘরোয়া কথা' আমি বললাম। বসন্ত মদের ঝোঁকে বললে, 'ঘরোয়া কথা—তা বেশ। কও বাওয়া ঘরোয়া কথা কও। তবে জেনে রাখো, আমি বসন্তকুমার, মদ খাই, খুব খাই কিন্তু জ্ঞান হারাই না বাওয়া। আমি তোমায় চিনি চাঁদ, আর ঘরোয়া কথা কি কইবে, তাও জানি, কিন্তু বেশি দূর এগিও না আমি তোমায় সা-ব-ধা-ন করে দিচ্ছি।'

আশ্চর্য, লোকটা বলে কি? লোকটা কি আমার মনের কথা টের পেয়েছে? তবে আমি ভেবে দেখলাম লোকটা আমার মনের কথা টের পাক আর না-পাক, তার নিজের কথা তো সে জানে—তাই সম্ভবত তারই প্রতিক্রিয়া আমার মনে কি হয়েছে, তা উপলব্ধি করেই বোধহয় ও কথাগুলো বলছে। এসব লোকের এই ধরনেরই কথা হয়। আমি বললাম, 'আমাকে সাবধান করার আপনার কিছু নেই—'

'না হলেই ভাল', বলে বসন্ত আবার মদ্যপান করতে লাগল।

শঙ্কর ও ভানু বাইরে আসতে আমি সব কথা তাদের খুলে বললাম। আরও, বললাম, কি ভাবে মা ও মায়া চলে যাবেন দূরে, সে সব কথাও।

শঙ্কর বললে, 'তাই যা হয় করুন। নিজে তো মরেছি, তাই বলে বোনটাকেও কি ডোবাবো?'

ভানু বললে, 'কক্ষনো নয়—'

'তা যদি না হয়' আমি বললাম, 'তবে আমাকে তোমাদের সাহায্য করতে হবে।'

'সে সাহায্য আপনি পাবেন', বলে শঙ্কর ফিরে যাবার জন্য উদ্যত হল।

কিন্তু তবু যেন আমার মনের অনুসন্ধিৎসার শেষ হল না। সম্ভবত আমি মায়ার ব্যাপারটারও যেমন একটা সমাধান চাইছিলাম, ঠিক সেইরকমভাবেই অন্তরে অন্তরে চাইছিলাম রানীদির খবরটাও পেতে। কিন্তু সে খবর কে দেবে আমায়? বসন্তর ডেরা থেকে বেরিয়ে এলাম কেমন যেন একটা অস্বস্তির বোঝা মনে নিয়ে।

যাই হোক্ তবু মনে একটা সান্ত্বনা ছিল যে, মায়ার ব্যাপারটা শঙ্কর বা ভানু দু'জনকেই আমি বোঝাতে পেরেছি। রানীদির খোঁজের জন্য এখন রইল আমার সামনে অনন্ত অবকাশ। ফিরে এলাম আমি।

মায়া বললে, 'সকালেই কোথায় গিস্‌লেন দাদা?'

'একটু কাজে।'

'কাজটা কি শুনতে পারি না?'

শোনাশুনির আর কি। একে একে আমি মন্টুর আহত হওয়ার ঘটনা, তার শরীর থেকে বুলেট বের করার কথা, তাকে রক্ত দেওয়ার কথা, শঙ্করের রক্ত কিনে আনার কথা, টুনটুনির কথা সব বললাম। আরও বললাম, 'সেই জন্যেই সকালে মন্টুর খবর নিতে বেরিয়েছিলাম।'

মায়া বললে, 'ও।'

প্রতিদিনকার মত সেদিনকার খবরের কাগজটাও মায়া এনে রেখেছিল। কাগজখানা নিয়ে পড়তে বসে গেলাম। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার! সর্ব প্রথম যে খবরটির ওপর নজর পড়ল তাতে আমি যেন স্তম্ভিত না হয়ে পারলাম না এবং এই খবরটা ধরেই

আমি আমার লক্ষ্যে অনায়াসেই পৌঁছুতে পারব বলে মনেও করলাম। তাই খবরটা বারবার করে পড়তে লাগলাম।

ছোট্ট একটুখানি খবর। এমন কিছুই নয়। তবে, তার অন্তর্নিহিত অর্থ ও ব্যাপকতা অনেকখানি। খবরটা ডবল কলম হেড লাইনে পরিবেশন করা হয়েছেঃ খাদ্যে বিষ মিশিয়ে ডি-সি সেন্ট্রালকে হত্যার চেষ্টা। তারপর স্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত বিবরণ—"বেশ কিছুদিন ধরে ডি-সি সেন্ট্রাল অনুভব করছিলেন, তাঁকে কে বা কারা যেন সকল সময়ে ছায়ার মত অনুসরণ করছে। সম্প্রতি এমন কতকগুলি সূত্র পাওয়া গেছে, যাতে তিনি স্থিরনিশ্চিত হয়েছেন যে, তাঁকে হত্যা এমনভাবে করা হবে যে, কেউ বুঝতেও পারবে না। ডি-সি সেন্ট্রাল তাই সমস্ত ব্যাপারটির রহস্য উদ্ঘাটনের দায়িত্ব নিজের হাতেই রেখেছেন। বলা বাহুল্য, তিনি আশঙ্কা করছেন, আততায়ী তাঁকে সামনাসামনি হত্যা করার বদলে বিশেষ একটা ষড়যন্ত্রের শিকাররূপে খুব গোপনে হত্যা করতে পারে। অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আততায়ীর পক্ষে তাঁকে খাদ্যের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়ে ইহজগৎ থেকে সরিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়। তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অনুযায়ী উক্ত ডি-সি কিছুদিন যাবৎ স্বগৃহ পরিত্যাগ করে কলকাতার কারনানী ম্যানসনে বাস করবেন। এই খবরটির সঙ্গে ডি-সি সেন্ট্রালের সংক্ষিপ্ত একটি জীবনীও স্টাফ রিপোর্টার দিয়েছেন।"

খবরটা পড়ার মধ্য দিয়ে আমার মনে কেমন যেন এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া হল। এই ডি-সি সেন্ট্রালকে আমি চিনি। চিনি মানে এই অভিশপ্ত জগতের আড্ডা থেকেই চিনি। কাজেই তাঁর জীবন সংশয় হবে, তাঁকে হত্যা করা হবে—এরকম একটা অবাস্তব প্রশ্ন আমার মনে কেন উঠবে? বরং এই আড্ডার অভিজ্ঞতা যে মানুষের আছে সে মানুষই বলবে—নরহত্যা এই আড্ডার লোকেদেরই পেশা, কাজেই এদের আবার হত্যা করতে যাবে কে? তাই

এই খবরে ডি-সি সেন্ট্রালকে হত্যার কথায় আমার মনে হল—এ খবর বানানো এবং এই বানানো খবরের পিছনে নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে। আমি ঘুণাক্ষরেও মনে করতে পারলাম না যে, এর মধ্যে কোন সত্যি আছে।

কয়েক মাস আগে অনুরূপ একটা সংবাদের কথা আমার মনে পড়ে গেল। শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেন-কেলেঙ্কারীর কথা। খবরটা বেরিয়েছিল তদন্তকারী অফিসার সম্পর্কে। সেই ভদ্রলোকও এসে এই একইভাবে উঠেছিলেন কারনানী ম্যানসনে। বিধানসভায় পর্যন্ত ঘটনাটা উঠেছিল। পরে দেখা গেল বোটানিক্যাল গার্ডেনের ব্যাপারে যিনি ছিলেন মক্ষীরানী, তিনি এসে উঠেছিলেন কারনানী ম্যানসনে, অতএব তদন্তকারী অফিসার সেখানে না ওঠার সুযোগ ছেড়ে দেবেন কেন? খবরটা মনে হতেই সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় কেমন যেন একটা চিন্তার তরঙ্গ আছাড় খেয়ে পড়ল। সত্যি, এমনও তো হতে পারে, রানীদি তো ছিলেন এখানকার 'কুইন অফ দি ডেন'—হয়তো পালিয়ে এসে তিনি এখানেই উঠেছেন। তারপর লালসার দাস ঐ ডি-সি সেন্ট্রাল তিনিও এখানে এসে উঠতে চান। সারা জগৎ, সভ্য সমাজ কেউ জানতে পারবে না আসল ব্যাপারটা কি—খবরের অন্তরালে নিজেকে আড়াল করে হয়ত এইভাবেই তিনি মজা লুঠবেন।

কথাটা মনে হওয়া মাত্র মনটা আমার কেবলই যেন বলে উঠতে লাগল, অসম্ভব নয়, অসম্ভব নয়।

মায়া আমাকে চিন্তিত দেখে বলে উঠল, 'দাদা বেলা হয়েছে তো বেশ। আবার খবরের কাগজ নিয়ে বসলেন। বরং আপনি চান-টান সেরে খাওয়া-দাওয়া করে নিন না।'

বললাম, 'মন্দ বলো নি। সময়কে ইউটিলাইজ করতে হবে। ঠিক বলেছ তুমি।'

'হ্যাঁ, খাওয়া-দাওয়া সেরে নিন।'

. মনে মনে ভাবলাম, খাওয়া-দাওয়া করব, কিন্তু তারপর? খবরটার মধ্য দিয়ে কেমন যেন একটা অননুভবনীয় আনন্দের সাড়া অনুভব করছিলাম মনে। এই খবরের সূত্র ধরে মনে হচ্ছে আমি আমার লক্ষ্যস্থলে নিশ্চয়ই পৌঁছুতে পারব, নিশ্চয়ই।

স্নান-খাওয়া করতে যতক্ষণ লাগল ততক্ষণই কেমন যেন এক অভ্রান্ত লক্ষ্যের কথা চিন্তা করে দ্রুততার সঙ্গে সবকিছু সম্পন্ন করলাম মনে হল। শীতের বেলা, মধ্যাহ্ন পার হলেই সূর্য ঢলে পড়ে পশ্চিমাকাশে। যাই-যাই করে বেলা যেন দিনশেষের গান গেয়ে ওঠে আর্তস্বরে। মনের মধ্যে আমার অননুভবনীয় আনন্দের উদ্দাম স্রোতোধারা, নদীর স্রোতের মত ছলাৎ-ছল করে আছাড় খেয়ে পড়েছে চিন্তার তটপ্রান্তে। হ্যাঁ, আমাকে যেতে হবে, এখনই যেতে হবে সেইখানে, যেখানকার কথা আমি প্রতি মুহূর্তের প্রতিটি ভগ্নাংশের মধ্যে কেবলই ভেবেছি, কেবলই কল্পনা করেছি। কারনানী ম্যানসন—হ্যাঁ কারনানী ম্যানসন। কে জানে সেখানে গিয়ে কি দেখব—কিন্তু একথা ঠিক যে, কিছু না কিছু আমি নিশ্চয়ই দেখব।

আমাকে জামা-কাপড় পরে বেরুতে দেখে মায়া ও মা এগিয়ে এলেন। মা-ই জিজ্ঞাসা করলেন প্রথমে, 'কিছু ঠিক করতে পারলে না বাবা?'

'এখনও পারি নি। তবে পারব বলে আশা করছি মা।'

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

মায়া বললে, 'যেখানেই যান দাদা—একটু সকাল সকাল ফেরার চেষ্টা করবেন।'

'কেন বল দিকি?'

'আমরা তো মাত্র দুটো প্রাণী দাদা।'

'কিন্তু পাশে তো আরও লোক আছে।'

'তেমন কে আর আছে বলুন না?'

'কেন মাধু নেই, পাঁচির মা নেই, তাছাড়া মেনকা?'

'কিন্তু ওদের ওপর কি কোন ভরসা করা যায় দাদা ?'

বললাম, 'কিন্তু ওদের ওপর ভরসা করা ছাড়া তোমার আর উপায় কি ? তাছাড়া কথা কি জানো মায়া, এরাই হল তোমার আসল বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী, পরিত্রাতা। কারণ এরা তোমার সমগোত্রীয়। সমগোত্রীয় নির্যাতিত মানুষ ছাড়া নির্যাতিতের কোন বন্ধু নেই, শুভাকাঙ্ক্ষী নেই—'

মায়া এর পর আরও যেন কি বলতে যাচ্ছিলো, আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, 'যা বলছি তাই কোরো—আমি চললাম।' বাস্তবিক কথাগুলো বলতে যেটুকু সময় লেগেছিল আমি তার বেশি দেরি করলাম না বেরিয়ে পড়লাম। আমার যেন তখন কেবল মনে হতে লাগল দেরি করলেই যেন আমার সবকিছু গোলমাল হয়ে যাবে, আমি আমার ঈপ্সিত ফললাভ করতে পারব না। আজকের খবরের কাগজে বিশেষ একটি খবর আমাকে যারপর নাই উৎসাহিত করে তুলেছে। আমার মনে হচ্ছিল, একবার আমি যাকে পেয়েছিলাম, তাকে আবার হারিয়েছি—এখন আমাকে আবার তাকে পেতে হবে, পেতে হবে হয়ত তাঁরই জন্য কিংবা হয়ত শঙ্কর আর মায়ার জন্য। তবে পেতে তাঁকে আমার হবেই এবং সে পাওয়া আমার এই পথ ধরেই।

আজ এতদিন পরে জোর করে, চিৎকার করে আমি বলতে পারি, আমার অনুমান বলুন, হিসাব বলুন কিংবা ইংরেজীতে যাকে ইনট্যুইশন বলা হয়, তাই বলুন—তা ছিল সম্পূর্ণ নির্ভুল। তা দেখে যে কোন লোকই আমার বিশ্বাসের দৃঢ়তার মূল্য না দিয়ে পারবেন না। আমি এসে উঠেছিলাম কারনানী ম্যানসনে।

সেই কারনানী ম্যানসন। সারি সারি ফ্ল্যাট। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এদিকে ওদিকে ঘুরেছি। জানবার চেষ্টা করেছি কোন্‌দিকে কে আছেন। কাকে চাই নির্দিষ্টভাবে কোন কথাই আমি কারোকে

বলি নি। কেবল করিডর আর ফ্লাটগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটেছি, উঠেছি আর নেমেছি, নেমেছি আর উঠেছি। আমার মনে কেমন যেন একটা দৃঢ়বিশ্বাস, এখানেই আমি তাঁকে দেখতে পাব, যাঁকে আমি দেখতে চেয়েছি। ঘুরতে ঘুরতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। নামা-ওঠা আর ওঠা-নামায়, ঘোরা-ফেরায় পা দুটো আমার টন টন করে উঠেছে। কত চোখের কত চাহনি বার বার আমার ওপর পড়তে দেখেছি, তবু আমি হতাশ হই নি, ব্যর্থমনোরথ হবার বিলাসিতায় নিজেকে ভাসিয়ে দিই নি। চোখের সামনে দিয়ে দেখতে দেখতে দিন শেষ হয়ে গেল। ফুটে উঠল চোখের সামনে সন্ধ্যার ঘনায়মান অভিসারিকা মূর্তি। রকমারী আলো জ্বলে উঠল ফ্ল্যাটের বাইরে আর ভেতরে। কোথাও কোন কক্ষ উন্মুক্ত, কোথাও অবরুদ্ধ। কোথাও মানুষের সহজ জীবনের প্রকাশ, কোথাও বা জটিল জীবনে যেন কপাট আঁটা। কবির কথা মনে পড়ল ঃ পর দীপমালা নগরে নগরে। তুমি যে তিমিরে তুমি সেই তিমিরে। সত্যিই তখনও পর্যন্ত আমি যে তিমিরে ঠিক সেই তিমিরে। এখানকার পরিবেশটা যেন আমার কাছে একেবারে বোবা।

কে জানে, অনেক আশা করেছি বলেই হয়ত আমার এখন এই অবস্থা! আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আমার খবরের কাগজ পাঠ করা মনের অননুভবনীয় আনন্দের শেষ পরিণতিটা কি এই রকম হবে? সত্যিই আমার অভিযান কি আজ এমনি বন্ধ্যা-চেষ্টার মধ্য দিয়ে ব্যর্থ হয়ে যাবে?

সন্ধ্যার চঞ্চল অভিসারিকাবেশ কখন ঘন হয়ে এল। নিবিড় নিশীথিনীর কৃষ্ণকালো মূর্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তারপর। করিডরে দাঁড়িয়ে তাকালাম দূরে ধোঁয়াটে আলোর হাসিতে কলকাতা ক্লান্ত। আকাশে অসংখ্য তারা পৃথিবীর সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে যেন। দূরে ঘণ্টা বেজে যাচ্ছে ঢং ঢং—এ ঘণ্টা সন্ধ্যারতির নয়, গির্জার নয়, বৌদ্ধদেরও নয়, এ ঘণ্টা বোধ করি কোন জেলখানার, কয়েদী জগৎকে

স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে সময়ের মাপকাঠি দিয়ে, সভ্যতার সোপানে উঠতে।

তবে কি আমায় শেষ পর্যন্ত ফিরে যেতে হবে এখান থেকে? অনেক আশা নিয়ে, অনেক বিশ্বাস নিয়ে অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়ে আমি এখানে এসেছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ আমার কি হল? আমি আসার সময় মায়া আমাকে বলেছিল, 'আপনি যেখানেই যান দাদা, একটু সকাল সকাল ফিরবেন।' কিন্তু সকাল সকাল ফেরা তো দূরের কথা, এ যা রাত হয়েছে, এরপর আমার ফেরাও বোধ করি মুশকিল হয়ে পড়বে। কারণ রাতে এখানে থাকা বা পথ দিয়ে যাওয়া দুই-ই বিপজ্জনক হয়ে পড়তে পারে। সত্যিই আমার আত্মবিস্মৃত আত্মসন্তুষ্টির কোন অর্থ নেই। খবরের কাগজের একটা সংবাদকে এতখানি গুরুত্ব দিয়ে মনে মনে অতিরিক্ত কতকগুলো কল্পনা গড়ে তোলা আমার উচিত হয়নি। আমি নিজের ওপরই নিজে কেমন যেন কঠিন হয়ে উঠলাম। হ্যাঁ, জানি, এরপর অনুশোচনায় মন ভরে উঠবে আমার, ধিক্কার দেবো নিজেকে এবং শত বৃশ্চিকের দংশনের মত ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্সে ভুগতে থাকব নিরন্তর। কিন্তু না, সেখান থেকে আমাকে ফিরে আসতেই হবে।

সংবাদপত্রে খবরটা যখন আমি দেখেছিলাম—ডি-সি সেন্ট্রাল এসে উঠেছেন এখানে, তাহলে তাঁরই খোঁজ করা আমার উচিত ছিল সবচেয়ে আগে। অন্তত তাতে এতক্ষণ একটা সূত্র খুঁজে পেতাম। কিন্তু আমি খুঁজতে গেছি অন্য সূত্র—যে সূত্র আবিষ্কারের নেশা আছে আমার মনে, কিন্তু খেই নেই কোথাও। ঠিক যখন এমনি সব কথা ভাবছি, এমন সময় সশব্দে একটা দরজা খোলার শব্দ পেলাম পিছন দিককার ফ্ল্যাটে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মহিলাকণ্ঠে তীব্র ভর্ৎসনা, 'লজ্জা করে না, বড় অফিসার হয়ে—'

আমি উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে গেলাম সেদিকে। এই তো—এই তো আমি যা চেয়েছিলাম তাই বুঝি, যাঁকে চেয়েছিলাম, তিনিই বুঝি।

ছুটে সামনে যেতেই দেখি, সেই ডি-সি সেন্ট্রাল পরাজিত জন্তুর মত ঘাড় নিচু করে চলে যাচ্ছে, আর দরজার সামনে বিজলী বাতির বিচ্ছুরিত দীপ্তিতে ছুরিকা হস্তে রানীদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুঁসছেন। সম্ভবত এখানে তিনি আমাকে আশা করেন নি অথবা দৃষ্টিটা তাঁর এদিকে না নিক্ষিপ্ত হয়ে ডি-সি সেন্ট্রালের দিকে ছিল বলে তিনি আমাকে দেখেও দেখেন নি ভাল করে। আমি তাই একটু এগিয়ে তাঁর দৃষ্টির পরিধির মধ্যে গিয়ে পড়লাম। কিন্তু আমার ছায়াটা করিডরের মেঝেয় পড়েছে কি না পড়েছে, ক্রুদ্ধা নাগিনীর মত রানীদি চক্ষের নিমেষে হাতের ছুরিখানা উঁচিয়ে ছুটে এলেন আমার দিকে।

আমি সভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে এসে বললাম, 'রানীদি, আ-মি-ই।'

রানীদি ভ্রূ-ছুটো প্রায় একটা বিন্দুতে একত্র করে সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'আ-মি-ই!'

আমি সেই পিছিয়ে আসা জায়গা থেকেই বলে উঠলাম, 'হ্যাঁ, রানীদি আমি।'

'ওঃ, যন্ত্রণায় ভেঙে পড়ে রানীদি বলে উঠলেন, 'আবার তুই।' তারপর যেন আমার কাছে তাঁর সকল যন্ত্রণার অবসানের আশায় বলে উঠলেন, 'এর পর আমি কোথায় পালাবো তুই বলতে পারিস?'

আমি কোন উত্তর দিলাম না।

'রানীদিকে এই বেশে দেখতে বুঝি তোর খুব ভাল লাগে, না রে?'

'ছিঃ ছিঃ, রানীদি একি বলছ তুমি?'

'ছিঃ! ছিঃ? শয়তান, লজ্জা করে না তোর! একদিন তুই আমায় এই অবস্থায় দেখেছিলিস, তাই সেখান থেকে আমি পালিয়ে এসেছিলুম। আবার আজ তুই এসেছিস্?'

'রানীদি বিশ্বাস করো তুমি—তোমার এ অবস্থা আমি দেখতে আসি নি। তুমি আমায় বিশ্বাস করো।'

দেখলাম রানীদির পা দুটো টলে টলে যাচ্ছিল। তবু দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবার চেষ্টা করে তিনি বললেন. 'যা—যা, আমি আর পৃথিবীতে কারোকে বিশ্বাস করি না—কারোকে না।'

আমি রানীদিকে আশ্বস্ত করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তিনি তেমনি করেই বলতে লাগলেন, 'পুরুষ মানুষ তোরা—তোদের কামনা, তোদের বাসনা. তোদের লালসা—ওরে ও আমি চিনি—সব চিনি।

এবার আমি একরকম নির্ভয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। ছুরি-উঁচানো হাতখানা ধরে ফেলে বললাম, 'কাকে কি বলছ রানীদি—আমি না তোমার ভাই?'

'হ্যাঁ ভাই। কেন, আমি বেফাঁস কিছু বলছি?'

'বলছ তো!'

'না না তোকে আমি কি বেফাঁস বলব? তুই আমার ভাই, তুই আমার সন্তান, তুই আমার · কিন্তু তুই আবার এলি কেন বল্ দিকি? কেন এলি?'

'এসেছি বিশেষ কাজে।'

'বিশেষ কাজে?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা ঘরে চল আমার—আমি তোর সব কথা শুনব। শুধু ঐ লোকটাকে, ঐ শয়তানটাকে আমি আগে শেষ করে দিয়ে আসব। তুই আমায় একবার একটুখানি ছেড়ে দে খালি—'

'ও লোকটা তো সেই পুলিশ অফিসার?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওস্তাদের আড্ডায় ফূর্তি করতে যেত। লালসার দাস—ভূ-ভারতের উৎসর্গ করা বোকাপাঁটা।'

'তোমার ও পাঁটা তো পালালো এখন। তুমি ওকে ধরবে কি করে?'

'একেবারে পালালো?'

'তাইতো মনে হল।'

'শয়তান কাপুরুষ,' দাঁতে দাঁত চেপে রানীদি বলে উঠলেন।

আমার খবরের কাগজের খবর পড়া সার্থক হয়েছে। রানীদি টলে টলে পড়ছিলেন। আমিই তাঁকে ধরে ধরে যে দরজা দিয়ে তিনি বেরিয়েছিলেন সেই দরজা দিয়েই তাঁকে ঘরে নিয়ে গেলাম।

এ ঘরের সঙ্গে রানীদির রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি দিয়ে সাজানো ঘরের অনেক তফাত। সে ঘর ছিল মাটির ঘর। আর এঘর সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রশস্ত হলঘরের মত ঘর। দামী দামী আসবাবপত্র দিয়ে ঘরখানা সাজানো অদ্ভুতভাবে। মেঝেয় পাতা দামী কার্পেট। দু দিকে পাতা বড় বড় সোফা। বড় বড় জানালার ধারে একখানা সুন্দর পালঙ্ক পাতা। তাতে দুগ্ধ ফেননিভ শয্যা। পাশে একটা শ্বেতপাথরের গোল টেবিল। টেবিলে সামান্য পানীয় আর রাতের খাবার চাপা দেয়া। ঘরের একদিকে একখানা বড় বুক্‌কেস—তাতে অনেক কিছু সাজানো। নিচের তাকে কয়েকখানা দামী দামী বই —রানীদির কলেজে পড়ার সময়কার বই। বুককেসের পাশে একটা কাঠের পায়া দেয়া স্ট্যাণ্ড, তার ওপরে শরৎচন্দ্রের একখানা আবক্ষ মর্মর মূর্তি।

ঘরের পরিবেশ দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। একটা পরিচ্ছন্ন মনের অভিব্যক্তি সর্বত্র বিদ্যমান। বিশেষ করে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম শরৎচন্দ্রের মূর্তিখানি দেখে। বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষের অনেক বড় বড় বাড়ি আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে—বুদ্ধমূর্তি থেকে যীশুখ্রীস্ট, এমন কি রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ অনেকেরই মূর্তি দেখা গেছে সে সব বাড়ীতে কিন্তু শরৎচন্দ্রের আবক্ষ মর্মর মূর্তি আমি কোথাও দেখি নি। দেখলাম সর্বপ্রথম এখানে কারনানী ম্যানসনে রানীদির এই ঘরে।

রানীদিকে এ-কথাটা জিজ্ঞাসা করবার সময় এটা নয়, তাই চুপ করে গেলাম, নইলে আমি জিজ্ঞাসা করতাম।

রানীদি হাতের ছোরাটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পালঙ্কের বিট ধরে ঘুরে দাঁড়ালেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দরজাটা ভাল করে এ'টে দিয়ে আয় তো আগে।'

আমি বললাম. 'থাক না খোলা।'

রানীদি ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, 'কেন তোর ভয় করছে নাকি ?'

'ভয়—ভয় কিসের রানীদি ?'

'অসতী কুলটা মেয়ের ঘরে একলা থাকবি আর ভয় করবে না তোর ?'

এবার বিরক্তভরে বললাম, 'মাঝে মাঝে তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছো রানীদি—'

'সে কি আজ নতুন যাচ্ছিরে', রানীদি টলতে টলতে বললেন, 'অনেকদিন আগেই গেছি। তুই জানিস না। তা না হলে যেদিন তোকে খেতে বলেছিলুম, সেদিন তুই কিভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার করেছিলি, সেকথা কি ভুলে গেছিস ? আমি অসতী কুলটা রানীদি তোর—ওরে বিজন .'

হঠাৎ রানীদি মেঝের সেই কার্পেটের ওপর কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়লেন। তারপর উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, 'সেদিনের পর আমি পালিয়ে এসেছিলুম লজ্জায়, ঘৃণায়·· কিন্তু আবার তুই এখানে আসবি আমার সেই কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে, ওরে বিজন, এ আমি কখনো ভাবিনিরে, কখনো ভাবি নি।'

সেইখানে সেই ঘরে দাঁড়িয়ে আমার মনে হল এ যেন অদ্ভুত নাটকের এক অদ্ভুত সংকট ও আবেগময় দৃশ্যের মুখোমুখি এসে আমি পড়ে গেছি—এ থেকে যেন আমার কোনদিনই নিস্তার নেই।

ভাবলাম এই রকম নাটকীয় দৃশ্য যখন ভিতরে, তখন দরজাটা না খোলা থাকাই ভাল। পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছে যারা এ নাটকের কোন মূল্য দেবে না, পক্ষান্তরে হয়ত অন্য কিছুও মনে করে বসতে পারে। তাই দরজাটা ভাল করে এঁটে দিয়ে এলাম।

রানীদি এতক্ষণ কার্পেটে উপুড় হয়ে কাঁদছিলেন। আমি দরজাটা দিতেই কি খেয়াল গেল একেবারে দাঁড়িয়ে উঠে বিছানা থেকে ছোরাখানা তুলে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁরে বিজন, এটাকে তোর মনে পড়ে রে?'

'পড়ে কিন্তু এত কথা থাকতে তুমি শুধু একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?'

রানীদি ছোরাখানাকে চোখের দৃষ্টির সমান্তরালভাবে তুলে ধরতে ধরতে উঁচু দিকে উঠিয়ে বললেন, 'এটাই আমার জীবনের প্রথম এবং প্রধান সাক্ষী। যে কখনো আমার আসল পরিচয় ঘোষণা করতে পিছিয়ে যাবে না।'

'কিন্তু আজ তুমি ডি সি সেন্ট্রালকে ঐ ছোরা দিয়ে তেড়ে গিসলে কেন?'

'আরে সেই কথাটাই তো তোকে এতক্ষণ বলছিলুম—তুই বুঝতে পারলি না!'

'কি করে বুঝব, তুমি তো মদ খেয়ে মাথা খারাপ করে বসে আছে। তোমার কথা আমি বুঝব কি করে?'

'মদ খেয়েছি তুই বুঝতে পেরিছিস?'

'কেন পারব না।'

'তা বুঝেচিস বুঝেচিস কিন্তু মদ কি খুব খারাপ জিনিস রে?'

'তাই তো জানি।'

'ভুল, ওরে ভুল', রানীদি যেন হাসিতে ফেটে পড়লেন। তারপর বললেন, 'মানুষ ঠকায়, ডাক্তার ঠকায়, ওষুধ ঠকায়, মহাপুরুষদের বাণী ঠকায় কিন্তু মদ কখনো কারোকে ঠকায় না। মদ বিস্মৃতি

আনে, মদ স্মৃতিকেও ফিরিয়ে দেয়, মদ কাঁদায় কিন্তু মদ হাসাতেও জানে। ওরে জীবনভোর আমি কেঁদেছি মদ খেয়ে কিন্তু জীবনভোর মদ আমায় হাসিয়েছে রে বিজন—আমি প্রাণ খুলে হেসেছি। আয় আয় তুই যখন আজ এসে পড়েছিস তখন তোকে সব হাসিরই গল্প শোনাবো, অনেক হাসির গল্প।'

'কিন্তু আমি এসেছিলাম তোমার কাছে এক বিশেষ কাজে—'

'তোর সেই কাজ, কাজ, কাজ,' রানীদি আমাকে দুটো হাত ধরে টেনে এনে খাটে বসিয়ে বললেন, 'রাখ তোর কাজ। রানীদি তোর মদ খেয়েছে কিন্তু সে কেঁদেছে না হেসেছে, হেরেছে না জিতেছে—সেকথা তোকে আজ বলতেই হবে, বলতেই হবে বিজন। তা না হলে তুই আমার ভাই নস—তুই আমার শত্তুর, তুই আমার শত্তুর!' কথাগুলো বলে রানীদি ঠিক সেই আগেকার মত আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।'

আমি বললাম, 'বলব—বলব। তুমি আমায় ছেড়ে দাও আগে রানীদি—'

'না, না আমি কিছুতেই ছাড়ব না'—রানীদি যেন আমাকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরতে লাগলেন।

বুঝলাম অপ্রকৃতিস্থ রানীদির অবস্থাটা।

একসঙ্গে অনেকগুলো চিন্তাস্রোত তাঁর মনে তোলপাড় করে চলেছে। আমাকে তেমনিভাবে বুকে চেপে ধরে রানীদি সব কিছু ভাবনার বোঝা যেন মুহূর্তের মধ্যে আমার ঘাড়েই ফেলে দিতে চাইলেন। তাঁর কথার মধ্যে প্রথমত আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল ঃ আমি জানতে পেরেছিলাম ওস্তাদের আড্ডায় তাঁর জীবন-ধারার রহস্য—তাই সেই লজ্জার হাত থেকে বাঁচবার জন্য তিনি পালিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তার মধ্যেও একটা কথা রয়ে গিয়েছিল যেন। সে কথাও আজ তিনি পরিষ্কারভাবে দ্বিধাহীনচিত্তে বলে ফেললেন। সেই আমাকে খেতে বলার দিনটা তিনি উল্লেখ

করেছেন। সেদিন নাকি আমি তাঁর সঙ্গে এমন ব্যবহার করেছিলাম, যে ব্যবহার সত্যি সত্যিই তাঁর মনে লেগেছিল। অর্থাৎ আমি যদি সেদিন রানীদির সব কথাটা উপলব্ধি করে সমবেদনার আবেগে তাঁর জ্বালাটা প্রশমিত করতাম, হয়তো তাহলে রানীদি পালিয়ে আসতেন না। জানি না রানীদি এই কথাটাই তার মধ্য দিয়ে আমাকে বোঝাতে চেয়েছেন কিনা।

সেদিন রানীদির সঙ্গে আমি কিভাবে ব্যবহার করেছিলাম? রানীদির বুকের মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় হঠাৎ আমার সেদিনের কথা মনে পড়ে গেল। সেদিন খেয়ে আমার তৃপ্তি হয়েছিল কিনা, তিনি তা জিজ্ঞাসা করার মধ্য দিয়ে আমাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। বাস্তবিক সেদিন সোজাসুজি তাঁকে আমি জবাব দিই নি—জবাব দিয়েছিলাম মণ্টু আর মায়ার মাধ্যমে। সেটা তাঁর নিশ্চয়ই মনে লাগবার কথা। তাতে তিনি বুঝে নিয়েছিলেন ওস্তাদের আড্ডায় আগের রাতের ঘটনা আমি নিশ্চয়ই সহজ মনে এবং ভালভাবে গ্রহণ করি নি। তা করলে খাওয়ার মধ্যে তৃপ্তির প্রশ্নে আমার কোন দ্বিধা থাকত না। এক সময়ে তিনি সে কথা বলেও উঠেছিলেন, 'বিজনকে আজ খেতে বলেছিলুম, কিন্তু শুধু খাবার জন্যই খেতে বলি নি। ওকে খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে ওর সঙ্গে অনেক গল্প করব মনে করেছিলাম। আমার যে কত ভাল লাগে সেই সব পুরনো গল্প, কিন্তু কি করব, ও এল যেন আজ একেবারে গম্ভীর সন্ন্যাসী ঠাকুরটি। মানুষের মনের কথা ও বুঝতেও পারলে না।' কথাগুলো তিনি মায়া আর মণ্টুকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন বটে, কিন্তু আসল লক্ষ্যটা যে আমাকে চাবুক মারা তা আমি রীতিমত উপলব্ধি করেছিলাম এবং মণ্টু আর মায়া ঘর থেকে চলে গেলে সে অনুযোগ আমি রানীদির কাছে উপস্থাপিত করেছিলাম।

রানীদি আমার কথায় কর্ণপাত করেন নি। নিজের আহত মনের অভিব্যক্তিকে ভিত্তি করে বলে উঠেছিলেন, 'বুঝি রে বিজন বুঝি—

পুরুষ মানুষ তুই। মেয়েদের সম্বন্ধে তোরা একটা কথাই শিখে রেখেছিস—আর, সে কথাটা তার অসম্মানের কথা, তার নিচে নামার কথা। মেয়েরা যে পাঁকেও পদ্মফুলের মত ফুটে ওঠে—সে কথা তোরা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারিস না।'

সত্যিই হয়তো পুরুষ মানুষের স্বভাব তাই।

কিন্তু আমি তো জীবনে এসব তলিয়ে দেখি নি। তলিয়ে দেখার আমার সুযোগও আসে নি কখনো। তাই আমি তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম শুধু। বেশ মনে আছে সে সময়ে রানীদির চোখেমুখে ফুটে উঠেছিল একটা যন্ত্রণাকাতর অভিব্যক্তি। প্রাণপণে তিনি আমাকে বোঝাতেও চেয়েছিলেন। সেদিন এই প্রসঙ্গ লিখতে গিয়ে আমি বলেওছিলাম সে কথা, যদি কখনও সুযোগ আসে বলব। কিন্তু শুনতে শুনতে আমি আর সহ্য করতে পারি নি, উঠে পালিয়ে এসেছিলাম রানীদির কাছ থেকে।

সেদিন রানীদি আবেগকম্পিত কণ্ঠে আমাকে বলেছিলেন, 'আমি এখানে এসেছি, কিজন্য এসেছি পৃথিবী হয়তো কোনদিনই জানবে না বিজন। আমার পরিচয় হয়তো এইভাবেই চিরদিনের জন্য লেখা হয়ে যাবে—একটা মেয়ে কুলত্যাগ করে চলে এসেছিল দুরন্ত কামনার আবেগে। হ্যাঁ, কামনা বাসনা আমার সত্যিই ছিল। আজও আছে। আর একথাও সত্যি তারই আবেগে আমি এসেছি। কিন্তু সেই কি আমার সব? বিজন, আমার রূপ আছে, আমার যৌবন আছে—তুই দ্যাখ, চেয়ে দ্যাখ আমার এ রূপের অগ্নিশিখা কেমন লক্ লক্ করে ওঠে—'

আমি বলেছিলাম, 'ছিঃ আমাকে তোমার রূপের কথা বলতে লজ্জা করছে না?'

'লজ্জা—লজ্জা করবে কেন', রানীদি বলেছিলেন, 'আমার রূপের শিখা যখন আগুনের মত লক্ লক্ করে ওঠে, তখন বিজন আমি পুড়ে মরি না রে, পুড়ে মরে ওরা।' কথাগুলো বলে তারপর তিনি সেদিন

সেই দুপুরে এমন হেসে উঠেছিলেন যে, প্রকৃতিস্থ অবস্থায় অমন ভয়ঙ্কর হাসি কখনো কোন মহিলাকে আমি হাসতে দেখি নি। বীভৎস সে হাসি, কিন্তু অত্যন্ত তেজোদ্দীপ্ত। হাসতে হাসতে তিনি বলেছিলেন, আমার রূপের আগুনে পুড়ে মরতে ওরা ছুটে ছুটে আসে—ঠিক যেমন করে আসে কীট পতঙ্গ তেমনি করে। ওদের সর্বাঙ্গ পুড়ে খাক্ হয়ে যায়। কিন্তু ওদের স্বভাব হচ্ছে জন্তুর স্বভাব। ওরা আঁচড়ায় কামড়ায় আবার পায়ে মাথা খোঁড়ে, সুর করে মড়াকান্না কাঁদে। জানোয়ারের কামনা কত মর্মান্তিক হাস্যকর তা তুই দেখিস্ নি রে, তা তুই দেখিস্ নি! যদি দেখতে চাস—

আমি চোখ দুটো বুজে ফেলে বলেছিলাম, 'না না রানীদি, তুমি এসব কথা আমাকে বোলো না। শুনিও না—আমি এ বেশ আছি—'

'তুই শুধু আমার হাসিটাই দেখলি', রানীদি বলতে লাগলেন, 'দেখলি না তার আড়ালে আমার সর্বংসহা জীবনের গভীর ক্ষতগুলো। তোকে আজ দেখতেই হবে। কাল রাতে যে মূর্তি তুই আমার দেখিছিস, সেই আমার সব নয়। চেয়ে ছ্যাখ তুই চেয়ে ছ্যাখ ··সঙ্গে সঙ্গে মনে আছে সেদিন রানীদি পিছন ফিরে ব্লাউজখানা খুলে ফেলে আঁচলটা বুকে চাপা দিয়ে দু' পাশের পাঁজরা দুটো আমাকে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'এই যে সব সাদা সাদা অজস্র দাগ ওগুলো জন্তুজানোয়ারদের নখের আঁচড়। ভাবতে পারিস তুই—ভাবতে পারিস্ রে?'

রানীদি কি বলতে চাইছিলেন তা আমি বুঝতে পারি নি, কিন্তু ঘটনার গুরুত্বে আমার মাথা যেন কেমন ঘুরে গিয়েছিল বলে অনুভব করছিলাম।

এবার রানীদি যেন আরও কঠিন হয়ে বলে উঠলেন, 'এরপর আরও দেখবি, আরও ..'

বলেছিলাম, রানীদি না না—আমি ওসব দেখতে চাই না। তুমি এমন করে নিজেকে তুমি যা নও তা প্রমাণ করতে যেও না।'

'কি বললি তুই ?' রানীদি যেন গর্জন করে উঠলেন।

আমি বললাম. 'যা বলেছি ঠিক বলেছি—'

'না না না', রানীদি আঁচলটা চট্ করে বুকে আর গলায় জড়িয়ে নিয়ে পা দুটো ছড়িয়ে দিলেন বসে বসে। তারপর হাঁটুর ওপরে উরুদেশ পর্যন্ত কাপড়টা সরিয়ে দেখালেন কতকগুলো বড় বড় দাগ। আমি চকিতে একবার দেখলাম দাগগুলো। তারপর মুখ তুলতেই দেখলাম রানীদির ঠিক্‌রে পড়া আগুনের মত দৃষ্টি। বললেন, 'কি জানিস এগুলো—এগুলো হচ্ছে জন্তুদের কামড়! বিজন, এ শুধু এখানেই নয় চেয়ে ছাখ ..তারপর তিনি আমাকে দেখালেন তাঁর গণ্ডদেশ!

আমি যেন আর সহ্য করতে পারছিলাম না। জীবনে কখনো আমি এ পরিস্থিতির সম্মুখীন হই নি। জানিও না এসব ঘটনা ঘটে পৃথিবীতে। বাস্তবিক আমি তখন যেন কাঁপছিলাম থর থর করে। রানীদি তেমনিভাবেই বলে যেতে লাগলেন, বিজন আমারও কামনা আছে, কিন্তু তোকে আমি কেমন করে বোঝাবো যে আমি ভেসে যাই নি, আমি পাঁকে নামি নি। আমি তোকে কেমন করে বিশ্বাস করাবো যে যদি আমার কখনো সন্তান হয় তবে তার জন্মদাতা হবে একমাত্র আমার স্বামী, অন্য কেউ নয় অন্য কেউ নয়। সর্বদা আমি আমার সেই ধ্যান সেই ধারণাকে বজায় রেখে এসেছি এত হিংস্রতার মধ্যেও। কিছুক্ষণ আগে আমার হাতের ছোরাখানা তুই দেখেছিস্—হ্যাঁ সেই ছোরাখানাই আমার নিত্য সহচর, আমার মানমর্যাদা রক্ষার বিশ্বস্ত প্রহরী, একমাত্র সেই আমার সাক্ষী, ভরসা, আমার স্বামীর মত আমার একান্ত আপন। ওরই জন্যে কখনও আমি কারোকে ভয় করি নি, করবও না কোনদিন!'

'তাই যদি তোমার মনের কথা হয়.' আমি বলেছিলুম, 'তুমি এখানে এসে উঠেছ কেন? নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে আজ তুমি আমাকে কি বোঝাতে চাইছো?'

রানীদি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন এরপর, 'তবুও তুই আমাকে অবিশ্বাস করছিস্ ?'

'আমি যে নিজে চোখে দেখেছি তোমাকে।'

এরপর রানীদি ফুঁসে উঠেছিলেন আর বলেছিলেন, 'ওরা গান্ধী-টুপি মাথায় দিয়ে কেউ মন্ত্রী, কেউ রেলের বা পুলিশের বড় অফিসার, কেউ সমাজসেবী, কেউ বড় ব্যবসায়ী—খবরের কাগজে ওদের ছবি বেরোয় বাণী প্রচারিত হয়। ওরা তোদের চোখে সাধু সজ্জন গণ্যমান্য ব্যক্তি—আর তোর রানীদি যে সারা জীবন ধরে খুঁজে খুঁজে ফিরেছে মাত্র একটি মানুষের একটুখানি আশ্রয়, একটুকু ভালবাসা সে চিরকাল থাকবে ঘৃণ্য হয়ে, অপরাধিনী হয়ে? এই কি তোদের পুরুষ মানুষের বিচার, সমাজের ন্যায়দণ্ড, দেশের ধ্যানধারণা? বল্ বল্ বিজন, তুই বল্ আমাকে, চুপ করে থেকে তুই আমার মাথায় ঘৃণার পাঁক ছিটিয়ে দিয়ে যাস্ নি।'

সেদিন আমি আর থাকতে পারি নি সেখানে, ছুটে পালিয়ে এসেছিলাম। তিল তিল করে প্রতিমার মত গড়ে তোলা মূর্তি—আমার রানীদির সে মূর্তি ভেঙে গেছে। তার প্রতি যেন আর আমার কোন মোহ নেই। কিন্তু তারপর দীর্ঘ ক'টা মাস কেটে গেছে। প্রকৃতির বুকে ঋতু পরিবর্তন হয়েছে। এর মধ্যে আমার সামনে উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে টুনটুনি আর মন্টুর জন্মরহস্য। হ্যাঁ, তারপর থেকেই আমার চিন্তাধারাটা কেমন যেন বদলাতে শুরু করেছে রানীদির সম্বন্ধে। কে জানে হয়তো এই সূত্র ধরেই রানীদি এখানে এসে উঠেছিলেন। হতেও পারে। কেন না তিনি তাহলে এদের পেলেন কি করে? আর ওরাই বা চিনল কি করে রানীদিকে? এখান থেকেই আবার মনে আমার একটা ক্ষীণ আশা হয়েছে। তাই মনে মনে কেবলই আশা করেছি, যা জেনেছি আমি. যেন তা কখনো সত্যি না হয় এবং তা না হলেই আমি হব সবচেয়ে খুশি, সবচেয়ে সুখী।

রানীদি কিন্তু সেদিনের সে ঘটনা কিছুই ভোলেন নি। আমি আসতে না আসতেই আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আশ্চর্য এই রানীদি, আশ্চর্য তাঁর চরিত্র। এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই যে দৃশ্য দেখেছি সেও সেই অভিশপ্ত জগতেরই ধারাবাহিক একটানা জের। রানীদি বর্ণিত ভূ-ভারতের উৎসর্গ করা প'াটা যখন কাপুরুষের মত পালিয়ে গেল, তখন রানীদির করার আর কিছু ছিল না। আমার মনে হল ঠিক সেই মুহূর্তে রানীদির গোটা জীবনটা যেন তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো আর সেটাকেই তিনি আমার সামনে তুলে ধরে যেন নতুন করে আমাকে বোঝাতে চাইলেন নিজেকে।

বুকের মধ্যে বন্দী করে আমাকে একটি কথা তিনি বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ রে বিজন, আজও কি তুই তেমনি করে ঘৃণা করিস্ আমাকে?'

বললাম, 'ঘৃণা তো তোমায় আমি করি না রানীদি! তোমার জন্যে আমি আহত--'

আমাকে ছেড়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'আমার জন্যে তুই আহত?'

'হ্যাঁ রানীদি।'

'আমাকে বেশি ভালবাসতিস্ বলে তোর বেশি লেগেছে—এ আমি জানি। আর তারই জন্যে আমি সেই অভিশপ্ত জগৎ থেকে চলে এসেছি এই দূরে, তোর দৃষ্টির বাইরে।'

'এটাই কি ঠিক কথা রানীদি?'

'হ্যাঁ রে। তুই বিশ্বাস করতে পারছিস্ না?'

'বিশ্বাস করতাম যদি না তোমার ঐ ভূ-ভারতের প'াটাটিকে এসেই দেখতাম।'

'কিন্তু কিভাবে তুই ওকে দেখলি সে কথা একবার ভেবে ছাখ্।'

'হ্যাঁ তাও দেখেছি, কিন্তু ও তোমার সন্ধান পেলে কি করে, আর তাছাড়া লোকটা তোমার কাছে এলই বা কেন?'

'এল কেন,' রানীদি বললেন, 'সে কথা তো বুঝে নেয়া উচিত।

তবে সন্ধানটা পেলে কি করে সে কথাটা আমিও ভাবছি। অবিশ্যি পুলিশের লোক ওরা, নানাভাবে ওরা খবরাখবর রাখে।'

রানীদির একথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। আমি তারপর রানীদিকে খবরের কাগজে লোকটার সম্বন্ধে খবরটি উল্লেখ করে বললাম, 'তুমি এসব জানো কি?'

'না জানতুম না—তবে ও-ই আমাকে আজকে জানিয়ে দিলে।'

'ও-ই জানালে?'

'হ্যাঁ।'

'তাতে ওর কি লাভ?'

'লাভ—লাভ নিজের বুদ্ধির দৌড় দেখানো। তাছাড়া—'

'তাছাড়া?'

'তাছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ জানতে পারবে না, অতএব আমাকে লোকটা নিজের করে পেয়ে যাবে এই ওর ধারণা।'

একথা আমিও বুঝেছিলাম খবরটা পড়েই। তা ছাড়া আড্ডার মধ্যেও রানীদির জন্যে ওদের কাতরানি আমি নিজে প্রত্যক্ষ করে এসেছি। সম্ভবত রানীদির রূপের আগুনে পুড়ে মরতে ওরা ভালবাসে। রানীদির কথায় আমার মন বেশ নরম হয়ে এসেছিল। তবু মনের মধ্যে সেই একটি প্রশ্ন বারে বারে আবর্তিত হয়ে উঠছিল: 'রানীদি তুমি এলে কেন এপথে, কেন এলে সে কি আমাকে সোজাসুজি বলতে পারো?' প্রশ্নটা রানীদিকে করতেও পারছিলাম না। কারণ একটা সূত্র, টুনটুনি আর মন্টুর জন্মরহস্যের সূত্র আমি আবিষ্কার করেছি—মুহূর্তের ভুলে রানীদির কাছ থেকে আসল জবাব সে সম্পর্কে হয়তো নাও পেতে পারি। রানীদি হয়তো ওদের কথার মধ্য দিয়ে নিজে পাশ কাটিয়ে যাবার রাস্তা খুঁজে নিতে পারেন।

ঘটনার আকস্মিকতায় রানীদির নেশাটা বোধ হয় দ্রুতই কেটে যাচ্ছিল। আমাকে সোফায় বসতে ইঙ্গিত করে বললেন, 'কিন্তু তুই আজ হঠাৎ এখানে এলি কি করে?'

বললাম, 'ঐ খবরের কাগজ—'

'খবরের কাগজ দেখে তুই কি করে বুঝলি যে আমি এখানে আছি?'

'তা না হলে তোমার ভূভারতের পাঁটার খবর ওভাবে বেরুবে কেন?'

রানীদি আমাকে তারিফ করে বললেন, 'তুই দেখছি গোয়েন্দারও ওপর যাস।'

'সেইজন্যই তো রানীদি তোমার সব কথা আমি সব সময়ে বিশ্বাস করতে পারি না। বললাম, তুমি তো জানো রানীদি আমার মনের মধ্যে সব সময়ে একটা অনুসন্ধিৎসু মানুষ আছে। আমি যে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারি না। যতক্ষণ না আমার শেষ কথা জানা হচ্ছে ততক্ষণ আমি কেবলই হাতড়াই, হিসাব মেলাই।'

'আজ কি হাতড়ালি, কি হিসাব মেলালি বল দেখি?'

'সবই হিসেবে মিলেছে রানীদি। শুধু মিলল না তোমার মদ খাওয়াটা।'

'কেন?'

'তুমি যখন চলেই এসেছিলে ওখানকার আড্ডা থেকে, তখন তো তোমার মদ খাবার কথা নয়। তুমি নিশ্চয়ই ওসবকে পরিত্যাগ করবে এই ছিল আমার বিশ্বাস। অথচ—'

'হ্যাঁ ঠিকই বলেছিস। সেই রাতে যেদিন তুই আমাকে ওখানে দেখেছিলিস সেইদিনই আমি ছেড়ে দিয়েছি ঐ জিনিস। কিন্তু এই লোকটা এসেছিল, সঙ্গে নিয়েই এসেছিল মদ, ওর কাছে নিজেকে আড়াল করব না বলে, ওকে আমার মনের কথা জানতে দেব না বলে—খেয়েছিলুম। আর অনেকদিন পরে খেয়েছিলুম বলে একটু বে-সামালও হয়ে পড়েছিলুম। এখন—

'এখন আর কি', বললাম, 'আমার হিসাবই মিলে গেল।'

সেই রাতে প্রকৃতিস্থ রানীদির সঙ্গে আমার অনেক কথা হল।

সর্বপ্রথম তিনি নিজের খাবারটা খাওয়াতে এলেন আমাকে। আমি কিছুতেই শুনলাম না। দু'জনে একসঙ্গে সেই খাবার খেলাম। তারপর কত গল্প, কত কথা। আমি একে একে বললাম. মণ্টু আর টুনটুনির জন্মরহস্যের কাহিনী। অবাক হয়ে গেলেন রানীদি। মণ্টুর গুলী লাগার কথায় রানীদি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তারপর আমার রক্ত দেওয়ার কথায় তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, 'তোর ঋণ কখনো শুধতে পারব না বিজন। ভাগ্যি তুই ছিলি !'

এরপরে মায়া, শঙ্কর আর তাদের মায়ের কথাও বললাম। সব শুনে রানীদি বললেন, 'মুশকিল কি জানিস—মুশকিল হচ্ছে ঐ বসন্ত-টাকে নিয়ে। বসন্তই হচ্ছে এই অভিশপ্ত জগতের সবচেয়ে বড় ক্ষমা-হীন নিষ্ঠুর চরিত্র। ওর কপালে কাটা দাগটা দেখেছিস্—'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

ঐ দাগটা আমিই এঁকে দিয়েছিলুম ওর কপালে।

'তুমি ?'

'হ্যাঁ। তখন আমি প্রথম এসেছি এখানে। ক্ষুধিত জানোয়ারের মত ও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমার ওপর। কিন্তু আমি যে সর্বদাই প্রস্তুত থাকি সে তো আর ও জানত না—ব্যস্ বসিয়ে দিলুম একটা ঘা ওর কপালে। সে এই ছুরি।—এরই দুরন্ত আঘাত ওর কপালের সেই চিহ্নটা। ওদের ওস্তাদ তারিফ করেছিল আমাকে।

বসন্ত সম্পর্কে রানীদির মতামতটার সঙ্গে আমার কোন গরমিল নেই। আমিও জেনেছি লোকটা রীতিমত নিষ্ঠুর। ও পারে না এমন কোন কাজ নেই। কিন্তু রানীদি তার কপালে ছোরা বসিয়ে দেয়ার যে কাহিনী বললেন, তা থেকে আমার আরও যেন কিছু কথা মনে হতে লাগল। ওদের ওস্তাদ তারিফ করেছিল রানীদিকে। কেন—ওস্তাদ কেন তারিফ করবে রানীদিকে ? বসন্ত ওস্তাদের ডান হাত। ওস্তাদ যেখানে সম্রাট, বসন্ত সেখানে মন্ত্রী। সেই বসন্তকে আঘাত করলে ওস্তাদ কেন তারিফ করতে যাবে রানীদিকে ? তার

তো রাগ হবে, সে তো প্রতিহিংসায় ফেটে পড়বে! সে তারিফ করতে যাবে কেন ?

মায়ার মা বলেছিলেন, রানীদি ওস্তাদের রক্ষিতা। তবে কি সে কথাই সত্যি ?

কথায় কথায় রাত্রি ভোর হয়ে এসেছিল। আমি বললাম, 'রানীদি এবার আমাকে যেতে হবে। মায়ারা আমাকে সকাল সকাল ফিরতে বলেছিল. কিন্তু সারা রাত আমার কেটে গেল এখানে। হয়তো ওরা কত ভাবছে কিম্বা ওদের কোন বিপদও ঘটতে পারে। আর আমি দেরি করব না—

'তা না হয় যাব, কিন্তু আমি কি করব বল দেখি,' রানীদি হঠাৎ আমায় প্রশ্ন করলেন। আমি বললাম, 'তুমি কি করতে চাও বলো ?'

রানীদি বললেন, 'মণ্টুর জন্যে মনটা আমার কেমন ছট্‌ফট্‌ করছে।'

'তাহলে চলো—দেখে আসবে গিয়ে।'

'কিন্তু গেলে কি আর—'

'সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসতে পারবে না—এই তো ?'

'ঠিক তাই', তারপর কি ভেবে নিয়ে বললেন, 'তা হোক আমি যাব। তুই যা আমি পরে যাচ্ছি কিন্তু তুই একটু সাবধানে যাস আর একটু সাবধানে থাকিস।'

'একথা কেন রানীদি ?'

'সেকথা কোনদিন সময় এলে বলব। তবে যদি সুযোগ পাই।'

কে জানে রানীদির এ-কথার অর্থ কি। মনে নানা প্রশ্ন ঘুলিয়ে উঠল কিন্তু যেহেতু তিনি বললেন, 'কোনদিন সময় এলে বলব', সেইহেতু আমি চুপ করে গেলাম।

নাটকের এক সংঘাত মুহূর্তে আমি কারনানী ম্যানসনে এসে-ছিলাম। ফিরলাম যখন. তখন সব কিছু স্বাভাবিক আর শান্ত।

এক জায়গায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক আর শান্ত হলেও অন্যত্র বোধ হয় তা হয় না। কারনানী ম্যানসনে ভোরবেলা যখন রানী-দির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম, মনে তখন আমার কোথাও প্রশ্ন ওঠে নি যে, পথে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ব। আশ্চর্য! শিয়ালদায় এসে দেখি ভয়ানক কাণ্ড। সকাল হতে না হতেই সারা স্টেশন চত্বর জুড়ে হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ। ট্রেন চলাচল একেবারে বন্ধ। দমদম, বেলঘরিয়া, টিটাগড়, ইছাপুর, কাঁচরাপাড়ায় হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করেন— সকালের ট্রেন-গুলিতে তাঁরা নিত্যকার যাত্রী। ট্রেন চলাচল বন্ধ হওয়ায় তাঁরা আট্‌কে পড়েছেন। চাকরি রক্ষার ভয়ে আর উৎকণ্ঠায় তাঁরা বিশেষ-ভাবে ক্ষুব্ধ। স্টেশনমাস্টার থেকে রেলওয়ে স্টাফ—সবাই নিরুদ্দেশ। কে যাবে সেই বিক্ষুব্ধ জনতার সামনে?

স্টেশনের বাইরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্র রোডে—উত্তরে নারকেলডাঙা, দক্ষিণে মৌলালীর মোড়, পূর্বে বেলেঘাটার রাস্তা আর পশ্চিমে আমহার্স্ট স্ট্রীট পর্যন্ত। কি মহাত্মা গান্ধী রোড, কি বিপিন গাঙ্গুলী স্ট্রীট দুদিকেই একটা বীভৎস হুল্লোড় চলেছে যেন। পুলিশ কনস্টেবল থেকে রাস্তার আওয়ারা ছেলেরা ইউনাইটেড ফ্রন্ট তৈরি করে ফেলেছে। পটাপট্‌ দোকানপত্তরের তালা ভাঙা হচ্ছে, লুঠ-করা জিনিসপত্র লরীতে বোঝাই করা হচ্ছে, তারপর সেগুলো তীরবেগে উধাও হয়ে যাচ্ছে। রাস্তার জনতা আহা-উহু করলে কনস্টেবলরা তাদের দিকে তেড়ে যাচ্ছে। আওয়ারা ছেলেরা পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে তাদের শক্তিবৃদ্ধি করছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনেক সাধের স্টেট বাস—সেই স্টেট বাস চললে যাদের স্বার্থহানি হয়, সম্ভবত এই গোলমালের সুযোগ তারাও গ্রহণ করছে। চেনবার জো নেই কে কি। মহাত্মা গান্ধী রোডে একখানা স্টেট বাস জ্বলছে দাউ দাউ করে। বুদ্ধি করে ট্রাম ইতি-মধ্যেই ডিপোয় ফিরে গেছে, নইলে তাও পুড়তে দেখা যেত হয়তো।

জনতাকে ঠেলে আমি এগোতে লাগলাম। এখান থেকে অনেকখানি পথ আমার গন্তব্যস্থল। ট্রাম, বাস, রেল কিছুই যখন চলছে না, তখন হেঁটে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। তাই স্টেশন চত্বর পার হয়ে পথের সন্ধান করতে লাগলাম। বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম ব্যাপারটা যা ঘটছে তা কত সাংঘাতিক! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এত যে কাণ্ড ঘটছে, এর আসল কারণ কি তা কেউ সঠিকভাবে বলতে পারছে না। কেউ বলছে বেলঘরিয়ায় লাইন তুলে ফেলেছে, কেউ বলছে বেলঘরিয়ায় নয়, যাদবপুরে। কেউ বলছে ওভারহেড ইলেকট্রিক লাইনের তার চুরি হয়েছে, তাই এই অবস্থা, আবার কেউ কেউ একথাও বলছে কোথায় নাকি মালগাড়ি পড়ে গেছে। তাই পথ ব্লকড, তাই ট্রেন চলাচল বন্ধ।

লোকের ভিড় ঠেলে আসছিলাম। হঠাৎ নজরে পড়ল একদিকে কতকগুলো প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে। সম্ভ্রান্ত যাত্রী তাঁরা। কোন কোন গাড়িতে মহিলারাও রয়েছেন। সকলেরই মুখে-চোখে উদ্বেগের চিহ্ন। স্বাধীন দেশে একটা প্রতিষ্ঠিত সরকার থাকতে এমন একটা কাণ্ড প্রকাশ্য রাস্তায় দীর্ঘকাল একটানা কি করে চলে, তা ভাবলেও যেন বিস্মিত হতে হয়। এর কারণ কি, কে বা কারা আছে এর পিছনে? পিছন থেকে কলকাঠিই বা নাড়ছে কারা? এইসব ভাবতে ভাবতে গাড়িগুলোর পাশ দিয়ে চলতে লাগলাম।

একটি যুবক হন্তদন্ত হয়ে একখানা গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। ভিতরে উপবিষ্ট এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সম্বোধন করে বললে, 'বাবা কোন আশা নেই। আমাদের ফিরে যেতে হবে।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, 'ব্যাপারটা কি?'

'প্রায় দশ-পনেরো কিলোমিটার ওভারহেড ইলেকট্রিক তার কেটে নিয়ে গেছে মিসক্রিয়েন্টরা!'

'বল কি?'

'হ্যাঁ আমি টেলিফোন করেছিলাম ডি-এসের বাসায়। তিনি বললেন এই কথা।'

যুবকটির কথাবার্তা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। দশ-পনেরো কিলোমিটার ওভারহেড ট্র্যাকসনের তার চুরি। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোন্ জায়গায় মশাই?'

যুবকটি বললে, 'বেলঘরিয়ার পর থেকে পর পর নর্থে।'

জি-আর-পি আছে, আর-পি-এফ আছে, তবু এ তার কাটা সম্ভব, কথাটা আমার মনে ঘুলিয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু আমি এ বিষয়ে যে একেবারে অজ্ঞ তা তো নই। তবু মনের মধ্যে কিছু কিছু সন্দেহ, কিছু অবিশ্বাস যে না হল এমন নয়। রেল কর্তৃপক্ষ বিনা টিকিটের যাত্রী ধরার নানারকম চেষ্টা করেন, সে চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু রেলযাত্রীর বিনা টিকিটে ভ্রমণের সামান্য টাকার জন্য যে পরিমাণ চেষ্টা, প্রচার ও দার্শনিক তত্ত্ব তাঁরা ব্যয় করেন, তার শতাংশের একাংশ চেষ্টাও যদি তাঁরা করতেন এই তার চুরি, ওয়াগন ভাঙা, লাইন পাচার করার ব্যাপারে, তাহলে এর চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি আয় হতে পারত রেলের। এমন কি, মাঝে মাঝে আমি একথাও ভাবি—রেলের যে আয় হতে পারে তা দিয়ে ভারতবর্ষের নিভৃততম পল্লীতেও রেলকে প্রসারিত করা যায়। তার জন্য বিদেশের কাছে আমাদের হাত পাততে হবে না। কিন্তু সেদিকে কর্তৃপক্ষের কোন দৃষ্টি নেই অথবা সেদিকে দৃষ্টি দেবার পথ অবরোধ করে রাখা হয়—এর কোন একটা নিশ্চয়ই সত্যি কিংবা হয়তো দুই-ই সত্যি।

প্রাইভেট কারগুলোর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা আরেকখানি গাড়ির ভিতরে হঠাৎ আমার নজর পড়ল। বিস্ময়ান্বিতভাবে আমি সেদিকে ভাল করে তাকালাম। আমি ঠিক দেখছি. না ভুল করছি! ঐ তো সেই লোকটা, সেই কালোয়ার আর মারোয়াড়ী ভদ্রলোক! সেই যে সেদিন, যেদিন আমি প্রথম গিয়েছিলাম ওস্তাদের আড্ডায়,

সেদিন ফিরে আসার সময় যখন বসন্তের লোকেরা আমাকে চোখ বেঁধে ধরে নিয়ে গিয়েছিল আর যখন সেখানে আমার চোখ খুলে দেওয়া হয়েছিল, তখন তো আমি ওদের দেখেছিলাম। হ্যাঁ, ওরা সেই লোক। কিন্তু ওরা এখানে কেন?

মনে প্রশ্ন জাগামাত্রই আমার অনেক কথা মনে পড়ে গেল। আপাতত চলে যাওয়ার সংকল্প সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে আমি ওদের কাছে এগিয়ে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি কালোয়ার সায়েব, (ভানু এই নামে ডেকেছিল) ব্যাপার কি?'

'আপ কোন্ হ্যায়?'

'জান্‌তা নেই—বসন্ত কো আড্ডা মে—।'

এবার মারোয়াড়ী ভদ্দরলোক ঘাড় নেড়ে বলে উঠলেন, 'উঁহা গিয়া আপ?'

বললাম, 'দেখা নেই? উস্ রোজ ভানু থা, বসন্দ থা, ওস্তাদ ভি থা—আপকা গোয়েন্দা হামকো লে গয়া থা উঁহা—'

কালোয়ার বললে, 'হ্যাঁ হাঁ, উস্ বখত্ আপকা সাধুকা ড্রেস রহা—আঁখ ভি বন্‌ধ রহা!'

'হাঁ, হাঁ'. বললাম, 'তব্ তো আপ পছান লিয়া।'

এর পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে এসব কি ব্যাপার?'

কালোয়ার বললে, 'খেল লাগা দিয়া।'

আমার আর বুঝতে বাকি রইল না। সেদিন দামী মেটালের ওয়াগন লুঠের ব্যাপারে মণ্টু আহত হয়ে ফিরেছে আর আজ তার বদলে তার কাটার ব্যাপার ঘটেছে, তফাত মাত্র এই।

আমি আর ওদের ওখানে দাঁড়ালাম না। ব্যাপারটার সূত্র আমি পেয়ে গেছি। তাই কৌতূহল হল আরও কি কি ব্যাপার এখানে আছে, সবটা একবার খোঁজ করে দেখে যাই। স্টেশন চত্বরে এক জায়গায় দেখি জনকয়েক স্টেশন হকার বেশ জটলা করছে কাকে যেন ঘিরে। হকারগুলির পাশে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম কাকে

'ওরা ঘিরে আছে। উঁকি দিতেই যাকে দেখলাম তাকে দেখে আমি যারপরনাই বিস্মিত হলাম। দু' পায়ে লাল দগ্‌দগে ঘা, ক্ষত থেকে রক্ত আর পুঁজ গড়িয়ে পড়ছে। হাতের আঙুলে বীভৎস কুষ্ঠ-রোগের চিহ্ন, আঙুলের ডগাগুলো ক্ষয়ে গেছে। মাথায় পট্টি বাঁধা, পরনে চট আর সামনে একটা কোন এক ভেজিটেবিল তেলের দশ পাউণ্ডের খোলা টিনে কিছু চাল আর পয়সা'।

লোকের ভিড়ের মধ্যে সে আমাকে ঠিক দেখে নিলো। উদাস-ভাবে একটু হাসলও বোধকরি। আমি কাছে গিয়ে বললাম, 'মেক আপটা তো অদ্ভুত নিয়েছো ভানু?'

ভানু বললে, 'দাদামণি—আপনার আশীর্বাদ!'

বললাম, 'এরা সব তোমাকে এমন করে ঘিরে আছে কেন?'

'ওরাই তো সব খবরাখবর নিয়ে আসছে—আর সে সব খবর ওদের দিয়েই তো আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'ওরা কারা?'

'ওরা সব হকার! শিয়ালদায় আমরা এদের হকার করে রেখে দিই। অন্য সব হকারদের সঙ্গে মিশে থেকে এরা সব খবরাখবর রাখে। দলকে যথাসময়ে সে সব খবর যোগায়—তাছাড়া সুযোগ পেলে ওরাও যাত্রীদের মালপত্র সরিয়ে দেয়—'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'শঙ্কর আসেনি?'

'না।'

'কেন বলো দেখি?'

'সম্ভবত ও বোনের ব্যাপারে একটু ব্যস্ত আছে। বসন্তের সঙ্গে ওর কাল রাত থেকেই খুব হচ্ছে।

কিন্তু একটা কথা দাদামণি, আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। বসন্ত লোক ভাল নয়। তাছাড়া কিছুদিন হল, ও যেন কিরকম একটা ভোল পাল্টাবার চেষ্টা করছে।'

'কি রকম?'

'সে কথা পরে শুনবেন।'

পরে শুনবেন। সেই রানীদিরই মত কথা। কে জানে এরা আমাকে সবাই এরকম করে সাবধান করছে কেন!

যাই হোক, 'শঙ্করের সঙ্গে ওর বোনের ব্যাপার নিয়ে বসন্তর খুব হচ্ছে' কথাটা শোনামাত্রই আমি কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠলাম। মায়া বলেছিল যেখানেই যান দাদা—সকাল-সকাল ফিরবেন। কিন্তু ফিরতে আমি পারি নি। কে জানে মায়ার কোন বিপদ-আপদ হল কিনা। তবে ভানুর কথার মধ্যে দিয়ে যেটা পাওয়া গেল তাতে চিন্তিত হবার কিছু নেই। শঙ্কর নিজে আছে। তাছাড়া বোনের ব্যাপার নিয়ে বসন্তর সঙ্গে কাল থেকেই তার খুব হচ্ছে। এক্ষেত্রে সে না থাকলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না। তবে সে না থাকলে মায়া হয়তো খানিকটা অসহায় বোধ করতে পারে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওস্তাদ এসব জানে?'

'জানতেও পারে। অবিশ্যি শঙ্কর কি আর না বলেছে।'

আমি এবার আরও আশ্বস্ত হলাম। মায়ার কথা ছেড়ে দিয়ে আবার এখানকার কথাতেই ফিরে এলাম। বললাম, 'তোমাদের কালোয়ার সায়েব আর মারোয়াড়ী প্রভৃতিকে গাড়িতে দেখলাম।'

ভানু বললে, 'হ্যাঁ ওদের এখানেই থাকার কথা আছে।'

আমি বললাম, 'খবর কি তুমি ওদের কাছেই পাঠাচ্ছো।'

'না না, ওদের কাছে কেন পাঠাবো—ওরা তো দেখতেই পাচ্ছে।'

'তবে?'

'রেলের কর্তাব্যক্তিদের, ডি-সি সেণ্ট্রালকে আর মন্ত্রীমশায়ের বাড়িতে।'

'হঠাৎ ওদের কেন?'

'সকলেরই তো বখরা আছে, বুঝছেন না।'

বুঝি আমি সবই। কেন ওস্তাদের ছবি খবরের কাগজে মন্ত্রীর পাশাপাশি বেরোয়, সে কি আর আমি বুঝি না, তাছাড়া রানীদি-

কথিত ভূ-ভারতের বোকা পাঁঠাটি থেকে জগদীশ পর্যন্ত কাকে না আমি দেখেছি, ফেয়ারলি প্লেসকেও তো আমি জানি। এই তো জোট, এই তো সব মহাপুরুষীয় কাণ্ডকারখানা। এখানকার ঘটনা দেখে আমি এ সবই তো উপলব্ধি করে নিয়েছিলাম।

মহান একটা দেশকে, গোটা একটা জাতিকে অপদার্থ, ভণ্ড, লোভাতুর, ইন্দ্রিয়ের দাস কতকগুলো বিকৃতরুচির মানুষ কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে তা তো আর অদেখা রইল না আমার। গত রাত্রে রানীদি প্রকৃতিস্থ হবার পর অনেকক্ষণ ধরে এসব কথাও হয়েছিল। রানীদি বলেছিলেন, 'বিজন, তুই ধারণা করতে পারবি না—দেশ কোথায়, কোন্ রসাতলে চলে যাচ্ছে।'

আমি বলেছিলাম, 'কিন্তু এর জন্য দায়ী কে রানীদি? দায়ী তো তুমিও কম নও—,

'আমি', রানীদি কি যেন ভেবে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, তা কিছুটা নিশ্চয়ই বলতে পারিস। কিন্তু আমি যখন কলেজে পড়তুম, তখন কোনদিন এসব কথা ভাবি নি। আমি মনে করতুম আমার দেশের নেতারা দেশকে একটা সহজ সরল পথে সমৃদ্ধ ও মহৎ করে তুলবেন। সেই বিশ্বাস নিয়েই আমি থেকেছি। নিজের ভাগ্যবিপর্যয়ে যখন এপথে এসে পড়লুম, তখন আমি চমকে গেলুম আসল রূপটা দেখে। প্রথম প্রথম আমার খুব কষ্ট হত মনে—কিন্তু সে কষ্টকে আমি তেমন আমল দিই নি পরে। আমার ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-জ্বালা—তার জন্য আমার বাবা, আমার স্বামী দায়ী, তাই আমি দেশের যারা কর্ণধার তাদের ছোট করতে চাই নি, তাদের প্রতি কোন কটাক্ষও করতে পারি নি। কিন্তু যত দিন গেছে, ততই আমার মন বিষিয়ে উঠেছে। ওদের অনাবৃত নগ্ন চেহারা দেখে ওদের সম্বন্ধে আমি বড় কিছু মনে করতে পারি নি, ভাল বলে নিজের মনে ওদের সম্বন্ধে আমি কোন শান্তিও পাই নি। এমন কি বলতে আমার দ্বিধা নেই বিজন, যে উঁচু মন নিয়ে সারাটা জীবন আমাকে লড়াই করতে হয়েছে

নিজের সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে, সেখানে ওদের নীচতা আর নোংরামি দেখতে দেখতে আমারও মনটা যেন ছোট হয়ে গেছে। আজ সেই ছোট মনকে বড় করে আমি ঠিক বোঝাতে পারব না, তোকে আমি কি বলতে চাইছি—'

আমি অনুমান করেছিলাম রানীদির বেদনাটা। কিন্তু আমার কাছে শুধু একটিমাত্রই প্রশ্ন ছিল, রানীদি তুমি এসেছিলে কেন এ পথে? রানীদির কাছে সেই প্রশ্নের উত্তর না পেলে তাঁর এসব কথার প্রকৃত অর্থ আমার পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। তবে একথা ঠিক, রানীদির কথাগুলো উড়িয়ে দেয়ার মতও নয়। কাজেই গত রাতে তাঁর সঙ্গে যে কথা হয়েছিল আজ সে কথাটা কত সত্যি তা প্রত্যক্ষ করে আমার মানসিক অবস্থাটা কি, তা আমি নিজেই বুঝতে পারছি। এর পর রানীদি কি মনে করে আর কি ভেবে বলেছিলেন জানি না—তবে বলেছিলেন, 'বিজন, একদিন তুই সব কথাই জানতে পারবি—জানতে পারবি আমার মানসিক অবস্থা। হয়তো সেদিন আর বেশি দূরে নয়—'

জানিনা কিভাবে তা জানতে পারব? তবে একথা নিশ্চয়ই যে, সে জানার মধ্যে দেশের কথা নিশ্চয়ই থাকবে। কেননা, রানীদির বর্তমান মানসিক কাঠামো তারই ইঙ্গিতে পূর্ণ।

সেদিন শিয়ালদা স্টেশনে যা ঘটেছিল পরদিন সংবাদপত্রে তা প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে ঘটনাটি ছিল. তা হচ্ছে আওয়ারা ছেলেদের আর পুলিশকেও স্বচক্ষে লুটপাট করতে দেখেছিলেন তৎকালীন চীফ সেক্রেটারী। এই খবরটুকুই দেশেব প্রশাসনকে বুঝতে যথেষ্ট সাহয্য করবে। অবশ্য বলা বাহুল্য, চীফ সেক্রেটারী দুষ্কৃতকারীদের শাস্তির কথাও উল্লেখ করেছিলেন।

সমস্ত পথটা অতিক্রম করে আসতে সেদিন আমার অনেক দেরী হয়ে গেল। পথে আসতে আসতে কেবলই ভাবতে লাগলাম. রেলের তার কাটা হয়েছে, সে তার ঘুরে আবার রেলেই আসবে।

বড় বড় অফিসারদের কল্যাণে সেগুলো আবার কেনা হবে, আবার টাকা খরচ হবে। এমনি করে লুণ্ঠন ও বণ্টন না হয়ে তার যাবে কোথায় ? কে এর খরিদ্দার হতে আসবে ? কোনও ভদ্রলোক তাঁর গৃহস্থালী কাজের জন্য ঐ সব জিনিস তো কিনতে পারেন না। দশ কিলোমিটার তার কোন প্রতিষ্ঠান না কিনলে আর কেই বা কিনবে ? কাজেই এ তার কোথায় যাবে তা বোধহয় না বললেও চলবে। তারপর এই ট্রেন চলাচল বন্ধ। যাত্রী বিক্ষোভ হচ্ছে। লোকে বিব্রত বোধ করছে। গোলমাল হচ্ছে খুবই, সুতরাং লুঠতরাজের কি মওকাই না মিলেছে। সমাজে যারা উঞ্ছবৃত্তি করে খায়, যারা সমাজবিরোধী—শুধু তারাই নয়, তার সঙ্গে সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা, তারাও সুযোগ খুঁজছে। একে কি নামে অভিহিত করব তা আমি জানি না, তবে সত্য যা তা সত্য। এর জন্য শুধু কি ওস্তাদ থেকে ভানু আর কালোয়ার, মারোয়াড়ী প্রভৃতিকেই দায়ী করব, দায়ী করব কি শিয়ালদার কয়েকটা হকার আর রাস্তার আওয়ারাদের ? এরা সামনের সারিতে আছে সত্যি, কিন্তু এদের পিছনে কে বা কারা এবং কি উদ্দেশ্য নিয়ে চলছে, তা কি একবারও তলিয়ে দেখব না ?

এই সব ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে ভানুর কথাটাও আমার মনে পড়তে লাগল। সে বলেছিল, কাল রাত থেকে বোনকে নিয়ে বসন্তর সঙ্গে শঙ্করের খুব হচ্ছে। বসন্ত নিশ্চয়ই মায়ার ব্যাপারে এমন কিছু করছে যা শঙ্কর বরদাস্ত করতে পারে নি। আহা, মায়া প্রভাতের অনাঘ্রাত সদ্য বিকশিত কুসুমের মত পবিত্র ও সুন্দর একটি মেয়ে। তাকে যদি বসন্তর মত একটা ভয়ংকর প্রকৃতির মানুষ বাজপাখীর মত ছোঁ মেরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে, তবে কার মন না তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উঠবে। আর শঙ্কর সে জায়গায় যখন তার ভাই, তখন সে কখনো চুপ করে থাকতে পারে ? তাই বসন্তর সঙ্গে তার খুব হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কে জানে, সে খুব হওয়াটা

কোন পর্যায়ে গিয়ে পেঁাচেছে? বসন্ত যে ধরনের সাংঘাতিক প্রকৃতির লোক, তাতে ব্যাপারটা খুনোখুনির পর্যায়ে গিয়ে পৌছনোও খুব অস্বাভাবিক নয়। যদি তাই হয়, তাহলে কি হতে পারে? তাতে শঙ্করও তো খুন হয়ে যেতে পারে। যদি তাই হয়, তাহলে মায়ার কি হবে? শেষ পর্যন্ত তো বসন্তই জিতবে আর তার সেই জেতার মধ্য দিয়ে সর্বনাশ হয়ে যাবে মায়ার! ছিঃ ছিঃ, ঠিক এই সময়টাতেই আমি নেই। আমার মনটা কেমন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। আমি জোরে জোরে পা চালিয়ে চলতে লাগলাম।

শেষ পর্যন্ত অনেক বেলাতেই আমি এসে পেঁাছুলাম মায়াদের বাড়িতে।

বাড়িতে তখন অদ্ভুত দৃশ্য। মায়া বসে আছে মাঝখানে আর তাকে ঘিরে মাধু, মেনকা, পাঁচীর মা, আর মা। এভাবে ওদের সবাইকে বসে থাকতে দেখে আমি যেন কেমন নির্বাক হয়ে গেলাম। নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে যার জন্যে এইরকম একটা পরিস্থিতি। আমাকে দেখেই মা বলে উঠলেন, 'কোথায় ছিলে বাবা—এখানে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে।'

ঝড়? বুকটা আমার ছ্যাঁৎ করে উঠল। তবে কি আমি যা ভেবেছিলাম তাই ঘটেছে।

মায়া ইতিমধ্যে অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, 'দাদা আপনাকে আমি বলেছিলুম—যেখানেই যান একটু তাড়াতাড়ি ফিরবেন। দেখলুম আপনি খুব তাড়াতাড়ি ফিরেছেন!'

মাধু মায়াকে ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'রাখ তোর কথা।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে সে বললে, 'দাদা, শীগ্রি আপনি যান একবার ওস্তাদের আড্ডায়। ওখানে এখুনিই হয়তো খুনোখুনি যা হোক্ একটা কিছু হযে যাবে। মায়ার দাদাও ছাড়ার পাত্র নয় আর বসন্তর কুষ্ঠিতেও ওসব নেই। দুজনে যেন ফুঁসে বেড়াচ্ছে—'

এ কথা শোনার পর সেখানে আর দাঁড়ানো যায় না। আমি ছুটলাম আড্ডার দিকে। মাথার ওপর তখন শীত-মধ্যাহ্নের সূর্য। অসূর্যম্পশ্যা বস্তির পথে ছড়িয়ে রোদ, কাল থেকে একটানা শরীরের শিরা-উপশিরার ওপর চাপ পড়ে আসছে। নিজেকে বেশ ক্লান্তও মনে হচ্ছিল। তার ওপর আবার এই উদ্বেগ। তাই শীত-মধ্যাহ্নের রোদটা যেন আমার ভাল লাগছিল না, গ্রীষ্ম ছুপুরের মতই কেমন যেন জ্বালাময়ী বলে মনে হচ্ছিল। প্রায় একরকম ছুটতে ছুটতেই আমি এসে হাজির হলাম। দরজায় দেখি টুনটুনি দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখামাত্রই সে বলে উঠল, 'মামাবাবু শীগ্‌গির যান—শীগ্‌গির। এখানে ঝড় বয়ে চলেছে। দেখুন, যদি থামাতে পারেন—'

'কে কে আছে এখানে ?'

'ওস্তাদ আর শঙ্কর।'

'তোমার বসন্তকাকা ?'

'বসন্তকাকা গেছে পাইপগান নিয়ে আসতে।'

'এখন তাহলে খুনোখুনি হতে যা বাকি ?'

'হ্যাঁ—আপনি শীগ্‌গির যান।'

তেমনি করে দরজা খুলে ডাক্তার মুখার্জী আর বনানীর সামনে দিয়ে চকিতে একবার শয্যায় শায়িত মণ্টুর দিকে তাকিয়ে নিয়ে আমি সিঁড়ির পথে উঠে গেলাম ওপরে। দরজা খুলতেই দেখি শঙ্কর ফুঁসে উঠে ওস্তাদকে বলছে, 'আপনি—আপনিই এর জন্য দায়ী ওস্তাদ। আপনি নিজের জীবনকে বরবাদ করেছেন, আমার জীবনকে বরবাদ করেছেন—আর ওকে, ওকে আপনি প্রশ্রয় দিয়েছেন। আপনি জানেন না ও কত নীচুস্তরের লোক, কত নিষ্ঠুর, কত অত্যাচারী ? ওকে আপনি ভয় করেন।'

ওস্তাদ চিৎকার করে বলে উঠলেন, শঙ্কর ! সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছো। তুমি, শুধু তুমি কেন, এখানকার প্রত্যেকটা মানুষ জানে, আমার স্নেহ-ভালবাসা যদি কেউ পেয়ে থাকে তবে সে তুমি।

তোমাকে আমি নিজে হাতে গড়ে তুলেছি, কিন্তু বসন্তকে আমি তা করি নি। তোমার মনে আছে, যেদিন তুমি জেল থেকে পালিয়ে এলে সেদিন খবরটা শুনে আমিই তোমাকে অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিলাম। অর্থাৎ তুমি আমার কাছে আসো নি। তুমি গিয়ে বসন্তর ওখানেই উঠেছিলে। কাজেই ভয় তাকে কে করে—আমি, না তুমি?'

'সেটা আমার ভুল হয়েছিল ওর ওখানে উঠে। কিন্তু ভয় তাকে আমি করি নি!'

'ভয় না করে থাকো ভালই। তবে আমার ওপর অভিযোগ করছ কেন যে, আমি তোমার জীবন বরবাদ করে দিয়েছি?'

'আমি তো আরও একটা অভিযোগ করেছি আপনার বিরুদ্ধে?'

ওস্তাদ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন শঙ্করের দিকে। শঙ্কর বললে, 'আপনার নিজের জীবনকেও আপনি বরবাদ করেছেন।'

ওস্তাদ যেন কেমন একটু বিচলিত হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু তুমি বোধহয় জানো না, তা ছাড়া তোমার জানবার কথাও নয়। আমার জীবন বরবাদ হওয়ার জন্য তোমার কোন মাথাব্যথা না থাকলেই খুশি হতুম।'

'কিন্তু মাথাব্যথা হয়। কারণ যে মানুষ নিজের জীবন নিজে বরবাদ করে সে মানুষ অপরেরও করতে পারে।'

'মুখ সামলে কথা বলবে শঙ্কর!'

'না না, আজ আমি আর নিজেকে সামলাতে পারব না। আমি অমানুষ হতে পারি, আমি বয়ে যেতে পারি, কিন্তু কি করেছে আমার নিষ্পাপ ফুলের মত বোন? কেন, তাকে নর্দমার কীটের মত একটা লোক—সে তাকে বাজপাখীর মত ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়ে সর্বনাশ করবে? ভাই হয়ে কি করে আমি তা সহ্য করব—বলতে পারেন ওস্তাদ, বলতে পারেন?'

'তার জন্যে আমি মোকাবিলা করতে চাই বসন্তের সঙ্গে, কিন্তু তুমি আমার ওপর অভিযোগ করবে কেন?'

'অভিযোগ করি ওস্তাদ জ্বালায়—জ্বালায়। আপনি জানেন, আমরা সবাইকে হারিয়ে পথের ভিক্ষুক হয়ে এখানে এসেছিলুম। মা হাত পেতে টাকা নিয়েছিল আপনার কাছ থেকে—আপনি সেই টাকা দিয়ে আমাকে কিনেছিলেন। সেই থেকে আমি আপনার কেনা গোলাম। আপনি আমার মা, আপনি আমার বাপ—বসন্ত আমাকে পিটেছে, মেরেছে, এমন কি খুনও করতে চেয়েছে, কই আপনার তো হৃদয় ডুকরে কেঁদে ওঠে নি? আপনি তো তাকে এতটুকু শাস্তি দেন নি? বুঝতে পারেন ওস্তাদ আমার জ্বালাটা কোথায়? বুঝতে পারেন আপনি?'

এই প্রথম আমার ওস্তাদের সঙ্গে চোখাচোখি হল। অদ্ভুত দুটি চোখ। এমনি প্রকৃতিস্থ শান্ত সুন্দর দৃঢ় মানুষরূপে ইতিপূর্বে ওঁকে দেখার আমার সৌভাগ্য হয় নি। যতবারই দেখেছি, ততবারই তিনি ছিলেন পানোন্মত্ত বিকৃতরুচি--একটা হিংস্র মানুষ। আমাকে দেখে তিনি কি যেন বলতে গেলেন।

আমি মুগ্ধদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার মনে হল যেন এ দৃষ্টিকে আমি চিনি। হয়তো কখনো, কোন সময়ে আমি দেখেছি, আজ আর মনে করতে পারছি না। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। তিনি বলে উঠলেন, 'সন্নিসি ঠাকুর না?'

আমি উত্তর দেওয়ার আগেই শঙ্কর আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'দাদা আপনি!'

'তোমার মার কাছে শুনেই আমি আসছি।'

হঠাৎ ছুটতে ছুটতে এসে টুনটুনি ঘরে ঢুকল, 'তোমরা পালাও—তোমরা পালাও। বসন্তকাকা পাগলের মত ছুটে আসছে পাইপ-গান লোড করে!'

ওস্তাদ বললেন, 'আসতে দাও তাকে—'

'না না, তোমরা পালাও—ও তোমাদের গুলী করে মারবে। গুলী করে মারবে!'

শঙ্কর চিৎকার করে উঠল, 'ওস্তাদ!'

ওস্তাদ পাল্টা চিৎকারে বললেন, 'শঙ্কর!'

টুনটুনি যেমনভাবে এসেছিল ঠিক তেমনিভাবেই চলে গেল। ওস্তাদ বললেন, 'আসুক বসন্ত পাইপগান নিয়ে, আমি গিয়ে দাঁড়াচ্ছি সামনে।' তারপর তিনি সোজা দরজা খুলে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সেইখানে সেই ঘরে দাঁড়িয়ে আমি শুধু ভাবতে লাগলাম আসন্ন একটা খুনোখুনির কথা। ওস্তাদকে দেখে মনে হল তিনি আদৌ বিচলিত নন। কিন্তু শঙ্করের মুখে-চোখে দেখলাম কেমন যেন একটা ভয়ের ছায়া। বসন্তকে ও জানে। বসন্ত পারে না এমন কোন কাজ নেই। হয়তো সেইজন্যেই ওর ভয়।

বসন্ত তৎক্ষণে ছুটে এসেছে সিঁড়ির কাছে। হাতে তার গুলী চালাবার ভঙ্গীতে পাইপগান। ওস্তাদ ওপর থেকে হেঁকে উঠলেন, 'ব-স-ন্ত'!

সিঁড়ির নিচে থেকেই সে বলে উঠল 'সরে যাও তুমি দরজার কাছে থেকে—'

'কিন্তু তুমি কাকে খুন করতে আসছো?'

'কেন, তোমার পেয়ারের শঙ্করকে', বসন্ত চিবিয়ে চিবিয়ে বল্‌লে, 'তো-মা-র ছো-ট ও স্তা-দ-কে।'

'ও তোমার কি করেছে বসন্ত?'

'সে কৈফিয়ত আমি তোমায় দিতে প্রস্তুত নই', বলে বসন্ত দু-তিনটে সিঁড়ির ধাপ প্রায় লাফ দিয়েই উঠে পড়ল। ওস্তাদ দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলেন, 'বটে!'

'বটে আবার কি', বসন্ত আরও উঠে এসে বললে, ছেড়ে দাও তুমি আমার পথ—'

ওস্তাদ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'তোমায় পথ ছেড়ে দেবো বলে আমি এখানে দাঁড়াই নি বসন্ত!'

'পথ তুমি ছাড়বে না?'

'না।'

'তাহলে তোমাকে বাধ্য করব আমি পথ ছেড়ে দিতে!'

'এতবড় কথা?'

'হ্যাঁ—এতবড় কথা। তুমি জানো না শঙ্কর আমার কি করেছে।'

'কি করেছে শঙ্কর?'

'সারাটা জীবন দলের কোন লোক যে বসন্তকুমারকে কখনো একটা ছোট কথা বলতে সাহস করে নি সে-ই তাকে তোমার শঙ্কর অপমান করেছে, জঘন্যভাবে অপমান করেছে', পাইপগানটা ডান হাতের বগলে ডান হাত দিয়েই চেপে ধরে বসন্ত বাঁ হাতটা যুগপৎ প্রসারিত করে ও প্রবলবেগে নেড়ে বললে, 'সে অপমানের প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে। আমার জীবনে কোন বেইমানকে কখনো ছেড়ে দিই নি!'

এবার শঙ্কর ফুঁসে উঠে বললে, 'বেইমান তুমি কাকে বলছ? তোমার নিজের গলতিতে তুমি অপমানিত হয়েছ, তার আমি কি করব?'

'আমার নিজের গলতিতে?'

'হ্যাঁ তোমার নিজের গলতিতে।'

'শঙ্কর!' চিৎকার করে উঠল বসন্ত।

'একটা ফুলের মত নিষ্পাপ মেয়েকে তুমি বাজপাখীর মত ছোঁ মেরে আনতে যাবে—আর মেয়ে যদি আরও পাঁচজনের সঙ্গে জোট পাকিয়ে তোমাকে ঝাঁটা মেরে বিদেয় করে তবে আমি তার কি করব বলতে পারো?'

ওস্তাদ ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠলেন, 'কোথায় ঘটেছে এসব—কোথায় ঘটেছে?'

শঙ্কর বললে, 'জিজ্ঞেস করুন ওকে।'

ওস্তাদ বললেন, 'বসন্ত, এ কি সত্যি?'

'কি বলছ তুমি,' বসন্ত বলতে লাগল, 'আমার এক্তিয়ারের মধ্যে বাস করবে অথচ আমাকেই চোখ রাঙাবে? এত বড় সাহস! এ সাহস ওরা পেলে কোত্থেকে? পৃথিবী থেকে তোমার ও শঙ্করকে সরিয়ে দিয়ে সারা বস্তিতে আমি আগুন লাগিয়ে দোবো—সব জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাবে আমার চোখের সামনে। আমার নাম বসন্তকুমার—একথা আমি সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই!'

ওস্তাদ এবার একরকম শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু আমি তো তোমায় চিনি বসন্ত! তুমি শঙ্করকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে সারা বস্তির মানুষগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে—হ্যাঁ, তুমি তা পারো। কিন্তু কেন? একবার তুমি ঘরের আয়নাটার সামনে যাও তো—দ্যাখো তো তোমার কপালের কাটা দাগটা। নিজের কামনার আগুনে নিজে তুমি বারে বারে কিভাবে পুড়ে মরেছো! একবার বোঝবার চেষ্টা করো তো!'

'গাঙ্গুলী', চিৎকার করে উঠল বসন্ত।

এই গাঙ্গুলী পদবীটাই এইখানে সেই রাতের এক হুল্লোড়ে আমি শুনেছিলাম। ওস্তাদের পদবী যে গাঙ্গুলী সেদিন ক্ষীণভাবে আমার মনে উঁকি দিলেও ততটা নিশ্চিত হতে পারি নি—যতটা আজ হলাম—এই গাঙ্গুলী পদবীটা আরও একজনের ছিল। অনেক দিনের অনেক কথা মনের মাঝখানে কেমন যেন একটা শিহরণ সৃষ্টি করে গেল। ওস্তাদ বলে উঠলেন, 'গাঙ্গুলী বলে চোখ পাকিয়ে তুমি কাকে শাসাচ্ছো বসন্ত? আমি কি তোমার সম্বন্ধে ভুল বুঝেছি, না, মিথ্যে বলছি?'

'কিন্তু ভুল কি মিথ্যে শুধু আমার জীবনেই ঘটেছে গাঙ্গুলী', এবার বসন্তও শ্লেষভরে বললে, 'তোমার জীবনে ঘটে নি? আর সেদিন তোমাকে এই শর্মারই শরণাপন্ন হতে হয় নি?'

'অস্বীকার করব না', ওস্তাদ বললেন, জীবনের গোড়ার দিকে

ফিরে যেতে চাও আমার কোন আপত্তি নেই। ভাবো সেই ছাত্রজীবন, সেই কলেজ জীবন! তা হলে—'

'হ্যাঁ, ভেবে দ্যাখো।'

'তুমি সেদিন কলেজ পালিয়ে কোথায় যেতে বসন্ত—তারপর ফিরতে অনেক রাত করে নিত্য নতুন সঙ্গী নিয়ে। নেশায় মত্ত হয়ে থাকতে তুমি। তোমাকে সেদিন কেউ হোস্টেলে রাখতে চাইত না —আমি, আমিই তোমাকে সেদিন বুক দিয়ে আগলিয়ে রেখেছিলাম।

'সেকথা তো আমি ভুলি নি গাঙুলী!'

'ভুলতে তুমি পারবেও না। কিন্তু সেদিন তোমার ওপর মমতার, তোমার প্রতি আমার নিখাদ ভালবাসার কি মূল্য তুমি দিয়েছ বলো তো বসন্ত?'

'তুমি শেষ পর্যন্ত বলবে তো তোমার জীবনটা বরবাদ করে দেওয়ার কথা?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কত দিন কত রাতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমার জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছি মাথায় জল ঢেলে ঢেলে। তারপর শুকনো কাপড়ে সেই জল মুছিয়ে দিয়ে তোমাকে চৌকির ওপর শুইয়ে দিয়েছি। তোমার গায়ে, বুকে-পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে, তুমি কোথায় যাও, কি করো সব একটি একটি করে জিজ্ঞাসা করেছি, তুমিও অকপটে সব কথা খুলে বলেছো। মনে আছে তুমি বলেছিলে, দেশ স্বাধীন হয়েছে। দু-দুটো কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা রাজত্ব চালালো। এখন যদি তাদের হাতে রেখে কাজ চালিয়ে যেতে পারা যায় তাহলে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হতে পারবে তুমি। আর তারই জন্যে তুমি রোজ হোস্টেল থেকে পালিয়ে যেতে, তারই জন্যে তুমি বাইরে গিয়ে দলের লোকেদের সঙ্গে কাজ করতে—'

বসন্ত বললে, সবই আমার মনে আছে কিন্তু তোমাকে তো আমি কখনো এ পথে টানতে চাই নি গাঙুলী। তুমি এলে

কেন এ পথে? আমি তো তোমার জীবন বরবাদ করতে চাই নি!'

ওস্তাদ যেন ফুঁসে উঠলেন। বললেন 'ড্যাম লায়ার তুমি বসন্ত। তুমি কি আজ তোমার সেই অপরাধের কথা ভাবতে পারো? বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখতে গিয়ে তোমার সে অপরাধও আমাকে ক্ষমা করতে হয়েছে। শয়তান, তুমি কি ভেবেছিলে তারপর তার জের কোথায় গিয়ে পৌঁছুবে?'

'আমি অপরাধ করেছিলুম, তার জন্যে তুমি আমাকে শাস্তি দিলেই পারতে!'

'হ্যাঁ, আজ হলে তা পারতুম। কিন্তু সেদিন ঘটনার বিভীষিকায় আর লোক জানাজানির ভয়ে আমি তোমায় শাস্তি দিতে পারি নি। তাছাড়া সেই নিরপরাধিনী মহিলার যখন কোন সান্ত্বনা ছিল না আর, তখন নিজের জীবন বরবাদ করেও তাকে আমায় সান্ত্বনা দিতে হয়েছে। সে কথা কি তুমি ভুলে গেছ শয়তান?'

'আমাকে যদি শয়তান বলো', বসন্ত উত্তেজিতভাবে বললে, 'তুমিও শয়তান কম নও। সেই মহিলাকে তুমি নিজের তাঁবে রাখবে বলে তুমি তাকে আমার সামনে ছেড়ে দিয়ে তার ও আমার বদনাম দেবার সুযোগ সৃষ্টি করেছিলে। তারপর তার উদ্ধারকর্তা সেজে তাকে তুমি বরাবর নিজের কাছে রেখেছিলে!'

'মুখ সামলে কথা বলবে বসন্ত.' ওস্তাদ চিৎকার করে উঠলেন, 'সে মহিলার কথা না হয় ছেড়ে দিলাম. কিন্তু তারপর—তারপর তোমার কপালের ঐ কাটা দাগটাও কি আরেকটা বদনাম? তুমি জানতে না, যে মহিলাটিকে তোমার সামনে ছেড়ে দিয়েছিলুম বলছ, সে মহিলাটি আমার কে।'

'খুব জানতুম।'

'তবে', ওস্তাদ তেমনিভাবেই বলতে লাগলেন, 'আমার বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে সেই মহিলাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলে

কোথায় সে কি তুমি জানো না? তারপর সে মহিলার স্থান হয় কোথায় সেও কি তোমার অজানা? মুখ দেখাতে পারি নি সেই মহিলার কাছে, মুখ দেখাতে পারি নি বাড়িতে, এমন কি মুখ দেখাতে পারি নি নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর কাছে আর শ্বশুরবাড়ির দেশে—'

ওস্তাদ আর বসন্তর কথা কাটাকাটির মধ্যে কি যেন এক রহস্যের সন্ধান পাচ্ছিলাম। কার কথা, কোন্ মহিলার কথা, ওরা বলাবলি করছে তা যেমন স্পষ্টও হচ্ছে না, তেমনি বুঝতেও পারছি না, অথচ যেন ঘটে যাওয়া ঘটনার সঙ্গে এর কোথায় একটা সামঞ্জস্য রয়েছে। আজ শুনলাম ওস্তাদের পদবী গাঙুলী, আরেকদিনও শুনেছিলাম—এর সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন গাঙুলীর কথাও মনে পড়ে যাচ্ছে। অথচ এখানেও সেই সঠিক সূত্রটা মেলাতে পারছি না—কোথায় যেন মিলও রয়েছে, আবার রীতিমত গরমিল দেখে ঘুলিয়েও যাচ্ছে সব কিছু। কিন্তু পরক্ষণেই ওস্তাদের মুখে যেকথা শুনলাম তাতে যেন চমকে উঠলাম। ওস্তাদ বলে উঠলেন, 'আজ যদি সেই মহিলা বেঁচে থাকত তবে যে-তুমি ইতরের মত এই ইঙ্গিতটা করলে সেই তুমি মুখোস-খোলা জন্তুর মত ছটফট করতে এতক্ষণ আমার হাতের গুলী খেয়ে—'

'গাঙুলী, বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে', বসন্ত অপমানাহতভাবে বললে, 'সে মহিলার গর্ভে আমার সন্তান হয় নি, সন্তান হয়েছিল তোমারই। আর তারা বেঁচেও আছে।'

'হ্যাঁ, সেইটেই তার নারীজীবনের সান্ত্বনা,' ওস্তাদ বলতে লাগলেন, 'এবং সে সান্ত্বনা আমাকেই দিতে হয়েছিল আরেকদিকে পর্বতপ্রমাণ পাপের বোঝা সৃষ্টি করে। তাই লোকালয়ে ফিরে না গিয়ে আমাকে এসে উঠতে হয়েছিল তোমার এই অভিশপ্ত জগতে। এও তোমার আরেক চক্রান্ত আমাকে এখানে টেনে আনার জন্যে—'

'আমি চক্রান্ত করেছিলুম?'

'হ্যাঁ' তুমি—তুমিই চক্রান্ত করেছিলে। তা না হলে কোন্ মানুষ বন্ধুর আত্মীয়াকে নিয়ে পালায়, কোন্ মানুষ বন্ধুর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে দাঁড়ায়—আর তারই সুযোগে তার লোকালয়ে ফেরার সমস্ত পথ অবরুদ্ধ করে দেয় ?'

'কিন্তু আমি তো তোমাকে মাথার মণি করে রেখেছিলুম গাঙুলী !'

'সে শুধু আমার বিদ্যাবুদ্ধি, বিবেচনাকে তোমার কাজে লাগাবার জন্যে', ওস্তাদ বেদনার আবেগে বলে উঠলেন, 'আমাকে চারিদিক থেকে অমানুষ করে তুমি আমায় সম্মান দিয়েছিলে—ঠিক যেমন করে আমি সম্মান দিয়েছিলুম শঙ্করকে। আর সেই ভূয়ো সম্মানের মোহে আজ আমার সব গেছে! আমি কত লোকেরই ওপর না অবিচার করেছি, তাদের কত না সর্বনাশ করেছি !'

'অনুশোচনা হয় গাঙুলী প্রায়শ্চিত্ত করো।'

'হ্যাঁ, তাই করতে হবে আমাকে,' ওস্তাদ কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'তুমি শঙ্করকে মেরো না—মারতে যদি হয়, তবে তুমি আমায় মারো, আমাকে গুলী করো! আমি তোমার সামনে বুক পেতে দিচ্ছি'।

'গাঙুলী !'

আমি অভিভূতের মত ওদের এই অদ্ভুত সংলাপ শুনছিলাম। মনের মধ্যে তখন আমার কত কথা, কত প্রশ্ন ঝড়ের মত তোলপাড় করে উঠছিল। হঠাৎ দেখি দরজার সামনে বসন্তর পিছনে এসে দাঁড়ালো বনানী। আমার দিকেই তার দৃষ্টি। কিছু যেন সে বলতে চাইল। আমি দু' পা এগিয়ে গেলাম। ইশারায় সে আমায় ডাকল। বসন্তর পাশ কাটিয়ে কাছে যেতেই সে বললে, আপনার দিদি এসেছেন—ডাকছেন।'

রানীদি এসেছেন। হ্যাঁ, তাঁর তো আসার কথা ছিল। তিনি বলেছিলেন, মণ্টুকে দেখতে আসবেন। এতক্ষণ এক অদ্ভুত লোমহর্ষক

ঘটনা ও নাটকের মধ্যে ডুবেছিলাম আত্মবিস্মৃত হয়ে—ভাবতেই পারি নি যে আরও একটা জগৎ আছে এবং সে জগতে রানীদির মত মানুষেরও আবির্ভাব ঘটে। আজ অনুভব করলাম, রানীদির প্রতি দুঃখে বেদনায় আনন্দে শ্রদ্ধায় সমবেদনায় সম্মানে আমার মনটা যেন পরিপ্লাবিত হয়ে গেল। মনের কোণে আমার এত-দিন জমে উঠেছিল যে মেঘ—সে মেঘ ঝড়ের বেগে কোথায় যেন অন্তর্হিত হয়ে গেল, অবলুপ্ত হয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবার আগে তবু একবার শঙ্করের দিকে তাকালাম। মনে তার জন্য কোথায় যেন একটা প্রচ্ছন্ন বেদনা। বলতে পারলাম না কিছু, কিন্তু আমার দৃষ্টির মাধ্যমে তাকে আমি জানিয়ে দিলাম, 'দেখো, তোমার বিপদ না হয়। তুমি সাবধানে থেকো।' শঙ্করও আমার দিকে তাকিয়েছিল—বোধ করি আমার মনের ভাষাকে সে সমর্থনই জানালো।

কিন্তু আমি নিচে আসতে আসতে যেকথা শুনলাম বসন্তর কণ্ঠস্বর থেকে তাতে আমি স্তম্ভিত না হলেও বিস্মিত হলাম। ভানু বলেছিল বসন্ত কেমন যেন একটা ভোল পাল্টাবার চেষ্টা করছে এবং সে আমাকে সাবধানে থাকতেও বলেছিল। রানীদিও বলেছিলেন অনুরূপ কথা। তাই যখন শুনতে পেলাম বসন্ত বলছে—তুমি অমন করে বুক পেতে দিওনা গাঙ্গুলী, তোমাকে আমি গুলী করে মারতে পারব না, কিন্তু তোমার শঙ্কর, তোমার আরেকটি ঐ যে নিচে নেমে গেল আর, আর সেই জগদীশ—এদের আমি এ রাজ্যে রাখব না। ওরা আমার শ্রেণীশত্রু।''

শুনতে পেলাম ওস্তাদ বলে উঠলেন, 'এসব তুমি কি বলছ বসন্ত? এ-তো রাজনীতির কথা '

বসন্ত বল্‌লে, 'হ্যাঁ এবার থেকে এই রাজনীতির কথাই বলব'।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে মাথাটা যেন আমার ঘুরে গেল বলে মনে হল। কতদিন আমি সংবাদপত্র পড়তে পড়তে বোঝবার চেষ্টা

করেছি—নকশালবাড়ীর কথা। কতকগুলি আদর্শবাদী সংগ্রামী যুবক, তাদের মধ্যে আমারও কিছু কিছু বন্ধু আছে, যারা জীবনের অগ্নিমন্ত্রকে সম্বল করে নিপীড়িত নির্যাতীত কৃষকের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে কৃষি বিপ্লবের পথে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল—তাদের সেই রণধ্বনি 'শ্রেণীশত্রুকে খতম করো'-কে নিজেদের ঘৃণ্য জিহ্বায় উচ্চারণ করে কংগ্রেসী শাসকেরা নিজেদের ক্ষমতাকে অপ্রতিহত রাখার উদ্দেশ্যে গুপ্তঘাতকের দ্বারা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিভীষিকা সৃষ্টি করছিল এবং সেজন্য তারা বেছে নিয়েছিল কিছু কিছু পুলিশ অফিসারকে এবং সমাজবিরোধী শক্তিদের। নইলে বসন্তর মত সমাজের একটি ভয়ংকর প্রকৃতির গুণ্ডা সে শ্রেণীশত্রু-কে জীবিত রাখবে না বল্‌তে পারে। কে জানে এর পিছনে হয়তো ডি সি সেন্ট্রালও আছে। বসন্তর এই মতিগতি কিছুটা টের পাওয়া গিয়েছিল বলেই হয়তো রানীদি এবং ভানু আমাকে সতর্কও করে দিয়েছিল। আমি কিন্তু এর বিন্দুবিসর্গও টের পাই নি কোনদিন —পেলাম এই আজকে।

এরপর নিচে নেমে উঠোন পার হয়ে আমি বনানীকে অনুসরণ করতে লাগলাম। গিয়ে দেখি রানীদি মণ্টুর বিছানায় বসে—পাশে দাঁড়িয়ে টুনটুনি। ডাক্তার মুখার্জী বসে একটু দূরে। আমি এসে রানীদিকে প্রণাম করলাম। রানীদি বলে উঠলেন, ওখানে অতো হৈ চৈ কিসের বিজন ?'

বললাম, 'হৈ চৈ কেন হচ্ছে তা এতক্ষণে তোমার বোঝা উচিত ! বসন্ত এসেছে শঙ্করকে, আমাকে আর জগদীশকে গুলী করে মারতে। তাই ওস্তাদ আর বসন্তর মধ্যে রীতিমত বাদানুবাদ হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কি হবে জানি না। তবে আমার কাছে তোমাদের সব কিছু দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে গেছে।'

'তোকেও মারবে !'

'হ্যাঁ'

'কিন্তু কেন ?'

'জানিনা।'

তারপর কি ভেবে আবার বললাম, 'সেই তোমার বিয়ের দিনে মাত্র একবারই ওঁকে দেখেছিলাম। তাছাড়া চেহারাটাও ওঁর বদলে গেছে অনেক—তাই আমি চিনতে পারি নি এই পরিবেশে। আজ কিন্তু সব রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে গেল। রানীদির ব্যাপারও জানলাম, তাছাড়া তোমার ব্যাপারও বোঝার কোন অসুবিধা হ'ল না।'

'এসব কি বল্‌ছিস্ ?'

যেন খেয়ালই নেই এমন ভাবে বললাম, 'তোমার ঘরে দেখেছি আমি শরৎচন্দ্রের আবক্ষ মর্মরমূর্তি। আমার মনে হয়েছে তুমি শরৎচন্দ্রকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছো। এবং আমিও তোমার মধ্যে দেখলাম শরৎচন্দ্রের দুই নারী চরিত্র একসঙ্গে। একদিকে তুমি আমার অন্নদাদিদি, আরেকদিকে তুমি সেই বিহ্বল যৌবনের বসন্তদিনে পিয়ারীর বেশে রাজলক্ষ্মী—'

'অদ্ভুত কথা !'

'অদ্ভুত হোক, কিন্তু ভুল তো বলি নি।'

হঠাৎ এই কথার মাঝে ওদিকে ওস্তাদের ঘরে শোনা গেল গুলির শব্দ। চিৎকার করে উঠল যেন কে !

চকিতে আমরা পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করলাম।

রানীদি বললেন, 'সুরু হল তাহ'লে। বিজন তুই পালা—এখান থেকে পালা। এখুনি, আর দেরী করিস্‌নি'—রানীদির চোখে মুখে সন্ত্রাসের চিহ্ন।

কিন্তু পালাবো—কেন পালাবো ? রানীদি আমাকে ভালবাসেন বলেই হয়তো একথা বলেছেন। কিন্তু এই কি পালাবার সময় আমার। মায়ার সম্পর্কে আমি কথা দিয়েছি শঙ্করের মাকে কাজেই···সে যদি গুলিবিদ্ধ হয়ে মরে তবে কে আর থাকবে

সেই হতভাগিনী মায়ের ? কিন্তু যা দেখলাম তাতে আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। শঙ্কর ঝড়ের বেগে ছুটে বেরিয়ে এল আমাদের সামনে। দেখলাম শঙ্কর গুলীবিদ্ধ হয় নি। গুলীবিদ্ধ হল তাহলে কে ?

সহসা দেখলাম ডাক্তার পকেটে হাত দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূ দুটো যেন তাঁর কেমন কুঞ্চিত হয়ে গেল, চোখ দুটোও যেন জ্বলে উঠল একঝলক হিংস্র আগুনে। আমি বুঝলাম আরেক সংকটময় মুহূর্ত সমাগতপ্রায়। কিন্তু ডাক্তার যদি পকেট থেকে তার পিস্তল বার করে শঙ্করকে গুলী করতে যায়, তবে আমার কি সেখানে কোন কর্তব্য নেই ? অনেকবার আমি আমার রিভলবার এদের কাছে তুলে ধরেছি—আর আজ এই মুহূর্তে সঠিক কর্তব্যের সময় কি সেই অগ্নিনালিকার মুখ গর্জন করে উঠবে না ? আমি তো শঙ্করের মাকে আশ্বস্ত করেছিলাম, মায়াকে রক্ষা করার প্রশ্নে আন্তরিকভাবে সাড়াও দিয়েছিলাম। তবে—তবে ডাক্তার যখন প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন আমিই বা প্রস্তুত হব না কেন ?

আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'ডাক্তার !'

ডাক্তার উন্মত্তের মত বোধ করি আমার দিকেই তাক করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আরেকটা হত্যাকাণ্ড বেঁচে গেল, জগদীশ কোথা থেকে এসে পিছন দিক থেকে তার পিস্তলটা নিল ছিনিয়ে।

আশ্চর্য আমি, আশ্চর্য রানীদি, টুনটুনি, বনানী শঙ্কর সবাই—এমন কি সেইমাত্র আসা ওস্তাদও।

জগদীশ—সেই টুনটুনিকে যে জবাকুসুম আনতে বলতো, যে পুলিশের কাছে একরার করেছে, যার জন্যে মণ্টুকে গুলীতে আহত হতে হয়েছে, সেই জগদীশ। সে হঠাৎ এ সময়ে হাজির হল কি করে ? তাছাড়া সে শুধু ডাক্তারের পিস্তলই কেড়ে নেয়নি সে তাকে ধরাশায়ীও করে ফেলল।

ডাক্তার বললে, 'আমি—আমি কি করেছি জগদীশ ?'

আমার মনে তখন জগদীশের সম্পর্কে যে প্রশ্ন জেগে উঠেছিল, জগদীশ নিজেই তা প্রকাশ করে দিলে। সে বললে, 'সেই রাত—সেই রাতে আমি যে পাপ করেছি তা আমি জীবনে কখনো ভুলব না। আমি মেয়েছেলের গায়ে হাত দিয়েছিলুম—অন্ধকারে চিনতে পারি নি শঙ্করের মাকে। তাকে আমি ক্লোরোফর্ম করেছিলুম। ভাগ্যি ওস্তাদ আমাকে তাকে বাড়ি দিয়ে আসতে বলেছিলেন, তাই আমার বাঁচোয়া—তাই আমি প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ পেয়েছি সেদিন। শঙ্করের মা আমাকে সেদিন সব খুলে বলেছিলেন—'

ডাক্তার পড়ে পড়েই বলে উঠল, 'তার জন্য আমি দায়ী জগদীশ ?'

থাম্ শয়তান, জগদীশ বলে যেতে লাগল, 'সেদিন সেই দামী মেটালের ওয়াগন লুঠ করার দিনেই আমি দিতুম তোমাদের ফাঁসিয়ে। শঙ্করের বোনকে ছোঁ মেরে আনার জন্যে তোমরা মতলব করেছিলে, লুঠপাট শেষে ফেরার পথে শঙ্করকে তোমরা গুলী খাইয়ে মারবে—তাই আমাকে সন্ধ্যে রাতেই বসন্তর ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

শঙ্কর বলে উঠল—'ইঃস্!'

জগদীশ বলতে লাগল, কিন্তু গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে লেগে গিয়েছিল মন্টুকে। আমি দুঃখু রাখার জায়গা পাই নি। তাই আজ যখন শিয়ালদায় গোলমাল আর সেখানে যখন বসন্ত নেই, তখন আমি যা অনুমান করেছিলুম, তাই হয়েছে। বস্তীতে এসে শঙ্করের মায়ের মুখে যখন ব্যাপারটা শুনলুম, তখন ছুটে না এসে আর পারলুম না। তোমরা সব ভোল পাল্টাচ্ছো!' তারপর ধরাশায়ী ডাক্তারের মাথায় গোটা দুই লাথি মেরে সে বলে উঠল, তোমার পাপের শেষ নেই ডাক্তার। কিন্তু সেই পালের গোদাটা গেল কোথায় ? বসন্তটা—'

ওস্তাদ বলে উঠল 'শঙ্করকে সে গুলী করতে গিয়েছিল কিন্তু শঙ্কর তার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর পাইপগানটা ছিনিয়ে নিয়ে একটা আওয়াজ করে পালিয়ে এসেছে। এরপর আমি বসন্তকে ঘরে শিকল তুলে দিয়ে নেমে এসেছি—'

'বেশ করেছেন ওস্তাদ—বেশ করেছেন,

ওস্তাদ বললে, কিন্তু জগদীশ—

'ওস্তাদ !'

'তাহলে তুমি একরার করোনি ?'

'কিসের একরার ওস্তাদ ?'

'দামী মেটাল লুঠ করার দিনে—পুলিশের কাছে একরার ?'

'আমি একরার করতে যাব কেন ? বসন্ত বুঝি বলেছে এসব কথা ?'

'হ্যাঁ।'

'বুঝতে পারলেন না, এটাই ওর চাল—গুলীতো পুলিশ করেনি। গুলী করেছিলুম আমি। বসন্ত যেমন শঙ্করকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে তার ফুলের মত বোনটির সর্বনাশ করতে চেয়েছিল—আমিও তেমনি বসন্তকে সরিয়ে দিয়ে তাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলুম। কিন্তু ঘটনাচক্রে গুলীটা লেগে গেছে মণ্টুকে। নইলে মণ্টুকে কি আমি গুলী করতে পারি? টুনটুনিকে আর মণ্টুকে আমি কোলেপিঠে করে মানুষ করিনি !'

ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'কিন্তু আমাকে তুমি এর মধ্যে পাচ্ছো কোথায় জগদীশ ?'

'তোমাকে পাচ্ছি কি করে? তুমি খুব উচ্চমার্গের লোক, না? কি করেছ তুমি জানো না? বসন্ত যখন ওস্তাদের শালীকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল, তখন তুমিই তো ওস্তাদকে মিথ্যে কলংকের ভয় দেখিয়েছিলে। মনে নেই সে কথা? শেষ পর্যন্ত লোকালয়ে ফিরে যেতে তাকে বারণ করে তুমি আর বসন্ত দু'জনে মিলে

লোকটাকে এখানেই থাকার ব্যবস্থা করে দিলে। বেচারা কি করবে, না ফিরে যেতে পারলো ঘরে, না ত্যাগ করতে পারলো সেই মহিলাকে। তারপর দুই সন্তানের জননী—তাকেও তোমরা স্থিরভাবে থাকতে দাও নি—নিজেদের পাপের কথা পাছে প্রকাশ পেয়ে যায়, তাই সেদিন তাকে সাইনাইড খাইয়ে খুন করেছো তুমি। তাছাড়া ঘটনার কি এখানেই শেষ? আরও আছে—আছে বিরাট মহাভারত।

এবার রানীদি বলে উঠলেন, 'জগদীশ তুই থাম বাবা, তুই থাম—'

'ওরা যাই করুক মা, আমি কিছুই বলতুম না', জগদীশ বলতে লাগল, মেয়েদের ওপর অত্যাচার করবে কেন? সীতার ওপর অত্যাচারের জন্যে কি স্বর্ণলঙ্কা ছারখার হয়ে যায় নি? তাই আমি এসব বরদাস্ত করতে পারি নি।'

আমি অবাক হয়ে দেখলাম যে, এখানে এই অভিশপ্ত জগতেও মানুষ আছে—সত্যিকারের মানুষ আছে।

জগদীশ ওস্তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ওদিকে শিয়ালদার কাজ শেষ করে ভানু এসে পড়ল। ঘরের দৃশ্য দেখে সে সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'ব্যাপার কি।' বস্তীতেও খবরাখবর হয়ে গিয়েছিল। পিল পিল করে সব লোকজন এসেছে—সেই মেনকা, সেই পাঁচীর মা, মাধু, মায়া, মায়ার মা, আরও সব কত কে।

সকলের বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টির সমনে সহসা রানীদি আমাকে জড়িয়ে ধরে প্রচণ্ড ভাবে ডুক্‌রে উঠে বল্‌লেন, 'ওরে বিজন আমি হারলুম, না জিতলুম বল্‌ তুই বল্‌! তারপর তিনি অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন। আমি শুধু অস্ফুট স্বরে বলে উঠলাম, 'জামাইবাবু!'

পরদিন শুধু আমি একটিবার দেখেছিলাম রানীদিকে। সেদিন তিনি শুধু আমাকে বলেছিলেন, 'তুই চলে যা এখান থেকে বিজন।'

*　　　*　　　*

তারপর বহুদিন-প্রায় ছটা বছর কেটে গেছে। কিন্তু বিভীষিকার সে দিনগুলি আমি ভুলিনি। প্রতিদিন, প্রায় প্রতিদিন সংবাদপত্রে খুনের খবর। মাঠে ময়দানে, রাস্তায়, পুলিশ থানায়, লালবাজারে, ভারতবর্ষের শহরে শহরে জেলখানায়, নরহত্যার যেন শেষ নেই। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী। তাঁর শাসনকে অব্যাহত রাখতে শ্রেণীশত্রু খতম করার যেন হিড়িক পড়ে গেল। তাঁর রিসার্চ এ্যাণ্ড এ্যানালিটিক্যাল উইং-এর নতুন রিক্রুট বসন্তরা যেন চষে বেড়াতে লাগল সারা বাংলাদেশ আর ভারতবর্ষ। লোকে তাই তাদের 'নকশাল' না বলে 'কংশাল' বলতে লাগল। রানীদি আমায় চলে যেতে বলে নিজে যে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন, তার হদিস আমি দীর্ঘকালের মধ্যে আর করতে পারি নি।

একদিন এরই মধ্যে ঠিক যেমন সেই অভিশপ্ত জগতের সংস্পর্শে আসার প্রথম ঘটনাটি ঘটেছিল, তেমনিভাবেই একদিন আবার ভানুর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল ট্রেনে। মেনকাকে নিয়ে সে অন্ধগায়ক সেজে ভিক্ষা করছিল।

মেনকা আমাকে দেখে ভানুকে বললে, 'দাদামণি ভানু।'

ভানু বলে উঠল, 'কই—কই ?'

তারপর মেনকা তাকে ধরে ধরে আমার কাছে নিয়ে এল। ভানু আমার পায়ে প্রণাম করে বললে, 'ভাল আছেন দাদামণি ?'

মেনকাও আমার পায়ের ধূলো নিয়ে বলে উঠল, দাদামণি আমাদের ভুলে গেছেন একেবারে।'

ট্রেনযাত্রীদের অনুসন্ধিৎসু ও কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে একটু অসুবিধা হচ্ছিল. তবু বললাম, 'তোমাদের ভুলে যাব কি করে ভাই ? সব কথা আমার মনে আছে। কিন্তু বলো দেখি আর সবাই কেমন আছে, মায়া, মাধু, পাঁচির মা, শঙ্কর, জগদীশ, টুনটুনি, মন্টু, বনানীরা—

ভানুই উত্তর দিলে, 'ওরা কেউ এখানে নেই'।

মেনকা বললে, 'বসন্তর উৎপাতে ওরা সব পালিয়েছে অন্য জায়গায়।'

একটু চিন্তিতভাবে বলে উঠলাম, 'কোথায় গেল তোমাদের কিছু জানায় নি?'

ভানু বললে, না।'

কোথায় গেল তোমাদের জানায় নি—একথা জিজ্ঞাসা করার মধ্যে দিয়ে আমি যা জানতে চেয়েছিলাম, তা আংশিক ভাবে পেলেও সম্পূর্ণভাবে পেলাম না। তাই বলে উঠলাম, 'তোমরা ওখানেই আছো তো?'

'না দাদামণি'

'তাহলে?'

ভানু বলতে লাগল, 'কি ক'রে থাকব দাদামণি—বসন্তকে তবু যাহয় করে মিছে কথা বলে ফাঁকি দিয়ে থাকতে পারতুম—কিন্তু সেই ডি-সি সেণ্ট্রাল আর ডাক্তারটা তারা কাউকে বিশ্বাস করত না। প্রতিদিন এখান থেকে সেখান থেকে জোয়ান বয়সী ছেলে-গুলোকে ধরে আনত—আর বস্তীর সেই বাড়ীটার মধ্যে হয় তাদের গুলী করে মারত, নয় হাত-পা কেটে মুণ্ডুটা গলা থেকে আলাদা করে ফেলত।

এই বিভীষিকাময় ঘটনাবলীর পটভূমিকায় মানুষের মনের অবস্থা যে কি হয় তা সহজেই অনুমেয়। মনটা ভারাক্রান্তও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তবু যেকথা আমি জানতে চাই তা একেবারে সোজাসুজি বলে ফেললাম, 'রানীদি কিম্বা জামাইবাবুর কোন খবর জানো না তোমরা?'

ভানু বললে, 'না। তবে একথা জানি যেখানে তাঁরা গেছেন সেখানেই আর সবাইও গেছে।'

তাই হয়তো হয়ে থাকবে।

আরও অনেকগুলো দিন কেটে গেছে। সব কথাই ফিকে হয়ে এসেছে মনে। হঠাৎ একদিন একখানা চিঠি এল এর মধ্যে। চিঠিখানা রানীদির লেখা ঃ তিনি লিখেছেন ঃ—

স্নেহের বিজন,

আজ অনেকদিন পরে আমার এই চিঠিখানা পেয়ে হয়তো তুই চমকে উঠবি—রানীদি তোর এখনও না মরে বেঁচে আছে। তোকে চিঠি লেখার লোভ আমার অনেকবারই হয়েছিল যখন বার বার দেখতে পেলুম কাগজে তুই লিখতে শুরু করেছিস। কিন্তু লিখতে পারি নি। লজ্জা ও সংকোচ এসে আমার হাতখানা যেন চেপে ধরেছে। তাছাড়াও মাঝে মাঝে যে ওগুলোকে জয় করি নি তা নয়; আমি ভায়ের কাছে লিখব তাতে আমার লজ্জাই বা কিসের আর সংকোচই বা হবে কেন? কিন্তু তুই তো জানিস, হাতের লেখা আমার খারাপ বলে চিঠি লেখার উৎসাহ আমার কোনদিনই ছিল না। কাজেই লিখি-লিখি করেও মাসের পর মাস, এমন কি বছরের পর বছর কেটে গেছে—লিখতে আর পারি নি। তবু বলতে হবে, শেষ পর্যন্ত আমার মনের ইচ্ছাই জয়ী হয়েছে। আমি লিখতে বসেছি। কিন্তু আমি ভাই তোর মত ভাষা জানি না, তোর মত স্পষ্ট করে নিজের কথা গুছিয়েও বলতে পারি না—যদি দিদির এই চিঠিতে অসংলগ্ন কোন কিছু দেখিস্ তবে কিছু মনে করিস্ নি, চিরদিন দিদিকে যেমন ক্ষমার চোখে দেখেছিস্, তেমনিভাবেই দেখবি।

সেইদিনটা আমি ভুলি নি—যে দিনটা এক হিংস্র খুনের পরিস্থিতিতে থর-থর করে কেঁপে উঠেছিল, যে দিনটায় শঙ্কর, তোকে আর জগদীশকে খুন করার কথা উচ্চারিত হয়েছিল। সেই দিনটার পরে রাত্রি প্রভাত হলে, মনে আছে তোর—সেই আমাদের শেষ দেখা? সেদিনই আমি প্রথম জানলুম—কেন তুই গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী সেজে পথে বেরিয়ে পড়েছিলি! আমার বেশ মনে আছে

তুই বলেছিলি খুন করেছিল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থকেরা আর ওয়ারেন্ট বেরিয়েছিল তোর। যুগটা ওদেরই—ধরে ফাঁসীতে লট্‌কে দেয়া ওদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না, তাই শুরু হয়েছিল তোর অজ্ঞাতবাস। কিন্তু গেরুয়া পরে অজ্ঞাতবাস করতে গিয়ে মুশকিল হয়েছিল তোর। তুই সাধু না ভণ্ড—এই প্রশ্ন উঠে পড়েছিল সেই অভিশপ্ত জগতের মানুষগুলোর মনে। তাই তুই ভণ্ডামির আবরণকে সেদিন ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলি। তোর এই খাঁটি মনটাকে আমি আজও শ্রদ্ধা করি বিজন। কিন্তু সেদিন বিপদের ঝুঁকিটা এতে তোর কম ছিল না। ওরা যদি চিনতে পারত তোকে তবে আদালতে হাজির করবার আগেই তুই শেষ হয়ে যেতিস্ ওদের হাতে। একথা মনে হলে আজও আমি শিউরে উঠি। সর্বাঙ্গে আমার কাঁটা দিয়ে ওঠে। যাক্, তুই যে বেঁচে গেছিস্ খুনের মামলা থেকে তা আমি একদিন পড়লুম খবরের কাগজে। মহামান্য হাইকোর্ট তোর মামলার অন্যান্য আসামীদের মুক্তি দেওয়ায় তুই আদালতে আত্মসমর্পণ করিস্ এবং বিচারপতির পূর্বঘোষিত রায়ের বলেই মুক্তি পাস্। সেদিন বড় আনন্দ হয়েছিল রে আমার। আমি তোকে মনে মনে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছিলুম আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলেছিলুম, ভগবান! তুমি বিজনকে দীর্ঘায়ু কোরো।

কিন্তু সেই আনন্দের দিনটা যেন আমার কোথায় হারিয়ে গেল রে বিজন! খবরের কাগজে তোর খুনের মামলা থেকে ছাড়াপাওয়ার কথা যেদিন পড়লুম সেইদিনই আমার জীবনে নেমে এল আর এক খুনের নির্মম বিয়োগান্ত নাটক। আর কেউ না জানুক তুই তো জানিস্ কেন আমি ঘরবাড়ী ছেড়ে নেমে এসেছিলুম সেই অভিশপ্ত জগতের নরককুণ্ডে। তোর জামাইবাবুকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলুম লোকালয়ে, মানুষের সমাজের মাঝখানে। সেজন্য দিনের পর দিন আমি উমার তপস্যার চেয়েও কঠিন তপস্যা করেছি। তুই তো

বুঝিস, উমাকে আমার মত সেই পূতিগন্ধময় নরকে নেমে তপস্যা করতে হয় নি—তাই এ তপস্যা আমার ছিল অনেক, অনেক কঠিন। তবু তা আমি করেছিলুম।

তোর জামাইবাবুকে আমি না জেনে প্রথমে আবোল তাবোল অকারণ কত কি বলেছি, তিরস্কার করেছি, অপমান করেছি। কিন্তু যেদিন জানতে পারলুম তার উদার হৃদয়ের গভীর ক্ষতের কথা সেদিন আমিই, হ্যাঁ আমিই আমার সমস্ত সুখ, আমার অফুরন্ত আশা, সকল ভবিষ্যৎকে ভুলে গিয়ে নিজের ছোট বোন বাণীর সঙ্গে ওঁর বিয়ে দিয়েছিলুম। কারণ আমি বুঝেছিলুম, বাণীকে বিপথে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওঁর কোন দোষ ছিল না। কে দোষী তা তুই জানিস। কিন্তু বাণীর কি হবে, তাই ভেবে আমাকে বেছে নিতে হয়েছিল এই পথ। মণ্টু, টুনটুনি তোর জামাইবাবুর বিবাহিতা ধর্মপত্নীর সন্তান। তাদের জন্ম-ইতিহাসের মহালগ্নে কোন কলঙ্কিত মুহূর্ত তাদের স্পর্শ করতে পারে নি—এই অনুভূতিটুকুই আজ আমার সবচেয়ে বড় সম্বল। এই সম্বলটুকু বুকের মধ্যে বয়ে নিয়ে কাটাতে লাগলুম এই আশায় যে, একদিন না একদিন তোর জামাই-বাবুকে নিশ্চয়ই ফিরিয়ে নিতে যেতে পারব। পারব তার সঙ্গে ছেলে-মেয়েদেরও নিয়ে যেতে। কিন্তু কি নিষ্ঠুর পাপচক্র সেই অভিশপ্ত জগতে তা তো তুই নিজে চোখে দেখে এসেছিস্—প্রতিদিন, প্রতিটা মুহূর্ত সেই পাপচক্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে আমি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়েছি। কিন্তু আশা ছাড়ি নি।

শেষ পর্যন্ত আমি জিতেছিলুম। উদ্ধার করে এনেছিলুম আমার জীবনের পরম প্রিয় মানুষটিকে আর তার সঙ্গে ছেলে-মেয়েদেরও। পেতেছিলুম সুন্দর করে একটি ছোট্ট সংসার। মণ্টুকে আর টুনটুনিকে পড়তে পাঠিয়েছি এই দেশেরই এক মহামানবের গড়ে তোলা শিক্ষানিকেতনে। কবছরের মধ্যে মানুষ হয়ে ফিরে আসবে তারা, আশা আছে টুনটুনির বিয়ে দিয়ে জামাই আনব বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের সেরা ছেলেকে। মণ্টুরও বউ আনবো প্রতিমার মত সুন্দরী মেয়েকে।

কিন্তু এল সেই দিনটা যেদিন খবরের কাগজে বেরুল তোর মুক্তিসংবাদটা। সেইদিন—তখন অপরাহ্নবেলা যাই যাই করছে, সূর্য কখন ডুবে গেছে। সন্ধ্যার কালো ছায়া গুটি গুটি করে যেন হামাগুড়ি দিয়ে আসছে। উত্তরপ্রদেশের পাহাড়ঘেরা এই ছোট্ট শহরটির প্রাণচঞ্চল অস্থিরতা যেন বেড়ে গেছে। মানুষের তখন ঘরে ফেরার পালা। ফেরার পালা পাখি-পাখালিরও। তাদের কল-কাকলীতে গোটা পরিবেশটা মুখরিত। এমন সময় তোর জামাইবাবু বসেছিলেন বাড়ীর সদরের সামনে দেউড়িটায়। উনি আর চোখে ভাল দেখতে পান না। তাই এইভাবেই প্রতিদিন ঐ জায়গাটিতে বসে থাকেন বিকালের দিকে। আমি ছিলুম ঘরের ভিতর জানলার সামনে দাঁড়িয়ে—হঠাৎ দেখতে পেলুম কয়েকগজ দূরে একখানা জীপগাড়ী ঘর্ঘর শব্দে এসে দাঁড়ালো। দেখলুম জীপখানা থেকে লাফ দিয়ে নামল সেই ডি-সি সেণ্ট্রাল আর বসন্ত। হাতে তাদের রিভলবার। এতদূরেও ওরা ধাওয়া করেছে! নিমেষের মধ্যে আমি উপলব্ধি করে ফেললুম পরিস্থিতির ভয়ংকরতা। ওরা শ্রেণী শত্রু খতম করতে আসছে। আমি চিৎকার করে সরে আসতে বলতে যাচ্ছিলুম তোর জামাইবাবুকে কিন্তু মনে হল কে যেন আমার কণ্ঠরুদ্ধ করে দিলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে ফিরে পেলুম আমার সম্বিৎ! চিৎকার করে ওঁকে ডাকতে গেলে ওরা সময় পাবে বরং ওদের আক্রমণ করার আগেই তাঁকে অতর্কিতে টেনে আনা আমার পক্ষে সঠিক কাজ হবে। মুহূর্তের মধ্যে ছুটে গিয়ে তাই করলুম। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বসন্তকে গুলী করল। তারপর তাড়া করল ভূভারতের সেই বোকা পাঁঠাটার দিকে। পাঁঠাটা তখন আপন চরিত্রের মতই ল্যাজ গুটিয়ে জীপে উঠে গাড়ী ছুটিয়ে দিল ঊর্ধ্বশ্বাসে। তারপর দেখলুম তাড়া করে যাওয়া

মানুষটি সেইখানে দাঁড়িয়ে হেসে উঠল অট্টহাসি। তার নাম করতে আজ আর কোন বাধা নেই: সে হল জগদীশ!

বসন্ত তখন কাটা ছাগলের মত ছট্‌ফট্‌ করছে রাস্তায় পড়ে। ছুটে এল রাহী লোকজন। তোর জামাইবাবু তো হতবাক্‌। তবু তিনি বলে উঠলেন, 'ব্যাপার কি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ওঁকে শুধু বললুম, 'বসন্ত আর ডি-সি সেণ্ট্রাল, হাতে রিভলবার ছিল। এসেছিল শ্রেণীশত্রু খতম করতে।'

'এখানে? এতদূরে?'

'হঁ্যা!'

'গুলী কে করলে?'

আমি বললুম, 'জানি না।'

আশ্চর্য মানুষ তোর জামাইবাবু, বললেন, 'ওরা এল তো গেল কোথায়?'

বললুম, 'ডি-সি-সেণ্ট্রাল পালিয়েছে জীপ ছুটিয়ে। আর বসন্ত গেছে জীবনের পরপারে—'

উনি বললেন, 'মানে?'

'মানে খুব সোজা—গুলী খেয়ে মরেছে।'

'বসন্ত মরে গেছে! উনি যেন অস্থির হয়ে উঠলেন। বল্‌লেন, 'আহা চলো—চলো আমাকে ওর কাছে নিয়ো চলো! আমার অনেক দিনের বন্ধু!'

আমি তখন ক্ষমাহীন। ধমক দিয়ে তোর জামাইবাবুকে বললুম, জীবনে অনেক ভুল করেছো তুমি। বসন্তর মৃতদেহের কাছে গিয়ে ভুলের বোঝা বাড়াতে হবে না তোমাকে—

কিন্তু বিজন, সেই ভুলই তিনি করলেন।

ঘটনাস্থলে পুলিশ এল। গুলী কে করেছিল, কোন্‌দিক থেকে এসেছিল কেউ তা খতিয়ে দেখল না। একটা প্রায় দৃষ্টিশক্তিহীন

মানুষ তাক করে গুলী করতে পারে কিনা তারও প্রশ্ন পুলিশের মনে জাগল না—শুধু বসন্তের মৃতদেহের পাশে তোর জামাইবাবু ছিলেন বলে তারা তাঁকে ধরে নিয়ে গেল।

সেই থেকে তিনি আজও জেলে।

আমি তাঁর মুক্তির জন্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে গিয়েছিলুম। তাঁকে বলেছিলুম, "খুন আমার স্বামী করেন নি। খুন করেছে অন্যে। যেভাবে সমাজবিরোধীরা আর হিংস্র পুলিশের দল দেশে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে তাতে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সেইটুকু বিবেচনা করে আপনি আমার নিরপরাধ স্বামীকে মুক্তি দেবেন—এই আশাই আমি করি।" কিন্তু কোন ফল হয়নি। শ্রীমতী গান্ধী আমাকে শ্রীমেহতার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন। শ্রীমেহতার সঙ্গে দেখা করলে তিনি আমায় বলেন, 'যা কিছু হবে তা আদালতেই হবে'।

তারপর থেকে আমার ভাবনার ও বেদনার দিনগুলো যেন আর কাটতে চায় না। মাঝে মাঝে শিক্ষানিকেতন থেকে মণ্টু আর টুনটুনির চিঠি পাই। তাদেরও মনে গভীর ক্ষত। আশার মধ্যে জগদীশ আর মায়া, শঙ্কর আর মাধু—তার সঙ্গে বনানীও। ওদের সঙ্গে এনেছিলুম। দূরে সরিয়ে দিতে পারি নি। মায়ার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছি জগদীশের। শঙ্কর যে মাধুকে বিয়ে করবে সেতো একরকম ঠিক হয়েই ছিল। আমি শুধু ওদের দুইহাত এক করে দিয়েছি। মায়ার মা সংসার পেতেছে ছেলে-বউ আর মেয়ে-জামাই নিয়ে। ওরা সকলেই কাজকর্ম করে। রোজগারও মন্দ নয়। পাঁচির মাটা থাকে আমার কাছে। পাঁচির বিয়ে হয়ে গেছে।—জামাই কাজ করে কানপুরের এক ফ্যাক্টরীতে। পাঁচির ভাইটা সেই যাকে মেনকা কোলে নিয়ে ভিক্ষে করতে যেত, সেও কাজ পেয়েছে এখানকার রেলে। বনানীর বিয়ে থা দিতে পারি নি, মানে, ও বিয়ে করে নি। সে নার্সের কাজ করে এখানকার স্টেট-হসপিটালে।

মাঝে মাঝে বনানীর কাছেই তোর জামাইবাবুর খবর পাই। চোখের চিকিৎসার জন্য জেল থেকে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসে। হয়তো ক্বচিৎ কদাচিত আমিও দেখা করি লুকিয়ে লুকিয়ে। কারণ প্রকাশ্যে দেখা করার আইন থাকলেও, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর শাসনে সে মানবিকতাটুকুও বিলুপ্তপ্রায়। আমাকে ওরা দেখা করতে দেয় না।

কি নিদারুণ দুঃখে যে আমার দিন কাটছে তা আমার পক্ষে বর্ণনা করা বোধকরি আজ সম্ভব নয় বিজন। ছেলে মেয়ে দুটোকে পড়তে পাঠিয়েছি। তাদের জন্য একটা বিরাট খরচ, সে খরচ যোগানো আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সেজন্য এখানকার মাধ্যমিক স্কুলে আমাকে চাকরি নিতে হয়েছে। প্রতিদিন যাই আসি, কিন্তু জীবনভোর যে মর্মান্তিক জ্বালা আমার ভিতরটাকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে তার যেন আর শেষ নেই। জগদীশ, শঙ্কর, মাধু, মায়া ওরা সব বুঝতে পারে। ওরা নানাভাবে সান্ত্বনা দেয়। আমি সস্নেহে ওদের সান্ত্বনা গ্রহণ করি। কিন্তু শান্তি পাই না।

এবার তোকে কাজের কথাটা লিখি। তোরা কতদূর শুনতে পাচ্ছিস জানি না। আমাদের শহর থেকে রায়বেরিলী বেশী দূর নয়। সেখান থেকে যেসব খবর পাচ্ছি তাতে মনে হচ্ছে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তা যদি হয় তবে ভারতবর্ষে খুন, রক্ত, অশ্রু, সন্ত্রাস ও বিভীষিকার রাজত্ব শেষ হবে। তারপর নতুন সরকারও গঠিত হবে। তখন ভাই, তোর কাছে এ আশা আমি নিশ্চয়ই করবো যে তুই তোর জামাইবাবুর মুক্তির জন্য চেষ্টা করবি।

আজ অনেকদিন পরে লিখতে গিয়ে বাবা-মার কথা মনে পড়ছে। যদি পারতুম তবে চোখের জলে তাঁদের পাদুটো ধুইয়ে দিয়ে আসতুম। আর একটা অনুরোধ করবো তোকে—তুই লিখিস, তুই লেখক, সাহিত্যিক—যদি কোন দিন পারিস যাকে তুই বলেছিলি

শরৎচন্দ্রের দুই নারীচরিত্র—অন্নদাদিদি আর বিহ্বল যৌবনের বসন্ত-দিনে পিয়ারীর বেশে রাজলক্ষ্মী—তার মর্মান্তিক দুঃখের কাহিনীকে তুই রূপ দেবার চেষ্টা করিস সেই অভিশপ্ত জগতের পটভূমিকায়। তোর মত এ জগতের কথা আর কে জানে!

আমার প্রাণঢালা অশীর্বাদ রইল তোর জন্যে। ইতি,

তোর রানীদি।

চিঠিখানা পড়া শেষ করে শুধু চুপ করে বসে রইলাম। চোখের সামনে তখন যেন ছায়াছবির দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর ঘটে চলেছে।—সে ছবি সেই অভিশপ্ত জগতের।

—সমাপ্ত—